C.U.-H04347-3-P36234



অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা॥
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।
সুখমিষ্টমনিষ্টং তৎ তস্যাং সত্যাং বিমুহ্যতি॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শৃণুষ্বাহ্যপ্রবর্তকান্।
চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চ তথা ঘ্রাণং ত্বগ্রসনমেব চ॥
রূপশব্দৌ তথা গন্ধস্পর্শৌ চাস্বাদ এব চ।
পঞ্চানামপি তেষাং বিষয়াঃ পঞ্চ কীর্তিতাঃ॥
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থমথ পঞ্চমম্।
কর্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈষাং শৃণু কর্মাণি চাত্র বৈ॥
বচনাদানগমনবিসর্গানন্দনানি চ।
পঞ্চকর্মাণি পঞ্চানামেষাং কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥
মনো হ্যত্রৈকাদশকমিন্দ্রিয়ং সংকল্পলক্ষণম্।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি পঞ্চাহুরেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥
শব্দস্পর্শরসরূপগন্ধানামিহ পঞ্চকম্।
ক্রমেণৈষাং বুদ্ধিরাখ্যা পঞ্চকস্য পৃথক্ পৃথক্॥
শব্দাদীনাং বিশেষাণাং পঞ্চানামপি পঞ্চকম্।
ক্রমেণৈষাং ভূতমাত্রা ইতি তাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
শব্দমাত্রাদ্ভবদ্ব্যোম তস্য শব্দো গুণো মতঃ।
স্পর্শমাত্রাদ্ভবেদ্বায়ুঃ স্পর্শস্তস্য গুণো মতঃ॥
রূপমাত্রাদ্ভবেজ্জ্যোতিস্তস্য রূপং গুণো মতঃ।
রসমাত্রাদ্ভবেদাপস্তস্য স্যাদ্রস এব হি॥
গন্ধমাত্রাদ্ভবেদ্ভূমিস্তস্য গন্ধো গুণো মতঃ।
এতে পঞ্চ মহাভূতা ভূতমাত্রাসমুদ্ভবাঃ॥
শব্দাদীনাং বিশেষাণাং পঞ্চানামপি পঞ্চকম্।
ক্রমেণৈষাং ভূতমাত্রা ইতি তাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
শব্দমাত্রাদ্ভবদ্ব্যোম তস্য শব্দো গুণো মতঃ।
স্পর্শমাত্রাদ্ভবেদ্বায়ুঃ স্পর্শস্তস্য গুণো মতঃ॥
রূপমাত্রাদ্ভবেজ্জ্যোতিস্তস্য রূপং গুণো মতঃ।
রসমাত্রাদ্ভবেদাপস্তস্য স্যাদ্রস এব হি॥
গন্ধমাত্রাদ্ভবেদ্ভূমিস্তস্য গন্ধো গুণো মতঃ।
এতে পঞ্চ মহাভূতা ভূতমাত্রাসমুদ্ভবাঃ॥

[illegible]

[illegible] জানি তব সকল কর্ম্মই।
[illegible] অনুকূলতায় ভাসে নিরবধি।
[illegible] যখনি যেমন করহ মোকেপথ।
[illegible] তখন [illegible] চাই হৈয়া একমন।

ভৈরবী।

[illegible] ভারিনী ভবমোহিনী।
[illegible] যদি কহে তব সুরস নৃত্যতি।
[illegible] আছিল মৈমুন নিদ্রা ভয় আদি নাহি।
[illegible] বিশ্ব ভাব সর্ব্বপ্রাণি পরে।
[illegible] বহু তোমার কাছে ইহা আমার।
এ সকল ভাব প্রাণী মনের সমান।
[illegible] দেখ সাক্ষাৎ আছে সাক্ষাৎ।
[illegible] অনুভূতি হেতু হিংসা আসিছে।
[illegible] আদি শক্তি অকলাল আদি শক্তি।
[illegible] নিরাকারে যত্নে জন্ম দেহ [illegible] দিকে।
ইহাদ ভাবের যদি বহু তুমি জান।
[illegible] মহত্ত নহে [illegible] ধরে জ্ঞান।
বিশ্ব দেখে তুমি জানে জানা সর্ব্বজন।
[illegible] আনন্দ ভাব না বলি নরনাথ।
[illegible] আদি ভাবেতে [illegible] ভাবিত হৃদয়ে।
ইথা দিলে ইহার করিবে কোন কর্ম্ম।
ওগবার পরে তুমি পাইবার যোগ্য।
ইহা কিনা দেখ বাঁধা [illegible] সাক্ষাতে।
[illegible] একানী দিনিত্ব মোহ আছে।
তোমরা [illegible] সংসারে উৎকৃষ্ট।
[illegible] দেখাইয়া [illegible] বিষয়।

[illegible] ভাবিনী ভবমোহিনী।
[illegible] যদি কহে তব সুরস নৃত্যতি।
[illegible] আছিল মৈমুন নিদ্রা ভয় আদি নাহি।
[illegible] বিশ্ব ভাব সর্ব্বপ্রাণি পরে।
[illegible] বহু তোমার কাছে ইহা আমার।
এ সকল ভাব প্রাণী মনের সমান।
[illegible] দেখ সাক্ষাৎ আছে সাক্ষাৎ।
[illegible] অনুভূতি হেতু হিংসা আসিছে।
[illegible] আদি শক্তি অকলাল আদি শক্তি।
[illegible] নিরাকারে যত্নে জন্ম দেহ [illegible] দিকে।
ইহাদ ভাবের যদি বহু তুমি জান।
[illegible] মহত্ত নহে [illegible] ধরে জ্ঞান।
বিশ্ব দেখে তুমি জানে জানা সর্ব্বজন।
[illegible] আনন্দ ভাব না বলি নরনাথ।
[illegible] আদি ভাবেতে [illegible] ভাবিত হৃদয়ে।
ইথা দিলে ইহার করিবে কোন কর্ম্ম।
ওগবার পরে তুমি পাইবার যোগ্য।
ইহা কিনা দেখ বাঁধা [illegible] সাক্ষাতে।
[illegible] একানী দিনিত্ব মোহ আছে।
তোমরা [illegible] সংসারে উৎকৃষ্ট।
[illegible] দেখাইয়া [illegible] বিষয়।

[illegible] ভাবিনী ভবমোহিনী।
[illegible] যদি কহে তব সুরস নৃত্যতি।
[illegible] আছিল মৈমুন নিদ্রা ভয় আদি নাহি।
[illegible] বিশ্ব ভাব সর্ব্বপ্রাণি পরে।
[illegible] বহু তোমার কাছে ইহা আমার।
এ সকল ভাব প্রাণী মনের সমান।
[illegible] দেখ সাক্ষাৎ আছে সাক্ষাৎ।
[illegible] অনুভূতি হেতু হিংসা আসিছে।
[illegible] আদি শক্তি অকলাল আদি শক্তি।
[illegible] নিরাকারে যত্নে জন্ম দেহ [illegible] দিকে।
ইহাদ ভাবের যদি বহু তুমি জান।
[illegible] মহত্ত নহে [illegible] ধরে জ্ঞান।
বিশ্ব দেখে তুমি জানে জানা সর্ব্বজন।
[illegible] আনন্দ ভাব না বলি নরনাথ।
[illegible] আদি ভাবেতে [illegible] ভাবিত হৃদয়ে।
ইথা দিলে ইহার করিবে কোন কর্ম্ম।
ওগবার পরে তুমি পাইবার যোগ্য।
ইহা কিনা দেখ বাঁধা [illegible] সাক্ষাতে।
[illegible] একানী দিনিত্ব মোহ আছে।
তোমরা [illegible] সংসারে উৎকৃষ্ট।
[illegible] দেখাইয়া [illegible] বিষয়।

[illegible] ভাবিনী ভবমোহিনী।
[illegible] যদি কহে তব সুরস নৃত্যতি।
[illegible] আছিল মৈমুন নিদ্রা ভয় আদি নাহি।
[illegible] বিশ্ব ভাব সর্ব্বপ্রাণি পরে।
[illegible] বহু তোমার কাছে ইহা আমার।
এ সকল ভাব প্রাণী মনের সমান।
[illegible] দেখ সাক্ষাৎ আছে সাক্ষাৎ।
[illegible] অনুভূতি হেতু হিংসা আসিছে।
[illegible] আদি শক্তি অকলাল আদি শক্তি।
[illegible] নিরাকারে যত্নে জন্ম দেহ [illegible] দিকে।
ইহাদ ভাবের যদি বহু তুমি জান।
[illegible] মহত্ত নহে [illegible] ধরে জ্ঞান।
বিশ্ব দেখে তুমি জানে জানা সর্ব্বজন।
[illegible] আনন্দ ভাব না বলি নরনাথ।
[illegible] আদি ভাবেতে [illegible] ভাবিত হৃদয়ে।
ইথা দিলে ইহার করিবে কোন কর্ম্ম।
ওগবার পরে তুমি পাইবার যোগ্য।
ইহা কিনা দেখ বাঁধা [illegible] সাক্ষাতে।
[illegible] একানী দিনিত্ব মোহ আছে।
তোমরা [illegible] সংসারে উৎকৃষ্ট।
[illegible] দেখাইয়া [illegible] বিষয়।

পরা, প্রলয়ের রাত্রি এতাদৃশ হয়।
সেই মহামায়া দেবী সর্ব্বসংহারিণী।
মহানিদ্রারূপা ব্রহ্মজ্ঞানবিনাশিনী।
লক্ষ্মীস্বরূপা সদা বিষ্ণুমায়া।
অবিদ্যা স্বরূপ মহানিদ্রা স্বরূপিণী।
যত ইতি চরাচর জন্মা আদি করি।
তোমার হইব মোহ ই কোন বিস্ময়।
প্রলয় হইলে তিনি মুকুন্দবিনাশী।
প্রলয় মূর্ত্তি হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধন হেতু তিনি সে নিশ্চয়।
সর্ব্বভূতেশ্বরী তিনি পরা কল্যাণী।
সর্ব্ব সম্পূর্ণা তিনি সকলের ঈশ্বরী॥"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সাধারণে যাহাতে আগমের মহিমা কীর্ত্তন করে, সেই উদ্দেশ্যে ভবানীরায় 'কালিকামঙ্গল' 'অন্নদামঙ্গল' 'ভারতমঙ্গল' প্রভৃতি পাঁচালীর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্নদামঙ্গলে দুর্গামঙ্গল কীর্ত্তিত হইত। এই সকল কীর্ত্তন গানে নিম্নে উদ্ধৃত গান দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর গান সকলে মিলিয়া বিরাম করিলে ও তালের মাত্রা রাখিয়া যায়। আর একজনেই গান প্রধান গায়ক সুর করিয়া আবৃত্তি করে। এই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর গানের প্রথম দল বা ধুয়া গানের অন্যান্য লোকে সেখান হইতে একটী আর চরণ আবৃত্তির মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকে। এই গান গুলি পটনার বলিয়া মনে হয়। এ গুলি প্রায়ই পয়ার ছন্দে রচিত, কদাচিৎ ত্রিপদীও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, কল্পনা, তব প্রভৃতি এক শ্রেণীর গান। এ শ্রেণীর কোন কোন গানেও ধুয়া আছে দেখিয়া এই উভয় শ্রেণীর গানই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ গ্রন্থে বহু সংখ্যক ধুয়া আছে। আমরা এই একটী ধুয়া উদ্ধৃত করি। যেমন—

(১) ভৈরবী।

ধর ধর শব্দ, নিঃ চণ্ডরবে,
প্রচণ্ডবাদিনী চণ্ড অম্বর মণ্ডে।

(২) ভৈরবী রাগ—পীতাম্বর।

কপালী করবালী কালী, কোপে মুণ্ডমালা ভালি,
মহাবীর বৈতালবাহ, হীন হীন বীরহি।

(৩) ভৈরবী।

জননী গো জগত জেন, অভিলাষা।
নাভিমত এহি দেখি, করণাময়ী তুহি, তুয়া নিত চিত্তের আশা।

এই গানে কোন ঘটনার অবতারণা করিবার প্রয়াস ঘটিয়াছে, প্রতীয়মান হয়। সেই স্থানে দেবীকে মহাদেবের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই ভাব যা ছাড়া পরমান্ন নয়। কি ঐতিহাসিক তত্ত্বের ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা তাহার মীমাংসা করিবেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা তিনটী উদ্ধৃত করিলাম।—

১। সেহি পাদপদ্ম সরু।
মহল রূপনারায়ণ ভৃঙ্গ॥

২। শুন দেবী বলি আমি, অসীম মহিমা তুমি,
তথাচ কহিতে করি সাধ।
কহে রূপনারায়ণ, শিশুর বচন যেন,
মায় শুনে করিয়া আহ্লাদ।

৩। যা বিনু শকতি হীন,
ঈশ আদি যোক তিন,
রূপনারায়ণ ঘোষ-ভাষপয়কাশিনী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে রূপনারায়ণ সংস্কৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতি জানিতেন। দুর্গামঙ্গলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, ব্রজভাষা প্রভৃতির রচনা এবং বাঙ্গালার সহিত উহাদের মিশ্রিত রচনা উভয়বিধ রচনাই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে পারশী, উর্দ্দু প্রভৃতির বহুল প্রচার ছিল; কিন্তু রূপনারায়ণের রচনায় পারশী বা উর্দ্দুর মিশ্রণ নাই। ইহার দুই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, হয়ত—কবি পারশী বা উর্দ্দু জানিতেন না। নয়ত—ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া তিনি যাবনিক শব্দ প্রয়োগ ইচ্ছা করেন নাই।

রূপনারায়ণের সময়ে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, দুর্গামঙ্গলে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। তৎকালে দেশে বাঙ্গালা কাব্যে বৈষ্ণবকবিদিগের প্রভাব বড় বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের ব্রজভাষায় বা ব্রজভাষা মিশ্রিত বাঙ্গালায় রচিত প্রেমবিরহবিষয়ক গীতিকবিতাগুলি বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। সাধারণ ভাষাতেও ব্রজভাষার মিশ্রণ কম ছিল না। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক', সপ্তমীর 'তে' স্থলে 'ত' ব্যবহৃত হইত। কারক বিশেষে এখন যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন তেমন হয় নাই। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়ার 'কে' এর পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে সপ্তমীর 'ত' দেখা যায়। তৃতীয়ার 'কর্ত্তৃক' বিভক্তির ব্যবহার ছিলনা, 'কর্ত্তৃক' স্থলে 'তে' ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান কালের 'ইতেছে' প্রভৃতি ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ কম। তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃতের অনুরূপ 'করন্তি' 'গায়ন্তি' প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। সম্ভ্রম বুঝাইতে কোন কোন ক্রিয়াপদে 'আ' যোগ করা হইত। যেমন—করুকা (করুন), হরুকা (হরুন), 'আশ্রয় করিয়া' স্থলে 'আশ্রাইয়া', আক্রমণ করিল স্থলে 'আক্রাইল'। এইরূপ কৃদ্ধাতুর প্রয়োগ ব্যতীত শব্দ বা ধাতু হইতে মুখ্য ক্রিয়ার রচনা দেখা যায়। তৎকালে বাঙ্গালায় বিবিধ ছন্দের ব্যবহার হইয়াছিল। কিন্তু এক পয়ার ব্যতীত অন্য কোন ছন্দের নাম রূপনারায়ণ উল্লেখ করেন নাই। রূপনারায়ণের সময়ে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বর্ত্তমানে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দুর্গামঙ্গলের ভাষার প্রাচীনত্ব

[illegible] জন্য যে সকল গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেই উহা দৃষ্ট হইবে। অতএব ভয়ে অধিক কথা লিখিত হইল না।

কৃপারাম দাসের সমসাময়িক অন্য কবি 'অকিঞ্চন' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বৈষ্ণবগণকে বিনয়ের সহিত বলিতেছেন :—

"তোমা সবার কিছু বলিতে নাহি আশ।
দোষ না করিহ ভাই যদি হয় ভাষা।
তথাপি ভাঙ্গেতে যদি থাকে গঙ্গাজল
তথাপি পবিত্র বলে জানিয় নিশ্চল॥"

কৃপারামের সময়ের বহুপূর্বে যবনভাষা গীতগুলির খুব আদর হইয়াছিল। কিন্তু পাঠকের মধ্যে যাহাদের রুচির ও মতামতের ছিল, তাহারা দল বাঁধিয়া এই মতের গায়িতেন। এই দলে নানা বৈষ্ণবের ছেলেরাই ছিল, কিন্তু বৈষ্ণব বিদ্বেষের প্রভাবে বৈষ্ণব-সমাজের অভিভাবক গায়কগণের গৃহদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কৃপারাম গায়ক ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের কবিত্বপ্রভাব তিনি এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার গীতিকাব্যে বৈষ্ণবের ভক্তি, বিনয় ও মধুরতা প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীরসিকলাল বসু।

---

(১) এই প্রবন্ধে বিদ্যাপতি 'ভূপরিক্রমে' বৈষ্ণবাচার্য্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলা হইয়াছে।

# হাতুনার ইষ্টক-লিপি।

( জ্যৈষ্ঠমাসের আধিবেশনে পঠিত )

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইষ্টকে খোদিত লিপির সংখ্যা অতি কম। তদ্দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য বাহির করা অতিশয় কঠিন; কিন্তু সুখের বিষয়, আজ যে খোদিত ইষ্টকখানি এই সভাস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে, এই ইষ্টকখানি হইতে কতকটা ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষের অনেক সময়ে অলীক ঘটনাপূর্ণ হইলেও সময়ে সময়ে তাহা হইতেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য বাহির করা যায়। বহুদিন হইতে হাতুনার এই প্রবাদ প্রচলিত আছে, এই মুদ্রা ইষ্টকলিপি হইতে তাহার ঐতিহাসিকতা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে। যে কারণে এই খোদিত ইষ্টকখানি—আমাদের আলোচ্য। যে স্থান হইতে ও যেরূপে ইষ্টকখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। বাকুড়া হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ, পরে বাঁকা নদীর হইতে [illegible] যে পুরাতন বড় রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার ধারে ছাতনা গ্রাম অবস্থিত। পূর্বে এখানে একটী বিখ্যাত সামন্তরাজ্য ছিল।

কোন্ সময়ে এই রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ উপায় নাই। প্রবাদ আছে যে, এখানে একদল ব্রাহ্মণ-রাজগণই রাজত্ব করিতেন। পরে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী ব্রাহ্মণ রাজাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সামন্তগণ রাজা হইবে বলিয়া রাজাকে বর দেন। অপর কিম্বদন্তী রাজা [illegible] তিনি পাঞ্জিত ডাকিয়া সামন্তগণের সমূলে উচ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে প্রায় সকল সামন্তই নির্ব্বংশ হইয়া। এই সামন্তগণ কোন্ জাতীয় ও কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আজকাল জানা যায় না। সমাজে ইহারা জলচলশ্রেণীর ও নবশাখাদিগের ন্যায় সম্মানিত। একই গাঁই বা শ্রেণীর উত্তম জাতির যাজকতা করে। কোন কোন সামন্ত উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, সামন্ত শব্দের সামন্তাল নামেরই রূপান্তর মাত্র। সামন্তাল অর্থাৎ সাঁওতালগণই ব্রাহ্মণ রাজাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার এবং ক্রমশঃ হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে লোকে তাহাদের উৎপত্তি ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এই অনুমান কতদূর সত্য, তাহা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগের বিবেচ্য বিষয়। ছাতনার বর্ত্তমান সামন্তরাজগণ আপনাদিগকে ছাত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন।

কথিত আছে, ব্রাহ্মণরাজ সামন্তদিগের উচ্ছেদ সাধন করিলে ১২ ঘর সামন্ত অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া অবশিষ্ট থাকে। তাহারা কুলাচার্য্যদিগের সহিত একত্র পরামর্শ করিয়া কোন কৌশলে রাজার লোকেরা ধরিতে পারে নাই। যাহা

হইত, তাহারা অরণ্যে আশ্রয় লইল এবং প্রতিশোধ লইবার চিন্তা করিতে লাগিল। অল্পদিনেই তাহারা দলপুষ্ট করিতে লাগিল এবং একদিন অমাদি প্রস্তুত করিয়া বলিল, 'আজি আমাদের সঙ্গে যে যে ভোজন করিবে, সেই আমাদের জাতিভুক্ত হইবে।' কথা রাজ্য, এই সুযোগে অনেক নীচজাতি সমস্তদিনের সহিত মিশিয়া যায়। কেবল একজন সামন্ত সেই ত্রিশ জাতির সহিত আহার করিতে আপত্তি করিয়া দূরে এক গাছতলে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। ওইজন সকলেই তাহাকে সমাজচ্যুত করিল। সে 'গাছর কাটা' সামন্ত নামে খ্যাত হইল। আজও তাহার বংশীয়েরা 'পাথরকাটা সামন্ত' বলিয়া পরিচিত। সামন্ত-সমাজে ইহারা মর্য্যাদায় হীন। যাহা হউক, এক দিন সামন্তগণ অতিমাত্র মুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া জঙ্গলে বেড়াইতেছিল; এমন সময়ে বাগুলীদেবী বৃদ্ধা অবধূতবেশে কৌশল করিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কৌশলে তিনি সকলকে দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন ধূর্ত্ত বুদ্ধি খাটাইয়া কৌশল ধরিয়া লইল। তখন বাগুলী পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই ১২ই চৈত্র (পরশু) ও খাঁড়া গ্রহণ করিয়া, তাহার দিনে তোমরা ছত্রবতী রাজধানীতে প্রবেশ করিবে। ঐ দিবস উৎসবে রাজা স্থির আসিবে। [illegible] নির্দ্দিষ্ট বোল বাজিতে থাকিবে, তখন তোমরা একসঙ্গে রাজাকে আক্রমণ করিবে। যুদ্ধে তোমাদের জয় হইবে, কিন্তু তোমরা আমার বেশ ধারণ করিয়াছ, সুতরাং প্রথম রণে একজন কাটা পড়িবে।' তদনুসারে ১২ জন সামন্ত অনুচর সমভিব্যাহারে উৎসব দেখিবার ছলে গুপ্তভাবে রাজবাটীতে প্রবেশ করিল। রাজা দেবদর্শনে বাহিরে আসিলেন। ঐ দিকে ঢাকে সহসা সঙ্কেত বোল বাজিয়া উঠিল,

"ডে ডেং ডে ডেং কাশমদ্দ। লায়লি পাবুরি এই বেলা॥"

১২ জন সামন্ত তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাগুলী প্রদত্ত তীক্ষ্ণধার টাঙ্গি ও খড়্গ বাহির করিয়া হুহুঙ্কার রবে রাজাকে আক্রমণ করিল। বাগুলীর কথামত একজন সামন্ত হত হইলে অবশিষ্ট ১১ জন রাজাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। এইরূপে সামন্তগণ কুলদেবের প্রতিশোধ লইয়া রাজ্যাধিকার করিল। এখানে যেখানে রাজবাড়ী তাহার ঈশানকোণে ছাতনায় পশ্চিমে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণদিগের বাসোপযোগী প্রাসাদ ছিল। দুই একখানি ইষ্টক ও ভগ্নাবশেষ সমস্তিত প্রস্তর আজও তথায় পাওয়া যায়। লোকে বলে, তথায় রাজারা যে সকল লোককে কাটিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা এখনও তথা। বলিয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে ভয় দেখাইবার জন্য মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। অশোকবনে ঐ স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণীর অগ্নিভাগে আমার এক প্রকাণ্ড কটাহে পাকতৈল রক্ষিত ছিল। ঐ কটাহের উপর তামার চাকনিতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণদিগের বিবরণ লিখিত ছিল। কিন্তু ঐ কটাহ বা উহার চাকনি কে লইয়াছে, জানিবার উপায় নাই।

১২ জনেই রাজ্যাধিকার করিয়াছে, সুতরাং কে মাংস হইবে, তাহা লইয়া গোলযোগ

হইল। প্রতিদিন এক একজন রাজা হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল, পরে সকলেই বিরক্ত হইয়া একদিন পরামর্শ করিল যে, কল্য প্রাতে উঠিয়া অগ্রে যাহাকে দেখিব, তাহাকেই রাজা করিব। এ দিকে বিধাতার নির্ব্বন্ধক্রমে ঠিক ঐ দিন দুইটি রাজপুত্রবালক জগন্নাথদর্শনে যাইতে যাইতে সন্ধ্যাবেলা হইয়া ছাতনায় উপস্থিত হইল এবং রাজাদিগের দানশীলতার পরিচয় পাইয়া প্রতি প্রত্যুষেই ভিক্ষা করিবার জন্য রাজ-ভবনে প্রবেশ করিল। সেই সময় সভাসদ্গণ কাহাকে রাজা করিবে? এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। এমন সময় তাহাদের সম্মুখে দুইটি সর্ব্বসুলক্ষণ কুসুম-সুকুমার বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকদ্বয় আসিয়াই তাহাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহাদের আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, "মহারাজ আমরা জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছি, পথে নিঃস্ব হইয়া আপনাদের নিকট কিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।" সভাসদ্গণ বলিলেন, "আমাদের নিজের কিছুই নাই,—রাজ্য ধন, জন, যান, বাহনাদি যাহা কিছু সমস্তই আপনাদের হইয়াছে, আমরা কেবল আপনাদের আজ্ঞাবহ দাসমাত্র। এক্ষণে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে ও প্রজাবর্গকে পালন করুন।" এই বলিয়া তাঁহারা সেই বালকদ্বয়কে রাজোচিত অভিবাদন করিল। উভয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইল। কনিষ্ঠ এই অষ্টাদশ ঐশ্বর্য্যশালী ছাতনা রাজ্যে রাজা হইয়া রাজ্যের সামন্তগণের সাহায্যে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছাতীর রায় ও কনিষ্ঠের নাম উত্তর রায়। বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরা এই ছাতীর ও উত্তরের বংশধর। উত্তররায় বাণ্ডেশ্বরী দেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, উহার ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরের আচীর ও প্রধান দেবালয় ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। ঐ সকল ইষ্টকের অধিকাংশই লিপিযুক্ত। আমরা ঐ দেবালয়ে দুই প্রকার (এক প্রকার উচ্চাক্ষরের ও এক প্রকার গভীর অক্ষরের) খোদিত ইষ্টক দেখিয়াছি। উক্ত অক্ষরে খোদিত ইষ্টকে লেখা আছে—"শ্রীং ছাতনানগরের শ্রীং উত্তররায় সক ১৪৭৫"। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় বাহাদুর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধানের জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি এই স্থান সম্বন্ধে তাঁহার আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্টে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"About fourteen miles from Bankura on the old grand Trunk Road through Hazaribagh to Shahargharl at the village of Chatna are some ruins; the principal consists of some temples and ruins within a brick enclosure, the enclosure and brick temples that existed having long become shapeless mounds, while the laterite temples still stand; the bricks used are mostly inscribed, and the inscription gives a name which I read as Konara Utara-Raja, while the pandits read it as Hamira Utara Raja; the date at one part is Legible in all *viz.* sake 1476" (Arch. Sur. Rept. VIII. p. 199.)

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ ৺ কৃষ্ণা হইতে ছাতনার দূরত্ব ১৩ মাইল লিখিয়াছেন। উহা প্রকৃত পক্ষে ৮ মাইল হইবে। তিনি ও ইঁহার লিখিত ইষ্টকলিপি হইতে কোনও ইতিহাস বা হিন্দু-ভাস্কর্য্য-শিল্পের তথ্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং লিখিবার কিছু নাই। তবে অনুমানের উপরোক্ত মন্দির কবি মাণ্ডব্যের এবং ঐ মন্দিরের ইষ্টক সমূহে "শ্রীঃ ছাতনানগরের শ্রীঃ উত্তরায় সকে ১৬৭৫" লিখিত রহিয়াছে। আমরা সেই প্রাচীন ভগ্নমন্দির হইতে যে ইষ্টকখানি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারই অনুকরণে নূতন ইষ্টক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

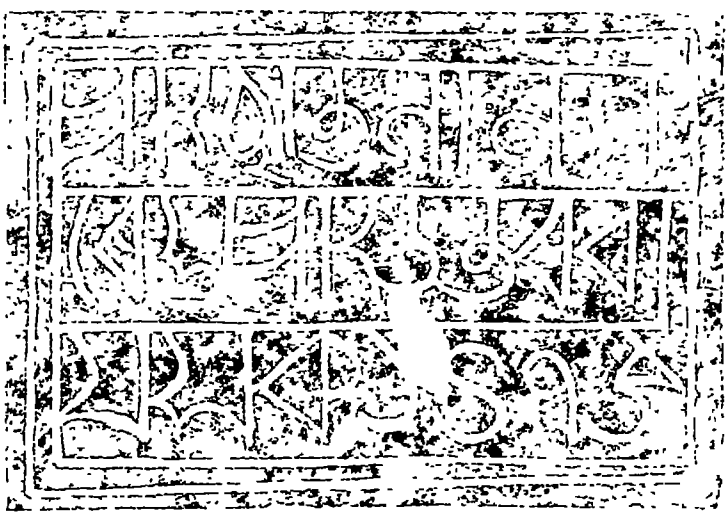

ইহাতে দেখিতে পাইবেন, "শ্রীঃ ছাতনানগরে। শ্রীঃ উত্তরায় সকে ১৬৭৫" লিখিত আছে।

পূর্ব্ববর্ত্তি প্রবাদবাক্য সত্য প্রকৃত হউক বা না হউক, কিন্তু উত্তরায় নামে যে একজন রাজা ছাতনায় রাজত্ব করিতেন, তাহা এই নামাঙ্কিত ইষ্টক লিপিই প্রমাণিত করিতেছে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ একণে নূতন করিয়া পাঠ উদ্ধার করুন না, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করিয়া দিতেছে।

যেখান হইতে এই ইষ্টকখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার আশে পাশে একটু খুঁজিলে হয়ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মন্দিরাকারে লিখিত ইষ্টক দেখিয়া প্রাচীন মন্দির বোধ হয়। এইরূপ ইষ্টকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে। আমরা ইহার একখানিও ইষ্ট পাই নাই। সুতরাং ইহার মেধা পত্তা অসম্ভব। সেই প্রাচীন মন্দিরের সাদা দরজা ও পশ্চিমের দেওয়াল প্রভৃতি

---

ইষ্টক-লিপির প্রতিকৃতি পাঠের জন্য দেখুন  প্রবাসী।  সম্পাদক

মণ্ডপ আজিও দণ্ডায়মান আছে। এই মন্দির বর্ত্তমান রাজপথের ঠিক উত্তরে অবস্থিত। এখন বাঙলী দেবী ঐ মন্দিরে নাই। প্রবাদ আছে, ইংরাজেরা যখন রাজধানী করিলে মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া গোরা পল্টন যাতায়াত করিতে লাগিল। বাঙলীদেবী তাহাতে ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দিলেন, "ফিরিঙ্গীর পায়ের ধুলা উড়িয়া আমার গায়ে লাগে, এজন্যে তুমি অন্য স্থানে লইয়া যাও।" তদনুসারে বিবেকানন্দ নৃপতি ১৩৫৫ শকে রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা ঐ মন্দিরস্থ খোদিত লিপিতে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরবাসবাচলবরশ্রীবাঙলীশ্রীযুতে
সর্ব্বাভীষ্টবরাপ্তিকর্ত্তৃশরভূসংখ্যে শকাব্দে শুভে।
সামন্তাধিপসীমরেন্দ্রবরেবর্দ্ধিষ্ণুশক্তি কেশরী
ভূভূল্লবসো বিবেক নৃপতিঃ সৌধং দদৌ দার্ঢ্যং॥"

অর্থাৎ, অনন্ত ও ইন্দ্রের ঈশ্বরত্বসম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীবাঙলী দেবীর প্রীতির জন্য শুভ মহাদেবের মুখ (১), মদনের বাণ (৫), ঋতু (ঋতু) ও বসু (৮) সংখ্যক শকাব্দে (অর্থাৎ ১৩৫৮ শকে) সামন্তাধিপতিগণকর্ত্তৃক সম্মানিত বর্দ্ধিষ্ণুশক্তি কেশরী ভূভূল্লবকুলোদ্ভব বিবেক নৃপতি (এই) প্রস্তরময় মন্দির দান করিয়াছিলেন।

এই মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে এবং দুই একখানি প্রস্তর খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরের উপরিপ্রকাণ্ড একেবারে সমূলে ভগ্ন হইয়াছে।

এখান এইরূপ, বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস ঐ বাঙলীর উপাসক ছিলেন এবং প্রাচীন মন্দিরের নিকট বাস করিতেন। তাহার পর ১২৭৯ সালে বর্ত্তমান বাঙলী মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহাতেই এখন বাঙলী দেবী আছেন।

উক্ত মন্দিরাদি ভিন্ন ছাতনায় আরও কএকটি অতি প্রাচীন-ভগ্নাবশেষ আছে। ছাতনার মধ্যস্থানে কানারপাড়ার পূর্ব্বে রাজবাটীর উত্তরে অনতিদূরে তিনটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী মূর্ত্তি প্রায় ৪ ফিট উচ্চ, উহার এক হস্তে দণ্ড ও অন্য হস্তে দণ্ড বিদ্যমান। আর একখানি পাথরে একটী ধনুর্ব্বাণি ও নির্ম্মিত একটী শিশু মূর্ত্তি আছে।

এই সামন্তরাজের স্থানান্তরে অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক পুরাতত্ত্ব বাহির হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

# কবি ঈশ্বরানন্দের "রাধিকামঙ্গল" ও তাহার সমালোচক

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-জগতে বিশেষ পরিচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক ও বৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে থাকিয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তিনি বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে যে ১৩ খানি বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরঋণে আবদ্ধ থাকিব। তাঁহার সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে কবি ঈশ্বরানন্দের 'রাধিকামঙ্গল' একখানি। গত কার্ত্তিকমাসের পরিষদে এই সম্বন্ধে একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। পুঁথিখানির পত্র-সংখ্যা ছয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি অবলম্বন করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় যে বিস্তৃত সমালোচনাটী লিখিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার গভীর যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার সকল কথা আমরা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না; সেইজন্য, এতে একে বলিতেছি।

বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সমালোচনার প্রথমে এই কয়েকটী বিষয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—১ ঈশ্বরানন্দ কোন্ সময়ের লোক? ২ তাঁহার বাড়ী কোথায়? ৩ তিনি কোন্ জাতি? এখানে বলা আবশ্যক যে, ঈশ্বরানন্দের "রাধিকামঙ্গল" এ সম্বন্ধে পরিচয় কিছু নাই।

১। যে সকল পুঁথিখানি সমালোচক মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে, তাহা ১২৮৬ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ শনিবার বেলা চারি দণ্ডের সময় সমাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রতিলিপি করিতে মাত্র একদিন এবং ৭০ বৎসর। ইহা হইতে বিদ্যানিধি মহাশয় কিরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশ্বরানন্দ এই সময়ের "বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী"। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না যে, কবি উক্ত সময়ের বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী কি করিয়া হইলেন। ইহা কি সম্ভবপর নহে যে কবি ১৪৩০ বৎসর বয়সে "রাধিকামঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন, এবং পুঁথি প্রণয়নের পরই সমালোচক মহাশয়ের প্রাপ্ত প্রতিলিপি খানি নকল করা হইয়াছিল?

কিন্তু সমালোচক মহাশয় এ সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেখাইতেছেন। নানা কারণে তাঁহার মনে হইয়াছে, কবি ইয়েজাধিকারের পূর্ব্বতন লোক। এই 'নানা কারণের' মধ্যে একটী মাত্র কারণ তিনি জগতে প্রচার করিয়াছেন। সে কারণটী এই;—"কবির রচনায় ইংরেজ শাসনের কোন তত্ত্ব, কোন পদার্থ, কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের নিদর্শন মাত্রও নাই।" আমরা সমালোচক মহাশয়ের এ কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাস্তবিক গ্রন্থে যদি কোন সময়ের কোন তত্ত্ব, কি পদার্থ, কি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত না থাকে, তবে সেই লেখক যে, সে সময়ের লোক হইতে পারেন না, এ যুক্তি আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তাহার পর, শ্রীমতী রাধিকার জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে ইংরেজ-আমলের ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি লেখার প্রয়োজনীয়তাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

তৎপরে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে, "কোন্ অব্দে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব, আর কখনই বা তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল, তাহার যুক্তিসঙ্গত কোন মীমাংসায় সমুপনীত হওয়া অসম্ভব। সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতারই একটা না একটা প্রতীকার আছে। অতএব এতৎ সম্পর্কেও হতাশ হওয়া সমীচীন নয়। দেখা যাউক কিসে কি হয়। আশ্বস্ত হইবার একটু স্থল আছে।" আমরা কিন্তু আশ্বস্ত হইবার স্থল কিছুই তাঁহার সমালোচনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। বোধ হয়, বিদ্যানিধি মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

২। কবির বাসস্থান।—এ সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় অতি অদ্ভুত যুক্তির দ্বারা অদ্ভুত মীমাংসায় সমুপনীত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পুঁথি হইতে একটী চরণ তুলিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, কবি কর্ত্তৃকারকে "প্রথম পুরুষ", কিন্তু উহার ক্রিয়াপদে "উত্তম পুরুষ" ব্যবহার করিয়াছেন। এখন উৎকল দেশে কর্ত্তা ও ক্রিয়া প্রয়োগের ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। সুতরাং সমালোচক মহাশয় সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উদ্ধবানন্দ উৎকলবাসী ছিলেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে, এই অনুমান অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। কারণ, "বাঙ্গালার প্রাচীন গদ্যলেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উড়িষ্যা ছিলেন, আর তিনি ব্রাহ্মণ।" তিনি আরও একটী অকাট্য প্রমাণ বা নিদর্শন পাইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার বৈতল-উত্তর বাড় গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মিত্রজ মহাশয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, মিত্রজ মহাশয়দিগের প্রদেশে "সারল বিরাট" বা "বৃহৎ বিরাট" নামে এক বাঙ্গালা পদ্য-পুস্তক আছে। তাহার প্রণেতা আপনাকে "উৎকল ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারা দুই জনে যখন উৎকলবাসী, তখন সমালোচক মহাশয়ের মতে উদ্ধবানন্দ উড়িষ্যার লোক না হইবেন কেন? সমালোচক মহাশয় যে যুক্তির দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরাও সেই যুক্তির দ্বারা কি বলিতে পারি না যে উদ্ধবানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন? বিদ্যানিধি মহাশয়ের বোধ হয় উদ্ধবানন্দের জাতি নির্দ্দেশ করিবার সময় ঐ কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিস্মৃত হইয়াছেন।

এখানে সমালোচক মহাশয়ের নিকট আমাদের একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তিনি কি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, এক উৎকল দেশ ভিন্ন আর কোথাও এরূপ কর্ত্তা ও ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই? আমরা কিন্তু অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির পদে কর্ত্তা ও ক্রিয়ার এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাই। সমালোচক মহাশয় কি তাঁহাদের সকলকেই উৎকলবাসী বলেন?

৩। জাতি-নিরূপণ।—সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন যে, অন্যান্য কবির ন্যায় উদ্ধবানন্দ স্বীয় গ্রন্থে আপনাকে "দ্বিজ" বা "দাস" বলিয়া বিশেষিত করেন নাই। সুতরাং

কবি "ব্রাহ্মণ" কি "ব্রাহ্মণেতর বর্ণ" তাহা সাব্যস্ত করা সমালোচক মহাশয়ের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া পড়িল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কবিতার ভণিতায় আপনাদিগকে "দাস" বলিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস, জ্ঞানদাস, পরমানন্দদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাহার পর বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন যে, উপাধি দেখিতে পাইলেও কবির জাতি নিরূপণ করা যাইত। তিনি কি কৌশলবলে ইহা নিরূপণ করিতেন, তাহার একটী উদাহরণও দিয়াছেন। যেমন, এই পুঁথি-পাঠকের নাম "শ্রীমধুসূদন আশ।" এই "আশ" উপাধি দেখিয়া সমালোচক মহাশয় পুঁথি-পাঠকের জাতি নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্তুবায়, সুতরাং বস্ত্র-বয়ন তাহার জাতি-বৃত্তি! কিন্তু তন্তুবায় ভিন্ন অন্য জাতিরও "আশ" উপাধি আছে, তাহা বোধ হয় সমালোচক জ্ঞাত নহেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পুঁথি-পাঠকের বাসস্থান কোন্ জেলায় তাহাও সুন্দররূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পুঁথিতে লেখা আছে যে পুঁথি-পাঠকের বাসস্থান "শ্যামপুর-গ্রাম"। কিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্যামপুর বাঁকুড়া জেলায়। এই "কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান"টী যে কি, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তবে তাঁহার অবলম্বিত পুঁথিখানিও বাঁকুড়া জেলা হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং তাঁহার মতে, শ্যামপুর যে বাঁকুড়া জেলান্তর্গত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। কি সুন্দর যুক্তি!

এইত গেল কবির কথা। তাহার পর সমালোচক মহাশয় কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পুঁথির সমালোচনা এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(ক) পুঁথির নামকরণ; (খ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব; (গ) ভাষা; (ঘ) ছন্দ; (ঙ) কাব্যের মিলন; (চ) ব্যাকরণ দোষ; (ছ) কবির কল্পনাশক্তি।

(ক) পুঁথির নামকরণ।—উদ্ধবানন্দ তাঁহার পুঁথির নাম কেন "রাধিকামঙ্গল" রাখিলেন, তৎসম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "পূর্ব্বাচার্য্য চৈতন্য-মঙ্গলকার লোচন-দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ, উদ্ধবানন্দের পক্ষে শ্রেয়স্কর ও মনঃপুত কার্য্য বিবেচিত হইয়াছিল। তাই তিনি "রাধিকামঙ্গল" নাম দিয়া অভীষ্ট দেবতার মহিমা-কীর্ত্তন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।" এ বেশ কথা। কিন্তু এখানে একটী রহস্যের কথা বলিব। বিদ্যানিধি মহাশয় পরিষদের সভায় যখন এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন, তখন সেখানে অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্ত কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, "বিদ্যানিধি মহাশয় যে লোচনদাসের প্রণীত চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে তাহা ঠিক নয়। চৈতন্যমঙ্গল বৃন্দাবন দাসের প্রণীত, কিন্তু লোচনদাসের প্রণীত নহে।" গোস্বামী মহাশয়ের উত্থিত কথা গুলির মধ্যে একটু রহস্য আছে। ইনি প্রভু নিত্যানন্দের সন্তান। প্রভু নিত্যানন্দের সহিত ঠাকুর নরহরির বরাবরই একটু খটমটি চলিত। এমন কি, প্রভু নিত্যানন্দের

শিষ্য বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে গৌরভক্তে ঠাকুর নরহরির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। নরহরি ঠাকুর মহাপ্রভুকে চামর বাজন করিতেন। বৃন্দাবনদাস সেই লীলার বর্ণনাস্থলে নরহরির নাম উল্লেখ না করিয়া, লিখিলেন, "কোন কোন ভাগ্যবান নামের দুলাল।" বৃন্দাবনদাস প্রভু নিত্যানন্দের আদেশক্রমে এই লীলাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ইহার নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখেন। এই গ্রন্থের কথা শুনিয়া ঠাকুর নরহরি উহা দেখিবার জন্য বৃন্দাবনদাসের বাড়ীতে গমন করেন। কিন্তু কোন কারণেই হউক, গ্রন্থখানি তাঁহার দেখা ঘটে নাই। তিনি ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন, এবং তাঁহার শিষ্য ও প্রধান শিষ্য লোচনদাসকে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে লীলাবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিতে অনুমতি দেন। লোচন বা লোচনদাসও তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখেন। তিনি বোধ হয় তখন জানিতে পারিয়াছিলেন না যে, বৃন্দাবনদাসও তাঁহার গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিয়াছেন। যাহাহউক, দুই গ্রন্থের এক নাম হইতে পারে না। শেষে বৃন্দাবনদাসের মাতা শ্রীমতী নারায়ণী ঠাকুরাণী মধ্যস্থা হইয়া এই নাম-করণের বিবাদ মিটাইয়া দেন। তিনি লোচনদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং উহারই নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিতে অনুমতি দেন। আর, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখিতে বলেন। এখন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বড় নিত্যানন্দের সন্তান। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি লোচনদাসের "চৈতন্য মঙ্গল" বলিয়া যে একখানি গ্রন্থ আছে, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। যখন এ কথা উত্থাপন করিলাম, তখন এ সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থ লিখিয়াই উহার প্রতিলিপি বৃন্দাবনের গোস্বামীপাদদিগের অনুমোদনার্থে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ইহা পাঠ করিবার পর তাঁহার "চৈতন্য-চরিতামৃত" প্রণয়ন করেন। তখন ইহার নাম "চৈতন্য-মঙ্গল" ছিল, এবং তখন লোচনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" লিখিত হইলেও বৃন্দাবনে প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং কবিরাজ ঠাকুর তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" অনেক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭) ঐতিহাসিক তত্ত্ব।—"রাধিকা-মঙ্গল" হইতে সমালোচক মহাশয় যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যথা, "নূপুর", "সোণার বাঁশী", "ঝুরি", "পরশ শঙ্খ", "নূপুর" ও "সোণার চুড়ি"। তিনি যে এই সমুদায় অতি আবশ্যকীয় "ঐতিহাসিক তত্ত্ব" নিষ্কাশিত করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে প্রকৃতই "বিস্মিত ও পুলকিত" হইবারই কথা। তবে এইখানে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি। যখন রাধিকামঙ্গলের মধ্যে ইংরেজ আমলের "ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও পদার্থ"—সোণার চুড়ি আছে, তখন তিনি "ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বতন শ্লোক" কি করিয়া হইলেন?

(খ) ভাষা।—বিদ্যানিধি মহাশয় বলিতেছেন, "সকল ভাষায় কবি যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরী।" যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে জোর করিয়া সংস্কৃত-বাঙ্গালা বা অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভাষা করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উহা "যথেষ্ট বাহাদুরী," সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তাঁহার বৈষ্ণব-কবিদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করা অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে উদ্ধবানন্দের সরলভাষা দেখিয়া তিনি এত আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না।

(ঘ) ছন্দ।—সমালোচক মহাশয় এই পুঁথি হইতে একটী নূতন ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছেন। ছন্দটীর নামকরণ এখনও হয় নাই। এই ছন্দের মিলন তিন চরণে। যথা—

"শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ ভজ এক মনে।
শ্রীরাধিকার ধর্ম্মকথা শুন সাবধানে।
সূর্য্য আরাধন করে অপত্য কারণে॥"

আমাদের কিন্তু বোধ হয় লিপিকার নকল করিবার সময় তৃতীয় চরণটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাহা না হইলে, "সূর্য্য আরাধন করে" ইহার কর্ত্তা কে? বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার নূতন ছন্দের আরও দুইটী উদাহরণ দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের বোধ হয়, লিপিকরের ভুলে উহাদেরও এক একটী চরণ পড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর সমালোচক মহাশয় ছন্দের দোষ ধরিয়াছেন, কারণ পুঁথির সকল পাদে তিনি অক্ষরের সমতা পান নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছাড়িয়াছে তাঁরে।
ভাগ্যবলে আজি আমি আইলাম তোমার ঘরে॥"

বিদ্যানিধি মহাশয় এই কবিতার প্রথম চরণটী গণিয়া সতরটন প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাঁহে অক্ষর পাইয়াছেন; কিন্তু শেষ চরণে যেখানে সতেরটী অক্ষর। এখন এই ভ্রম প্রমাদ কবির নিজের ত্রুটীতে, কি লিপিকরের অমনযোগিতায় ঘটিয়াছে, সমালোচক মহাশয় তাহারই বিচার করিতে বসিলেন। বিচারে গরীব লিপিকরই দোষী সাব্যস্ত হইলেন। তাহার পর বিচারক মহাশয় শেষ চরণটী সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রথমতঃ "আমি" শব্দ বিলুপ্ত করিয়া দেখেন ছন্দঃপাত ঘটে না; অধিকন্তু উহাতে না ব্যাকরণ বোধ, আর না অর্থ হানি, কিছুই হয় না। কিন্তু তাহাতেও দেখেন, অক্ষরের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তিনি তাহারও ব্যবস্থা করিতে ত্রুটী করেন নাই। "তোমার ঘরে" পরিবর্ত্তে "তোমা ঘরে" ধরিয়া লইয়া দেখেন, সকল দিক বজায় থাকে। অর্থাৎ একমাত্র "র" বর্জ্জিত হইলে, তাঁহার আপদের শান্তি হয়। এখন সমালোচক মহাশয়ের সংশোধিত চরণ দুটী কিরূপ হইয়া দেখা যাউক:—

"বৈদ্য বলে বায়ুদোষ ছাড়িয়াছে তাঁরে।
ভাগ্যবলে আজি আইলাম তোমা ঘরে॥"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি উদ্ধবানন্দ ইংরের আদর্শের সুশিক্ষিত পণ্ডিত নহেন। তাই তিনি কবির কবিত্বগর্ব্ব ত্যাগ প্রভৃতি দেখে চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দোদোষ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বলিতে কি, এই সংশোধিত চরণ অপেক্ষা কবির নিজ চরণটি আমাদের নিকট অধিক মিষ্ট বোধ হইতেছে।

কিন্তু এগুলি মাত্র ত্রুটী বর্ণনা নয়। বারংবার এরূপ ত্রুটী অমার্জ্জনীয়। কবি সাধারণ এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। যথা—

"যাহারে ভাবিছ তুমি, গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি,
এলনার দমন দাও।"

"গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" এই অংশ একারটী অক্ষর আছে। সমালোচক মহাশয় ইহাও কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে "আইলাম" স্থলে "এলাম" করিলেন, কিন্তু দেখেন, তথাপি ঐ বর্ণের আধিক্য থাকিয়া যাইতেছে। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া "গোলোক ছাড়ি আইলাম আমি" স্থলে "গোলোকের হরি আমি" বসাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পরেও একটু গোলযোগ হইতে দেখিয়া একরূপ হতাশ হইয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে, "এমন স্থলে মাত্রাগত হস্বদীর্ঘ পড়িলে মূলরস সংক্ষুণ্ণ বা খণ্ডিত হয় না, কিন্তু ছন্দের ও বিষয়ের হয়।" আমরাও বলি, কারণ বোধের উপর হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।

(৩) কাব্যের বিশেষ—সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "গ্রন্থে হীন মিলনের অভাব নাই।" প্রাচীন বাঙ্গালা-কবি অনেক স্থলে ঐরূপ হীন মিলনের দৃষ্টান্ত দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কবিতার মিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বলা বাহুল্য, প্রাচীন কবিরা অনেক স্থলে ভাবিয়া কবিতা লিখিতেন না। তাঁহারা ভাবুক ছিলেন, সুতরাং কবিতা লেখা তাঁহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইত না, উহা স্বাভাবিক তাঁহাদের ভাবপূর্ণ হৃদয় হইতে বাহির হইত।

(৪) ব্যাকরণ-দোষ।—বিভাবিনোদ মহাশয় পুঁথিতে অনেক ব্যাকরণের দোষ দেখাইয়াছেন। যেমন, বিনেত্র শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, দ্বীপিদের পরিবর্ত্তে পুলিন্দ প্রয়োগ, প্রথম পুরুষের স্থানে উত্তম পুরুষ প্রযুক্ত ইত্যাদি।

কিন্তু এ দোষ উদ্ধবানন্দের নহে, তিনি যাহাদের পদার অনুসরণ করিয়াছেন, সেই সে তাদের কবিগণের দোষ।

কোন ভক্ত যখন মন প্রাণ খুলিয়া শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার শুদ্ধ, অশুদ্ধ, ধাতুর দিকে দৃষ্টি থাকেনা ও থাকিতে পারেনা। সেইরূপ কবি যখন ভাবাবেশে সাহিত্য রচনা করেন, তখন তাঁহার কাব্যের অক্ষর মিল কি ব্যাকরণ দোষের দিকে বড় দৃষ্টি থাকেনা। তাই প্রাচীন কবিদিগের পদে এই সকল দোষের এত প্রাদুর্ভাব। কিন্তু তাহাতে কবিতার মিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

(৮) কবির কল্পনা-শক্তি।—সমালোচক মহাশয় উদ্ধবানন্দের কল্পনা-শক্তি দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি চিরকাল শুষ্ক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং উক্তরূপ কল্পনা-শক্তি তাঁহার নিকট চিত্ত-চমৎকারিণী হইবারই কথা। যে সমস্ত বঙ্গীয় কবিদের কবিতার সামান্য আভাস লইয়া উদ্ধবানন্দ তাঁহার "রাধিকা-মঙ্গল" লিখিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যানিধি মহাশয়কে সেগুলি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, "রাধিকার রূপ যথা দশ ইন্দু" প্রভৃতি তাঁহাদের লেখার মধ্যে ছড়াছড়ি। এ বর্ণনা উদ্ধবানন্দের নূতন নহে, এবং ইহাতে তাঁহার "বিশেষ প্রশংসা যোগ্য"ও কিছু নাই।

যাহা হউক পুঁথিখানি সংশোধন করিতে সমালোচক মহাশয় অভিনব ক্লেশ পাইয়াছেন। বিদ্যাতঃ কিশিলয়ের প্রসাদে তাঁহার কিয়দংশ রামে ঠেকিতে হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, তিনি উহা কিরূপে সংশোধন করিয়াছেন।

সমালোচক মহাশয় পুঁথির এক স্থানে পাইয়াছেন, "গণিত কাঞ্চন জিনি, রাত্রবরণ খানি।" তিনি ঐ অংশ সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, "কম্বিত কাঞ্চন জিনি, রাত্রাবরণ খানি।" এইটী পড়িয়া ও মানের বোধ হইতেছে যে, তিনি মূলগ্রন্থ একটিবার পুঁথি পাঠ করা আবশ্যক মনে করেন নাই এবং সেই জন্যই তিনি মনুষ্যতঃ অবগত নহেন যে, প্রাচীন লেখকগণ "ল" ও "ণ" একই প্রকার লিখিতেন। সুতরাং এখানে "গণিত" স্থানে "লণিত" না হইয়া "লাণত" হইবে। আর, "রাত্রবরণ" স্থানে "গাত্রাবরণ" না লিখিয়া "গাত্রের বরণ" কি "গাত্র-বরণ" হইলেই ভাল হয়।

এক্ষণে তিনি "রাধিকামঙ্গল" পুঁথির যেরূপ সংশোধন করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দিয়া আমরা প্রবন্ধটী শেষ করিব। যথা,—

"এই মত ক্রমে কৃষ্ণ মাসি পরবেশে।
আনন্দ বাড়িল বহু রাজার আবেশে।
শুক্ল অষ্টমী তিথি ভাদ্র-পদ মাসে।
আতার বৈদ্য মাই [illegible] আবেশে॥"

P 36,234

দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের "আবেশে" কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় "আবেশে" হইবে।

"নিকলঙ্কুনোনী চাঁদ উদয় হইল
এতদিনে গগনে চান্দের দোষ টুটিল॥"

"গগনে চান্দের" স্থলে "নিশল-চান্দের" হওয়াই বোধ হয় ভাল হয়।

"নাম মোর বসুমতী ভাঙ্গা নদি মাটি।
রাই-পদ লাগে যেন আঁচো মুনি॥"

শেষ চরণে "আঁচা মুনি"র পূর্ব্বে বোধ হয় এক টী কথা পড়িয়া গিয়াছে।

"লাখান হেন বাণী রাখে বদনকমলে।"

"হেন বাণী" অর্থ কি? বোধ হয় "লাখবান হেম বাণী" হইবে।

"রাতির উজানে রাখা রহে হেট মাথে।"

এখানে "উজানে" অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। "উঠানে" হইলে কিছু মানে হয়।

"রাজাং বিরস দেখি কহে নারদ মুনি।
আজিও কেন দেখিতে তোমার হরষিত নারী॥"

শেষ চরণ হইতে বোধ হয় একটী "না" পড়িয়া গিয়াছে।

"নারদ আসিয়া ডাকে [illegible] লইয়া যাবে—
চিত্রগুপ্ত আকার না দিতে।"

আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন অর্থ করিতে পারিলাম না। মহাশয় এইরূপ হইতে কি পারে না?

"নারদ আসিয়া ডাকে, শিব নন্দি লৈয়া থাকে,
চিত্রগুপ্ত আকার না দিতে।"
"অমৃত পাইয়া মুনি, বিদায় করিল তুনি,
এই শিশু দুকড়িচরণে।"

এখানে "অমৃত" স্থলে "সন্বিত" এবং "তুনি" স্থানে "পুনি" (পুনঃ) হইলে ভাল হয় না কি?

"ধূপ দীপ মালা [illegible] পুষ্প মাল্য চন্দন।"

বোধ হয় এখানে একটী 'দান' [illegible] হইয়াছে।

"দুকড়ানুপুরের লোক ডেকে ডেকে বলে।
গগন ছেড়্যা চান্দ কিবা তুমি চরি তুলে॥"

"তুলে" স্থলে বোধ হয় "কুলে" হইবে।

ক্রমে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে, সুতরাং এখানেই সমাপ্ত করিলাম। কবি, "শ্রীকবিচন্দন" মুন্সি যাহা কলিকাতার সাহিত্য-পরিষদে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এত ভুলে পরিপূর্ণ যে অনেক স্থলে অর্থ করা কঠিন। যাঁহাদের হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করা অভ্যাস আছে, পত্রিকায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কাহাকে দেখাইয়া লইলেই ভাল হইত।

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ।

# বঙ্গীয় সংবাদপত্র।

ইতিপূর্ব্বে আমরা সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকায় বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের তালিকা প্রকাশ করিয়াছি। অদ্য সংবাদপত্রের তালিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের এই সমস্ত তালিকা যে ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য নহে, তাহা আমরা বিশেষরূপ অবগত আছি। কিন্তু ক্রমে এরূপ তালিকা সঙ্কলিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহের পথ পরিষ্কৃত হইবে বলিয়াই আমরা এই দুরূহব্যাপারে হস্তক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভরসা করি, সুহৃদয় পাঠকগণ আমাদিগের উদ্দেশ্যের সাধুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ত্রুটিজনিত অপরাধ হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন এবং সাময়িক ও সংবাদপত্রসমূহের তালিকা সংগ্রহে যে সমস্ত ভ্রম সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশপূর্ব্বক সংশোধনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

শ্রীরাজবিহারী দাস।

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|
| অনুবাদিকা | ... অপ্রকাশিত | অমৃত | ... অপ্রকাশিত |
| অবলাবান্ধব | ... দ্বারকানাথ গঙ্গো (১) | অমৃতবাজারপত্রিকা | ... শিশির কুমার ঘোষ (২) |
| অবকাশরঞ্জিকা | ... ঢাকা হইতে প্রকাশিত | অরুণোদয় | ... ব্রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে |
| অপূর্ব্ব পঞ্চায়ৎ | ... অপ্রকাশিত | অরুণোদয় | ... পঞ্চানন বন্দ্যো |
| অবোধবোধিনী | ... ঐ | আক্কেল দেলুন | ... ব্রজনাথ (৩) |

(১) নারীজাতির কল্যাণ-কামনায় বঙ্গদেশে যে সমস্ত পত্র প্রচারিত হইয়াছে, ইহা তাহাদিগের অন্যতম। কুলীন ব্রাহ্মণ ও ইংলিশম্যান পত্রিকাপ্রণেতা মোলসিংহ গ্রাম হইতে ১৮৬১ খৃঃ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধবের প্রচার আরম্ভ হয়। একবৎসর পাক্ষিকরূপে তাহা হইতে প্রকাশিত হইয়া পরে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচবৎসর কাল যথানিয়মে প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে বন্ধ হয়। কলিকাতায় আসিবার কিছুদিন পরে ইহা মাসিক আকারে পরিণত হয়। এই পত্রের লেখকগণ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

(২) ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে মোলা পিপাবের অন্তর্গত অমৃতবাজার গ্রামক স্থান হইতে এই বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথমতঃ বাহির হয়। প্রথমতঃ ইহা কেবল বঙ্গভাষায় লিখিত হইত। পরে কলিকাতা রাজধানী হইতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটনের ভীষণ মুদ্রা শাসনী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে অমৃতবাজার সাহসিক কলেবর পরিত্যাগ করে। এক্ষণে ইহা প্রাতাহিক হইয়াছে। অমৃতবাজারের তীব্র লেখনী দেশবিখ্যাত।

(৩) ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। বাবু রাজনারায়ণ বসু তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় লিখিয়াছেন, "ইহার লিখন ভঙ্গী দেখিয়া লোকের আক্কেল যথার্থই গুড়ুম হইত।"

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|
| আনন্দবাজার পত্রিকা | হেমন্তকুমার ঘোষ (৪) |
| আলোচনা | ... অপ্রকাশিত (৫) |
| আর্য্যদর্পণ | ... ঐ |
| আর্য্যমুকুর | ... ঐ |
| আর্য্যাবর্ত্ত | ... ঐ |
| উচ্চশিক্ষা-প্রতিনিধি | ... অপ্রকাশিত |
| উদ্বোধন | ... ঐ |
| উষা বা বড়িয়া দর্পণ | ... ঐ |
| এডুকেশন গেজেট | ... রাজকৃষ্ণ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (৬) |
| কল্পদ্রুম | ... অপ্রকাশিত |
| কবি | ... ঐ |
| কাব্যপ্রকাশ | ... (ঢাকা হইতে ও মুদ্রিত) |
| কাব্যপ্রকাশ | ... উমাকান্ত বন্দ্যো। |
| কালভৈরব | ... অপ্রকাশিত |
| কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা | কাশীনাথ মিত্র |
| কাশীপুরনিবাসী | ... (বরিশাল হইতে প্রকাশিত) |
| কুমারী পত্রিকা | ... অপ্রকাশিত |
| কুসুমদহ | ... ঐ |
| কৌমুদী | ... ঐ |
| কৌস্তুভ | ... নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ |
| গার্হস্থ্য গেজেট | ... দে ফ্রাঙ্কি পার্থ্যান, হে ব্রাউন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু (৭) |

(৫) ১৮৫৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অনুষ্ঠানাদি দ্বারা উদ্বেগীকৃত পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ বৎসর এই পত্র প্রকাশিত হয় বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা ইহা যথার্থ প্রতিপন্ন হইতে সমর্থ হই নাই।

(৬) এখানে বলা আবশ্যক এই পত্র সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয় এডুকেশনাল গেজেট নামে প্রকাশিত হয় নাই, ইহার নাম ছিল 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'। পরে কিছুদিন বন্ধ থাকিয়া পুনরায় প্রকাশিত হয়।

(৭) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেবের চেষ্টায় তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের হস্তে এই পত্রখানি প্রদান করা হয়। তদ্রূপ সিদ্ধান্তানুসারে এই পাদ্রী সাহেব তখন ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং তদনুসারে বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহকারী হইয়া পত্রিকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাহা কতদিন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের হেরাল্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও কয়েকটি প্রবন্ধ উক্ত পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। পাদ্রী সাহেব সহিত বাবু প্যারীচরণ সরকারের সম্পাদিত হয় এবং তিনি সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। অনন্তর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও সাহেবের অনুরোধে কার্য্য ভারগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে ডিসেম্বর হইতে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তদবধি রাজনীতিক বিষয়ে এই পত্রের কোন সম্পর্কতা নাই।

(৮) ১৮৩০ সালের ৩১ জুলাই হইতে এই সংবাদপত্র বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক প্রসিদ্ধ পাদ্রী ডাক্তার মার্শম্যান সাহেব সর্ব্বপ্রথম এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|
| গরিব | ... কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য |
| গুণাকর | ... অপ্রকাশিত |
| গোয়ালপাড়া হিতসাধিনী | |
| গ্রামদূত | ... (রাধারগঞ্জ হইতে প্রকাশিত) |
| গ্রামবাসী | ... (রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত) |
| গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা | হরিনাথ মজুমদার |
| চারুবার্ত্তা | ... অদ্বৈতচরণ বসু, দীনেশচরণ বসু |
| চারুসিন্ধির | ... [illegible] প্রকাশিত) |
| চিত্তরঞ্জিকা | ... (ঢাকা হইতে প্রকাশিত) |
| চুঁড়া বার্ত্তাবহ | ... (চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত) |
| জগদ্দীপ | ... অপ্রকাশিত |
| জগৎবার্ত্তা | ... |
| জ্ঞানবিকাশিনী | ... (গোবনা চাটমোহর হইতে প্রকাশিত) |
| জ্ঞানদীপিকা | ... ভগবতীচরণ |
| জ্ঞানার্জ্জন | ... চৈতন্যচরণ অধিকারী |
| জ্ঞানরত্নাকর | ... ভারণীচরণ রায় |
| জ্ঞানচন্দ্রোদয় | ... রাধানাথ বসু |
| জ্ঞানপ্রদায়িনী | ... বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় |
| জ্ঞানদর্পণ | ... উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় |
| জ্ঞানান্বেষণ | ... রসিককৃষ্ণ মল্লিক (৮) |
| জ্ঞানোদয় | ... চন্দ্রশেখর |
| জ্ঞানোদয় | ... অপ্রকাশিত |
| ঢাকাগেজেট | ... শশীভূষণ ঘোষ |
| ঢাকাপ্রকাশ | ... কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দপ্রসাদ রায় গুরুগোবিন্দ চৌধুরী (৯) |

---

ত্রের ক্রমান্বয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুকূলক জে বার্চ্চন সাহেব, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু চন্দ্রনাথ বসু ইহার সম্পাদকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রে গবর্ণমেণ্ট কৃত নানাবিধ বিজ্ঞাপন, রাজকীয় বিধি ব্যবস্থা ও রাজকর্ম্মচারিগণের নিয়োগাদির অনুজ্ঞা পত্রসমূহ সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

(৮) ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে এই পত্র প্রচারিত হইয়া ত্রিবার্ষিকবর্ষ কাল স্থায়িত্ব ছিল। তদানীন্তন হিন্দু কালেজের হিতৈষিত্ব কতিপয় ইয়ংবেঙ্গল নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

(৯) বঙ্গীয় ১২৬৭ (১৮৬২ শক) সালের ৫ই চৈত্র তারিখে ঢাকা নগর হইতে এই সুবিখ্যাত পত্রের প্রচার আরম্ভ হয়। ঢাকাস্থিত বাঙ্গালা ও বঙ্গীয় কৃষিবিদ্যা-লেখক মৃত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, তৎকালিক জগদীশচন্দ্র বসুর পিতৃব্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু ও বাবু চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতির প্রযত্নাতিশয়ে পূর্ব্ববঙ্গের এই প্রাচীন ও প্রধান সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। সত্যবাদীশতক প্রণেতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সর্ব্বপ্রথম ইহার সম্পাদক পদে বরিত হয়েন। তৎকালে ঢাকাপ্রকাশ একপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইত যে, উহা সোমপ্রকাশ

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|
| সুধাকর | ... দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ | ... | ... অক্ষয়কুমার দত্ত |
| সাপ্তাহিক | ... ভাবিনীচরণ বসু | বৈদ্য | ... কেদারমোহন গোস্বামী (১৩) |
| হিতোপদেশক | ... অজ্ঞাতনামা | বৈদ্যহিতকারী | ... অজ্ঞাতনামা |
| হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যাদীপ | ... | | |
| হিন্দু-প্রকাশ | ... | হিন্দুকেতু | ... কালীপ্রসন্ন ঘোষ |
| হিন্দু | ... সর্ব্বদা পাঠক দুষ্টা হইতে অজ্ঞাতনামা | যুগকেতু | ... কাঁকিনা (চন্দননগর হইতে প্রকাশিত) |
| হিতবিলাস | ... ঈশ্বরনাথ মুখোপাধ্যায় | যুগবিপ্লব প্রতিবাদ | ... (কালীঘাট হইতে প্রকাশিত) |
| হিতবাদী | ... গৌরীদাস গুপ্ত | যুগান্তর | ... যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১১) |
| হিতবাদী | ... গোপালচন্দ্র | | |
| হিতকল্প | ... অজ্ঞাতনামা | | |

...ন্দ্র বহিয়া গিয়াছে। বাবু কৃষ্ণকুমার ... "বঙ্গবাসী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ... বাবু গোবিন্দপ্রসাদ ... "হিতবাদী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ... ইহার সম্পাদকীয় ভাগ ... বিশেষ ভাবে লাভ করে। ... গোবিন্দচন্দ্র সাহের মৃত্যু হইলে ... বাবু উমেশচন্দ্র ... বাবু ভোলানাথ চৌধুরী বর্ত্তমান পরিচালিত হইয়া একবার কার্য্যরক্ষ হইয়াছিলেন।

... হইতে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন সমাচারচন্দ্রিকা ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(১১) ... ১৩০০ সনের ... পিতা বাঙ্গালা সুবোধচন্দ্র আনন্দবাজার বিক্রয় করিলে তাঁহারা ... নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এই সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট মুচলেকা দেন। দ্বারকানাথ মহাশয় মুচলেকা দিয়া পত্রিকা বাহির করিতে ... করেন এবং সোমপ্রকাশ উঠাইয়া দেন। সোমপ্রকাশ ... সংবাদপত্র ছিল। ইহার ... বিরোধে ... পরিচালন করিতে ... প্রস্তুত ও ... হইলেন। সোমপ্রকাশের অভাব ... পূরণ করিবার জন্য ... ১২৮৫ সালের ... মাসে "বঙ্গবাসী" প্রচারিত হয়। ... দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ... প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী ... পালি ইংরাজীর ... সম্পাদক ... এই পত্রের ... ভার গ্রহণ করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ... আলোচনা ... বঙ্গবাসী বলিয়া গণ্য হইল এবং সর্ব্বাপেক্ষা ... পত্রিকা ... হইল। কিন্তু ... পরিচালনে ... বাবু ... হইল। ... বাবু ... বঙ্গবাসীর ... করিয়া ... পরিচালনার ... বঙ্গবাসী ... বিলুপ্ত হইয়া গেল। ... বিভাকরের ... পরিচালনে ... বাহির হইতে লাগিল।

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|
| নবযুগ | ... দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। | পল্লীবাসী | ... অপ্রকাশিত |
| নব মেদিনী | ... ( মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত) | প্রতিবাসী | ... ভগবতীচরণ বন্দ্যো। |
| নদীয়াবাসী | ... অপ্রকাশিত | প্রতাতী | ... যাদবেশ্বর মুখো। |
| নগেন্দ্র বিনোদিনী | ... " | প্রভাত-সমীর | ... দুর্গাচরণ বন্দ্যো। |
| নিশাকর | ... নীলকমল দাস | প্রয়াগ-দূত | ... অপ্রকাশিত |
| পতাকা | ... জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় | পরিদৃশ্যমান-হিতৈষিণী | ... " |
| পথাপ্রদান | ... অপ্রকাশিত | পল্লীবাসী | ... যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ( ) |
| পারিষদক | ... অগদ্মোহন তর্কালঙ্কার | পল্লীদূত | ... নীলরত্ন চট্টোপাধ্যায় |
| পরিদর্শক | ... ( শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত ) | পতিব্রতাপত্নী | ... মিত্র কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত |
| পাষণ্ড পীড়ন | ... ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | পল্লীবন্ধু | ... ( ঢাকা হইতে প্রকাশিত ) |
| পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী | ... ( চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ) | পল্লীরবি | ... অপ্রকাশিত |
| প্রজাবন্ধু | .. (চন্দননগর হইতে প্রকাশিত) | পল্লিবাসী | ... মহেশচন্দ্র পাল, উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যো। |
| প্রতিধ্বনি | ... অপ্রকাশিত | | |
| প্রতিবার্ত্তা | ... (বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ) | | |

(১৭) ১৮১৮ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে কলিকাতা কলেজষ্ট্রীটে এই বিখ্যাত পত্রের জন্ম হয়। "বঙ্গবাসী" প্রকাশের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এমন বিস্তৃতি কি প্রভাব ছিল, না। যদিও 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি অল্পমূল্যের দুই একখানা পত্র ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সমস্ত পত্র সাধারণ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। অল্পমূল্যে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মধ্যে "বঙ্গবাসী" ই প্রথম। বঙ্গবাসীর অনুকরণে এদেশে অনেক পত্রের প্রচার হইয়াছে, কিন্তু শুধু গরিমায় বা গ্রাহক সংখ্যার প্রাচুর্য্যে কেহই অদ্যাপি "বঙ্গবাসীকে" অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, বাঙ্গালাদেশে ইংরেজী বাঙ্গালা কোন সংবাদ পত্রেরই বঙ্গবাসীর তুল্য গ্রাহক সংখ্যা নাই। বঙ্গবাসীর গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চয়ই সহস্রেরও অধিক হইবে।

(১৮) ১৮৯০ খৃঃ অব্দে (১২৯৭ বঙ্গাব্দে) এই পত্র বঙ্গবাসীর অনুকরণে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হ

| পত্রিকার নাম। | পরিচয়ের নাম। | পত্রিকার নাম। | পরিচয়ের নাম। |
|---|---|---|---|
| অধিবাসী-প্রকাশিকা ... | জগদ্বান্ধব (১৫) | বাঙ্গালা এডুকেশন গেজেট | কৃষ্ণকিঙ্কর নাগ |
| বালিকা বোধিনী ... | ঐ | বারুণী ... | বারকানাথ মুখো |
| বিদ্যাকল্পদ্রুম ... | ঐ | বিবিধার্থ ... | বিবিধার্থ সংগ্রহ |
| বিদ্যোৎসাহিনী ... | ঐ | বিক্রমপুর ... | বিক্রমপুরবাসিনী (১৬) |
| মাসিকপত্রিকা ... | (বহিরাদির সূচীতে দেখুন) | বিক্রমী ... | কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপা |
| মাসিকপত্র ... | বাঙ্গালাপত্রিকা | বিক্রমী ... | অজ্ঞাতনামা |
| মাসিক সমাচার ... | ঐ | বেঙ্গল গেজেট ... | গঙ্গাকিশোর ভট্ট (১৭) |
| মাসিক সংবাদ ... | ঐ | বেঙ্গল স্পেক্টেটর ... | মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র(১৮) |
| মুক্তাবলী ... | (১৫) | ভূগোলের মনশ্চাঞ্চল্য ... | দক্ষিণারঞ্জন মুখো |
| যাদুকরী দর্পণ ... | | | |
| রঙ্গপুর জ্যোতিঃপ্রকাশিনী | ঐ | ভারতবিহার ... | অনাথবন্ধু গুহ(১৯) |
| রঙ্গু ... | ঐ কলিকাতা বন্ধু | ভারতমিহির ... | হরিদাস গঙ্গোপাধ্যা |

(১৪) ১২৫৬ সালে এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

(১৫) ১৩০৮ সালের শেষ হইতে ইহার পুনঃপ্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, তৎপূর্ব্বে ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর। ইহার প্রথম সম্পাদক ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। ইহার প্রথম প্রকাশক ৺রামকমল সেন। ইহার পরিচালন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৬) ১২৮৫ সালে এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।

(১৭) ১৩০৮ সালের শেষ হইতে ইহার পুনঃপ্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, তৎপূর্ব্বে ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর।

(১৮) বাঙ্গালা ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে বিক্রমপুরনিবাসী কালীকৃষ্ণ দাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক ৺কালীকৃষ্ণ দাস। ইহার প্রথম প্রকাশক ৺রামকমল সেন। ইহার পরিচালন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৯) ১৮৭৭ সালে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক ৺অনাথবন্ধু গুহ। ইহার প্রথম প্রকাশক ৺রামকমল সেন। ইহার পরিচালন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(২০) ১৮৭৮ সালে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক ৺হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। ইহার প্রথম প্রকাশক ৺রামকমল সেন। ইহার পরিচালন সম্বন্ধে কিছু বিবরণ "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

| [illegible] | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|
| ভারত-সংস্কারক ... | কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত | মুকুলবলী ... | [illegible] ও [illegible] |
| ভারত-হিতৈষী ... | অপ্রকাশিত | মুর্শিদাবাদ-পত্রিকা ... | অপ্রকাশিত (২২) |
| ভারতদর্পণ ... | ,, | মুর্শিদাবাদ-প্রতিনিধি ... | ,, |
| ভারত-মণিকা ... | ,, | মুসলমান বন্ধু ... | ,, |
| ভারত-বন্ধু ... | শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | মেদিনী ... | (মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত) |
| ভারতমিহির ... | (মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত) | মেদিনীপুর-বান্ধব ... | অপ্রকাশিত |
| ভারতসংস্কার (সচিত্র) ... | অপ্রকাশিত (২০) | মত্যঞ্জয় ... | ,, |
| ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা ... | রাধাপ্রসাদ সিংহদেব | মুর্শিদাবাদ হিতৈষী ... | ,, |
| ভূমণ্ডল ... | নীলকমল লাহা | যশোহর ... | রাধানারায়ণ দেব ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (২৩) |
| মহাজনদর্পণ ... | জয়কালী বসু (২১) | যাদুমণি ... | [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় |
| মধ্যস্থ সরল ... | অপ্রকাশিত | যমরাজাকর ... | যদুনাথ পাল |
| মনোরঞ্জন ... | গোপালচন্দ্র দে | রত্নবর্ষণ ... | [illegible] দে |
| মাসিক ... | অপ্রকাশিত | রঙ্গাবলী ... | অপ্রকাশিত |
| মিহির ... | ,, | | |

(২১) ১৩০৯ বঙ্গাব্দে এই পত্র প্রকাশিত হয়। সংবাদে ইহা সম্প্রদায়-সম্পর্কীয় সংবাদ-পত্র।

(২২) ১৩০ বঙ্গাব্দে বাবু কৃষ্ণনাথ তর্কভূষণ প্রকাশার্থ উহা নিবন্ধাবার্থ এই পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন।

(২৩) এই অবশ্য পত্র ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হয়। ইহা ভোলানাথ সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইহা ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। বঙ্গের যে প্রথম সম্পাদক রাধানারায়ণ সেন কালিদাসবাবুকে বলেন, বাবু কৃষ্ণনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী স্বর্ণময়ীর সাধারণ ঘটনা কথায় উক্ত রাজা বাহাদুর হইয়াছেন। দ্বিতীয় সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যও রাজা গিরিন্দ্রচন্দ্র রায় বাহাদুর অভিহিত হইয়াছেন। [illegible] সম্পাদক [illegible] বাবু বাঙ্গনারায়ণ বসু [illegible]। [illegible] সমাজে [illegible] হইত, তাহা [illegible] পরিবারের [illegible] লোক কাড়া করিয়া [illegible], হাস্যোদ্দীপক [illegible] করিয়া [illegible] হয়, সেরূপ [illegible] হইত।

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|
| সুধাকর | ... অপ্রকাশিত | সমাচার চন্দ্রিকা | ... ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত |
| রঙ্গপুর-দিগ্‌প্রকাশ | ... (কাকিনির হইতে প্রকাশিত) | | |
| রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ | ... অপ্রকাশিত | মহাজন | ... বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় |
| রামধনী | ... গঙ্গানারায়ণ সরকার | রামধনী | ... উমেশচন্দ্র গুপ্ত |
| মাসিক সমাচার | ... অপ্রকাশিত | মহাবাণী | ... অপ্রকাশিত |
| রশ্মি | ... (ঢাকা হইতে প্রকাশিত) | সময় | ... (চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত) |
| শান্তি | ... অপ্রকাশিত | সহযোগী | ... অপ্রকাশিত |
| শিল্প ও কৃষিপত্রিকা | ... (ভাগলপুর হইতে প্রকাশিত) | সুধাকর সুধাবর্ষণ | ... ঐ |
| শুভসাধিনী | কালীপ্রসন্ন ঘোষ (২৭) | সত্যসোপান | ... ঐ |
| শ্রীহট্ট প্রকাশ | ... অপ্রকাশিত (২৮) | সত্যপ্রদীপ | ... এণ্ড্রু টাউন্‌-হেগ সাহেব (২৯) |
| সমাচারদর্পণ | ... জন ক্লার্ক মার্শম্যান সাহেব (২৬) | | |
| সমর | শ্রীমোহনলাল দাস (২৭) | | |

(২৪) সুপ্রভাত সমাচারের অনুকরণে ইহাই বোধ হয় বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র।

(২৫) ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট হইতে এই পত্র প্রকাশিত হয়।

(২৬) ১৮৮৮ খৃঃ অব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রে (New Series Vol. I. p. 87) শ্রীরামপুর হইতে ইহার এই আদি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাগজ ৩টি সংখ্যা মাত্র মূল্য কিনিতে পাওয়া যায় এবং নিয়মিত ডাক মাশুলের এক তৃতীয়াংশ মূল্যে ইহা দেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। ইহা ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত হইত। শ্রীরামপুর খৃষ্টধর্ম্মযাজক বোর্ড সাহেব এই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। মার্শম্যান সাহেব ইহার ও পাক্ষিক পত্রের লেখক। তিনিই দিগ্‌দর্শন নামক মাসিক ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার উক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কি উপলক্ষে কোথা হইতে বাঙ্গালা সংবাদপত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা জানা আবশ্যক।

(২৭) ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে বঙ্গবাসীর অনুকরণে এই পত্রের প্রচার হয়। ইহার ৩৬টি কলেবর পাওয়া গিয়াছে। ইহা মাসুল মাফ সংবাদপত্র ছিল। সম্পাদক।

(২৮) ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে (Dated 1892) খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংবাদ কৌমুদীর অনুকরণে এই পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে ৪ পৃষ্ঠা সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থাকিত। সমাচার চন্দ্রিকা পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

(২৯) ১৮৯০ খৃঃ অব্দে এণ্ড্রু টাউন্‌-হেগ সাহেব এই পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে বিজ্ঞান ও সাহিত্যসম্বন্ধীয় গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত।

| পত্রিকার নাম | সম্পাদকের নাম | প্রকাশের স্থান | সম্পাদকের নাম |
|---|---|---|---|
| সর্ব্বশুভকরী | ... অতিলাল চট্টোপাধ্যায় | রাধানগর (১৩৫৮ সাল) | ... [illegible] |
| সর্ব্বরসমঞ্জরী | ... কাশীকান্ত মিত্র | ঈশ্বরচন্দ্র বসু, | |
| সদালোচক | ... দ্বারকানাথ | ভবানীচরণ ঘোষ, | |
| | বন্দ্যোপাধ্যায় | গোবিন্দচন্দ্র ধর (১৪) | |
| সমাচারদর্পণ | ... মহেশচন্দ্র পালধর | বারাসত ... শ্রীনাথ [illegible] | |
| সংবাদকৌমুদী | ... রামমোহন রায় (৬০) | অম্বিকা ভট্টাচার্য্য, | |
| সংবাদপ্রভাকর | ... ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রামচন্দ্র | ভোলানাথ বিদ্যাবাগীশ, | |
| | গুপ্ত, গোপালচন্দ্র মুখো (১৮) | ভট চারি (৬৩) | |

(৭০) এই [illegible] ১৮১৯ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মণসেবধি নামক [illegible] ইহা [illegible] সম্পাদকের বিলক্ষণ মত সমর্থিত হইত।

(৭১) ১৮৩০ খৃঃ অব্দের (১২৩৭ বঙ্গাব্দের) ৩৬ মে, শুক্রবার সাধুবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [illegible] এই প্রচার করেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" এক সময় [illegible] প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রভাকর যে পথ উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন, তাহা [illegible] ও তাহার [illegible] লেখকের [illegible] হইয়াছে, তাহার সহিত প্রভাকরের [illegible] তুলনা করিতে হইলে, নিস্তব্ধ [illegible] বচনা [illegible] সম্পাদক [illegible] পারিয়াও বিলক্ষণ [illegible] ভাস্কর ও [illegible] [illegible] [illegible]

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|
| সংবাদ-বাসুদেব ... | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত | সারসংগ্রহ ... | ঐ প্রকাশিত |
| সংবাদ-সোদামিনী ... | ( চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ) | স্বাস্থ্যতত্ত্ব ... | ঐ |
| | | সুধীরঞ্জন ... | ঐ |
| সঞ্জীবনী ... | কৃষ্ণকুমার মিত্র (৩৪) | সুনীতিসংবাদ ... | ঐ |
| সাপ্তাহিক সমাচার ... | যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় | সুধাপান ... | ঐ |
| | | সুলভসমাচার ... | কেশবচন্দ্র সেন (৩৭) |
| সাধারণী ... | অক্ষয়চন্দ্র সরকার (৩৫) | সুরভি ... | যোগেন্দ্রনাথ বসু (৩৮) |
| সারস্বতপত্র ... | বাণীবিহারী দাস, উমেশচন্দ্র বসু (৩৬) | সুলভ দৈনিক ... | কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ, |
| সাহিত্য ... | চন্দ্রশেখর সেন | | |

(৩৪) ১২৮৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গবাসীর প্রতিযন্ত্রীরূপে ইহা কলিকাতায় উন্নতিশীল ব্রাহ্মসম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পত্রে শিক্ষা ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় গুরু সারগর্ভ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে, কিন্তু সমাজনীতির আলোচনায় সঞ্জীবনী সময় সময় তিলুয়ানীর বিরুদ্ধ মত সমর্থন করিয়া থাকেন।

(৩৫) বঙ্গাব্দ ১২৮০ সালের ১১ই বার্ষিক চুঁচড়ানগরে এই তেজস্বিনী পত্রিকার জন্মগ্রহণ হয়। প্রথম প্রথম 'সাধারণী' রাজনীতি অপেক্ষা সাহিত্য-চর্চ্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করিত, পরে উহা চুঁচুড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং নববিভাকরের সহিত সম্মিলিত হইয়া বৃহদাকারে পরিগ্রহ করে। ঐ সময়ে উহা বঙ্গের একখানি অদ্বিতীয় রাজনৈতিক পত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

(৩৬) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা সারস্বত বা পণ্ডিত সমাজের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাচীন হিন্দুরীতিনীতির পরিপোষক। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের বিদ্যা সৌকর্য্যবিধানার্থ ইহাতে শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবের সন্নিবেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক সারস্বত সমাজের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র বসতি করিলে নানা সম্পাদক পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং বাবু উমেশচন্দ্র বসু উহার সম্পাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সারস্বত পত্রের বর্ত্তমান এরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়াছে।

(৩৭) বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্বরাজীয় সংবাদপত্রের অভাবমোচনে এতদ্দেশে এক নূতন অল্পমূল্যের সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। তাঁহারই উদ্যোগে এক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে এই সুত্র পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে এরূপ অল্প মূল্যের উৎকৃষ্ট পত্রিকার কল্পিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

(৩৮) ১২৮১ খৃঃ অব্দে বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু এই পত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে রাজনীতি ব্যতীত সাহিত্যেরই অধিকতর আলোচনা হইত। ইহার সহিত পরে বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের "পতাকা" নামক পত্র সম্মিলিত হয়। এক্ষণে উভয়ই বিলুপ্ত হইয়া "হিতবাদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

| পত্রিকার নাম। | | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|---|---|
| সুহৃদ্গণ | ... | আবদুর রহিম | সুলতানসংবাদ | ... | অপ্রকাশিত |
| সুজনবন্ধু | ... | নবীনচন্দ্র দে | সোমপ্রকাশ | ... | দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (৩৯) |
| সুজনরঞ্জন | ... | গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত | | | |
| সুধাসিন্ধু | ... | অপ্রকাশিত | সৈরন্ধ্রী | ... | অপ্রকাশিত |

(৩৯) খৃষ্টীয় ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাসে (১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ) পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। রচনার বিশুদ্ধতায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের রীতিসঙ্গত সমালোচনায় সোমপ্রকাশ অবিলম্বে সর্ব্বকালে বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের শিরস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশীয় ও বৃটীশীয় সকল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ হইতে অনেকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা রচনার প্রণালী অবগত হইয়াছেন। এখন সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শিতা ও যুক্তি-পরিপাক-কুশলতা বাঙ্গালা সংবাদপত্র মাত্রেরই অনুকরণীয়। সোমপ্রকাশের প্রথম প্রচার বিষয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। সংস্কৃত কালেজে সারদাপ্রসাদ নামে একজন দুর্বিনীত ছাত্র ছিলেন। পঠদ্দশায় তিনি ঈষৎ বধির ছিলেন; বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার বধিরতা বৃদ্ধি হইল। তিনি কৃতবিদ্য হইলেও একমাত্র বধিরতাদোষে তাঁহার কোন কর্ম্মই পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় দেখিয়া জীবনোপায় করিবার নিমিত্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মহাশয় সোমপ্রকাশের সৃষ্টি করেন। সারদাপ্রসাদ সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইলেন আর বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি তাঁহাকে লিখিতেন। প্রথমে এই স্থির হয়। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাভারতের অনুবাদ সাহায্যকরণে সারদাপ্রসাদকে স্বীয় সভাস্থলে বরণ করিলে, তিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যত্নও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ভাল সংবাদ পত্র ছিল না, একখানি ভাল বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র হয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মনে এই অভিলাষ ছিল। এবং বিশেষ তাহার সেই অনুষ্ঠান করণ হওয়াতে তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজনকে একত্রিত করিয়া আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন উপস্থিত সকলেই তাহার মতের অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ-পত্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, তাহাই কাল হইবে স্থির হইল। তদুপস্থিত ব্যক্তিগণ সকলেই লিখিবেন, এই অবধারণ করিয়া সম্পাদকতার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। কিছুদিন তাহার সকলেই লিখিয়াছিলেন, ক্রমে ঐ একজন ব্যতীত প্রত্যেকেই সকলের গ্রাহক রহিলেন। সুতরাং ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কন্ধে পতিত হইল। যখন সোমপ্রকাশের প্রথম সৃষ্টি হয় তখন ছাপাখানা কলিকাতা চাঁপাতলায় ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে মজুত লেখাপড়া গোলা হইয়া ঐ মুদ্রাযন্ত্র চাঁদপোতায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিজ বাটীতে নীত হয়। ৭ বৎসর হইল উহা ভবানীপুরে আনীত হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার ঐ জীবনকাল (১৭৮৭ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এখনে উহার সে ভাব, সে প্রতিভা ও সে রচনার পারিপাট্য কিছুই নাই বলিলেই হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একজন অনুগ্রহভাজন ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎসাহে বাঙ্গালা ১২৮০ সালে এই প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সোমপ্রকাশে কর্ম্ম সম্বন্ধে এক ভুরুক সম্পাদায়ন উপস্থিত হয়। যু প্রসিদ্ধ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও ঐকৃষ্ণমোহন সেন ও ভগবতীচরণ দে প্রভৃতি ঐ আলোচনায় যোগ দান করেন। স্বয়ং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐ সময় নানা প্রস্তাবের প্রস্তাবে বিদ্যার সমালোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ লর্ড লিটনের ভীষণ মন্ত্রণা সভী বঙ্গভাষা প্যাদিত হইলে পার্লামেণ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট গমনকরা চাহেন। তিনি সম্পাদন করি

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|
| খালিসহর পত্রিকা ... | স্বপ্রকাশিত |
| খালিসহর প্রকাশিকা | ঐ |
| চারুপাঠ হিতকরী ... | ঐ |
| হিন্দুহিতৈষিণী। ... | ( বোম্বে লিথো ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত ) |
| হিন্দুহিতৈষিণী ... | হরিশ্চন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, (৪০) |
| হিতবাদী ... | কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৪১) |
| হিতৈষিণী ... | ( বরিশাল হইতে প্রকাশিত ) |
| হিতকরী ... | হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় |
| হিতৈষী ... | কালীচরণ মিত্র |
| হরিভক্তি প্রদায়িনী ... | শ্যামকুমার চক্রবর্ত্তী |

---

পত্রিকা রক্ষিত আছে। তাহা কারণ সোমপ্রকাশ এচার বন্ধ করুন। সম্পাদক লর্ড রিপনের অনুগ্রহে ধর্ম্মতত্ত্ব পাইয়া নিরোহিত হইয়া সোমপ্রকাশ পুনর্জ্জীবিত হয় এবং আমরা। অদ্যাপি ইহা জীবিত থাকিয়া নানারূপে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছে।

(৩৯) বাঙ্গালা ১২৭১ সনের ফাল্গুন মাসে চাঁদা জেলার অন্তর্গত প্রধান হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির যত্নে হিন্দু ধর্ম্মবিবর্দ্ধিনী সভার মুখপত্রস্বরূপ হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে হরিশ্চন্দ্র মিত্র এখানে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর এই পত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের পরলোক গমনের পর বাবু আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এক্ষণে ঢাকার হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও হিন্দুহিতৈষিণী উভয়েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৪০) স্বর্গীয় বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রথমে ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হন। মুক্ত-স্বাধীন ও সত্যপ্রিয় অনেক লোক তখন তাঁহার সহায়তা করিতেন। পরে ইহা হস্তান্তরিত হইয়া প্রথমে বাবু সত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মিত্র, পরে এখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিতবাদী বাঙ্গালার একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র।

# কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে এখন পর্য্যন্ত অনেকের ধারণা যে, বাঙ্গালা রামায়ণ-প্রণেতা কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত, দুই তিন শত বৎসরের অপেক্ষা পুরাতন লোক নহেন এবং বাটীয় ব্রাহ্মণদিগের নবো কৃত্তিবাস কৌলীন্যের সীমাবিস্তারী হইলেও, অনেকে তাঁহাকে আদৌ ব্রাহ্মণ,—অন্ততঃ সৎব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত নহে। যাহাহউক, বাঙ্গালার আদি লেখক এবং কবিখ্যাতির পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনা হলে, তাঁহারও কাহারও বিশ্বাস যে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদি কবি, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা গুণরাজ খাঁকেই সেই পদে অধিষ্ঠিত করিয়া থাকেন এবং কেহ বা এমনও নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন, যাঁহার মতে, এমন কি, চণ্ডী-প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীও কৃত্তিবাসের অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকেন।

কেবল কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এ কথা বলি কেন, আমাদের বাঙ্গালা দেশের ঐতিহাসিক অনেক বিষয় সম্বন্ধেই, ঐরূপ অপূর্ব্ব মত সকল ও সর্ব্বাত্র অতি অলীক মতা সকল প্রকাশিত ও বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি, শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও, অতি ধীর ও গভীরভাবে মোহিত করি। আসিতেছেন যে,——

১। পাল বংশের আগে, শূরবংশ বলিয়া বাঙ্গালায় কোন রাজবংশ ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন যে রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পালবংশ। ভাল, তাহাই যদি হইল, তবে আবার আদিশূর-আনীত পাঞ্চাল্য-গোত্রোদ্ভব ভট্টনারায়ণ-বংশীয় ভট্টপাণি, কেদারমিশ্র, শুরবমিশ্র প্রভৃতিকে পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে পাল রাজাদিগের মন্ত্রিত্ব করিতে দেখা যায় কি রূপে? অথবা ব্রাহ্মণাদির আদি বৈদিক পাপক আদিশূর-নামীয় রাজা ধর্ম্মপালই বা কোথায় গেল?

---

(১) বাঙ্গালায় পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে, আদিত্য সেনের পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ বংশ বাঙ্গালায় বসিবান ছিল না, অথবা তত্র অধিষ্ঠিত ও ছিল না। সুতরাং ঐ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার যে কয় ঘরীয় ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদের গোত্র নাম এই— শুনক, বাৎস্য, গৌতম, পরাশর বশিষ্ঠ, হারিত, ষাট এই ছাটি গোত্র। কিন্তু আদিশূরযজ্ঞে যে অধ্যবে যে গোত্রজাত দেওয়া আছে, তাহার মধ্যে ইহার কোন গোত্রের নাম পাইলাম না। আরও এক, এতদ্ভিন্ন রাঢ়েন্দ্র কুলজী গ্রন্থেও দেখা যাইতেছে যে ভট্টনারায়ণ-বংশীয় লক্ষ্মীধর ওঝা, গৌড়ে পালবংশের আদি দেবপাল রাজার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মপালের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন,—

"রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখসুপ্তধুনীতীরদেশে বিরাজ্য
ভট্টনারায়ণো বিপ্রঃ পৌণ্ড্রভূতলনগরে ভট্টনাথে বভূব।" ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ ধৃত শ্লোক।)

এ সম্বন্ধে যৌক্তিক প্রমাণাদি আমার দেখা নাই। সুতরাং ভট্টনারায়ণ গৌড়ে পূর্ব্বপুরুষ হইতে এবং পাল-

২। সেন বংশের আদি বীরসেনই, আদিশূর নাম লইয়া, বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহা হইলে, একদিকে কিন্তু বল্লালের বাপ বিজয়সেনের নিজ খোদিত লিপি দ্বারা আমরা যাহা দেখি, বীরসেন হইতে অধস্তন তিন পুরুষ, বাঙ্গালার মুখ পর্য্যন্ত কখনও দেখেন নাই, তাঁহারা আজীবন রাঢ়ভূমিতে দক্ষিণাত্য কর্ণাটভূমিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বীরসেনই যদি আদিশূর নাম লইয়া বাঙ্গালায় পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ আনাইয়া থাকেন, তবে বীরসেন হইতে পঞ্চম পুরুষ বল্লালের সময়, ব্রাহ্মণ-কুলীনে ২৩।২৪ পুরুষ পৌঁছিয়াছিল কি করিয়া? সংখ্যাগণনায়, অতি ন্যূন সংখ্যাতেও, ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণিত হইতে পারে না। এ হিসাবে ব্রাহ্মণদের ১৪ পুরুষ পর্য্যন্ত হইতে অন্ততঃ পক্ষে ৩৫০ বৎসর লাগিয়াছে। আর তদ্দিকে বীরসেন হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত পুরুষ-গণনায় বৎসর যদি দুনা করিয়াও ধরা যায়, তাহা হইলেও পাঁচ পুরুষে মোট ২৫০ বৎসর হয়। সুতরাং এই পঞ্চব্রাহ্মণ যে বীরসেন-আনীত, তার কোন যৌক্তিক সামঞ্জস্যে দ্বারা বল্লালের পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে আনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন যে, মুসলমান সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ আসিয়া, লছমনিয়া নামক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, গৌড় অধিকার করেন। কে এই লছমনিয়া-সেন? আমাদের ঐতিহাসিকদের সাধারণতঃ লক্ষ্মণ-সেনের প্রতি যেন অসীম কৃপা। লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক মিনহাজ প্রভৃতি জন করিয়াছিলেন বলিয়া হউক, অপর যে কারণে হউক, এই লক্ষ্মণসেনের উপর তাঁহারা বাঙ্গালার যবনাধিকার-দোষটা চাপাইতে একেবারেই নারাজ। লক্ষ্মণের পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের নাম শিলালিপিতে উল্লিখিত রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহারাও লছমনিয়া হইতে পারে না; অথচ একটা লছমনিয়া খাড়া না করিতে পারিলেও চলে না। এবং পুস্তক বিশেষে লক্ষ্মণের নাম কিছু অপ্রসিদ্ধ, সুতরাং সেই তবে মুসলমান

---

তখন সম্রাটের কোন প্রাদেশিক দুইটা বা ততোধিক সৈন্যদল গণ দিতেন। তখনও প্রবল হইলে ঔড়ি অধিকারের কথাটা সময় তাহাদের মনে নাই।

(২) সামন্তপাল ও বিটপাল বীরসেনের পুত্র সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেন, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়ের পুত্র বল্লালসেন। সেনবংশীয়গণের অনেক তাম্রশাসন দৃষ্টেই এই সহজ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৩) বাঙ্গালার মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রীয় ঔর্ব্ব বংশে উৎসাহ-সূরটি বংশের নিকট কৌলীন্য আছে বলে, ইনি ঔর্ব্ব হইতে ১৪ পুরুষ অন্তর। আর চারি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই সমস্ত কেহ ১১, ১২, বা ১৩ পুরুষে গণিত হইয়া থাকেন।

(৪) আদি শূরের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন, যথা, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্ণয় অনুসারে ৮৮৬ এবং কিল্হর্ণ-সাহেব

এতিহাসিকের মতামতিয়া না হইয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যেমন বাপে, সেটা ও নাতির একই নাম হইতে পারে, তাহাতে ও তেমনটা প্রথা নাই, সুতরাং মতামতি যে নাতি হইবেন, ইহাতে কি কারিয়া, তাহাতে কি হইল যে, এ মতামতিয়া তাহে যায়ন নহে, সোমদেব এবং এই সোমদেবই বল্লালসেন খিলিজীর হাতে বাঙ্গালা হারাইয়া চিরকলঙ্কের পসরা মাথায় করিয়া পলায়িত হইয়াছিলেন। এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তি-প্রয়োগে, আমাদের ঐতিহাসিকগণ অপূর্ব্ব সত্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাই বাঙ্গালার ভাবী যুবকগণকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন।

---

বর্ণিত সময় ১৯২। বাটীর ব্রাহ্মণদের বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে সোরাণাম্পাদে ভ শৌচে বিপ্রাঃ সমাপতা।' অর্থাৎ ৯৫২ শক। কিন্তু এখানে দোষটাই যে ঠিক নহে তাহাও এবং অতি সিদ্ধি; কারণ এই যে তাহার কোনটাই বল্লালসেনের ১০ বা ৬০ বৎসর পূর্ব্বগত সময় বলিয়া যাইতে পারে নাই। অথচ বল্লালের নিকট কৌলীন্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ কুলের উৎপত্তিবৃত্তান্তে যাহা লিখিত আছে, –

মহারাজ অন্ততঃ সাতে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে না হইলে, এ শ্লোক-রচয়িতাদের সাহি কাল্পনিক ব্রাহ্মণের ঠিক বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। সুতরাং বিষয়, আমার দেখা যাইতেছে, সত্যযুগের বহুপূর্ব্বে আসিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি যে ২৯ ধারা লিখিত হইয়াছে পুরাণে। অত্রি-কুলপঞ্জিকায় মতে,

"বিপ্রান্ বেদবিধানবর্দ্ধিতবলে বিপ্রায় চিত্রা দিতঃ,
গৌড়ান্ সপ্তশতান্ সুমিপ্রকাঞ্জিতান্ বিপ্রোপাধ্যকলান্।
আচার্য্য সুশিক্ষাচারকুলপ্রকাশত্রিকোবিদঃ,
শাস্ত্রে যে কুলপঞ্জিকাবিরচিতে বর্ণিতাঃ [illegible]"

[illegible] বলিয়া [illegible]। [illegible] বলে যে, বাচস্পতিমিশ্র কৃত [illegible] এই এক পুথি যায় "বেদবাগীশ শাকে", অর্থাৎ ৩৫ শকে, [illegible] যাহে যে মুদ্রাঙ্কন এই আছে, তাহাতে [illegible] উহার বোধগম্য পাইলাম না। এবে [illegible] "বেদবাগীশ" কি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই "বেদবাগীশ" না হইয়া, উহা যে গৌড়ের "বেদবাগীশ" নিয়ে [illegible] পুথি হইতে পুথি [illegible] লিপিকারের দোষে "বেদবাগীশে" পরিণত হইয়াছে ও [illegible] কুলাচার্য্যেরা। আমরা যে অনেক স্থলে সাধারণ করিয়া আসিতেছি [illegible] "বেদবাগীশে" যে [illegible] এবং দ্বিতীয়তঃ এই যে, উহা কাশ্যপ-কুলপঞ্জিকার "বেদবাগীশবর্ষে" লিখিত এক হইতেছে, তাহা [illegible] কালের পর আগে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সম্ভব হয় এবং [illegible] পূর্ণ মাত্রায় [illegible] আর এস "বেদবাগীশই" ঠিক এবং "বেদবাগীশ" আলসেন ও বল্লালসেনের [illegible] ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে।

ফলতঃ 'বেদবাগীশ' শব্দের এই ৩২৯ শকই ও [illegible] সময় কাল বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে। [illegible] ইংরেজী ৮০৭ খৃষ্টাব্দ হয়। [illegible] বহুই ব্রাহ্মণদিগের [illegible] হইল যে [illegible] ১০০ বৎসর পরে হইলেও [illegible] ১১১ খৃঃ সহ এত [illegible] হইলেও আর [illegible] নির্ণয় সম্বন্ধে [illegible] উহার [illegible] সম্বন্ধ। [illegible] কিন্তু [illegible] কেমন উপাদেয়, তাহার [illegible] বিশাল [illegible] এই [illegible] ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি [illegible] উহা [illegible] হইবে।

এইরূপ আরও বহুতর বিষয় আছে; কিন্তু পাঠক, সে সকলের আর অধিক উল্লেখ করিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না।

ঘটকগুরুদিগের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিষয়সমূহ বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং আজকালকার সাহিত্যে এ সকল ভ্রান্তি বিরল না হইলেও, এমন নহে। তবে কি না কালে ভ্রান্তি সংশোধিত হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের দেশে হোমরা এমন গুরুতর বিষয়টী, এতখানি বড় বড় বিষয়, সন্দেহ নাই, বিনা সংশোধনে এতদিন ধরিয়া এমনভাবেই চলিয়া আসিতেছে, ঐটীই বড় দুঃখের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও ইহাদের যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস; এখনও তাহারই মধ্যে

---

এখন দেখা যাউক এই ৬৫১ খৃঃ সাল বল্লালসেন হইতে কতটা অন্তর। লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিপুত্র পুরুষোত্তম, স্বরচিত গ্রন্থে ১১৯৯ শকে, অর্থাৎ ১২৭৭ খৃষ্টাব্দে মুক্তিবার্তা, নবম এতখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অথচ সে বিষয়ে এইরূপ পণ্ডিতপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু পঞ্চম পুরুষের সন তারিখ এবং তাঁহার পিতা মাতার, ভ্রাতার নাম ও তাঁহার রাজধানীর নির্ণয় করিতে আদিশূর প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহাতে অনেক করিয়া নিরস্ত হইলেন আমরা। কিন্তু সাথে পণ্ডিত একটী কথার আলোচনা একটু প্রয়োজন,—১২০৩ খৃষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলজী যদি বল্লালসেনকে হারাইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া থাকিবেন, তবে তাঁহার ঐ লক্ষ্মণসেন ১২০৬ খৃঃ অব্দে রাজা থাকিলেন কিরূপে? ইহার অতি সরল ও অভ্রান্ত উত্তর এই যে, লক্ষ্মণসেন কেবল বরেন্দ্রীর কিয়দংশ হইতেই বিতাড়িত হইয়াছিলেন; নতুবা বিতাড়িত হওয়া দূরে থাকুক, তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ কি ধরিয়া, এমন কি বাদশাহ মহম্মদের মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও, পূর্ববঙ্গ নিজের করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিক্রমপুরই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ১২০৬ খৃঃ অব্দের পরেও, ঐ বিক্রমপুরে বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন, কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন, লক্ষ্মণসেনের পর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, সেই কেশবসেনের কনিষ্ঠ পুত্র দনুজমাধব বা দনুজারিদেবের পুত্র দশরথদেব। কাজেই এই [illegible] নাম [illegible] ভুলিয়া পুরুষোত্তম, দনুজমাধব, বেতাউল খোজে, বিষ্ণুজ, [illegible]। যাহাহউক বরাহমিহির ১০৩০ খৃঃ অব্দের কি কিছু পূর্ব্ব হইতে বাদ্যবা [illegible], অনুমান ১০৫০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি [illegible]। সেই সময়—অবশ্যই হইতেও, সেনবংশীয়েরা [illegible] বর্ত্তমান [illegible], আদি শিখরে [illegible] ঘোষণা করিতে ত্রুটী করিতেছেন না, সেজন্য [illegible] সম্ভবতঃ হইয়া থাকে। বল্লাল পর্য্যন্ত সমস্তের রাজগণ সামান্যভাবে [illegible] বিষয়ে [illegible]।

তাহা এখন দূরে ১২০৩ খৃঃ অব্দে [illegible] যখন আরম্ভকাল হইল, তাহা হইতে [illegible] পঞ্জিকারম্ভ এবং অভিষেককাল হইতেছে ১১৯৯ খৃঃ। ইহার পূর্বে লক্ষ্মণের পিতা বল্লালের রাজ্যকাল ১৮ বৎসর, ঐ ১৮ বৎসর ১১৮১ খৃঃ অব্দ হইতে বাদ দিলে বল্লালের অভিষেক কাল পাওয়া যাইতেছে ১১৯৯ খৃঃ অব্দ। এই ১১৯৯ খৃঃ হইতে ৭৫২ শক বা ৮৩০ খৃঃ অব্দ, সম্ভবতঃ [illegible] অর্থাৎ ১১৮৭ খৃঃ অব্দে বা তৎসন্নিহিত সময়ে, কালীনিক [illegible] সম্পাদিত হইতেছে। [illegible] ঐ গ্রন্থে [illegible] বলিয়া আছে, বল্লালসেন, মানবলীলার শেষ সময় রাজ্যভার রাজা লক্ষ্মণসেন এবং ঐ রচনার সময় ১ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এখন ঐ [illegible] কথার কাল বল্লাল নিজেই [illegible] করিতেছেন, 'সূর্য্য শীতলদ্যুতিস্তে' অর্থাৎ যে বৎসর ১০৯১ শকে বা ১১৬৯ খৃঃ অব্দে, ১১৬৯ খৃঃ হইতে বর্ত্তমান [illegible] অভিষেক কাল ১১১৮ বাদ দিলে, ৫১ [illegible]

আঙ্গুল কাটিয়া অঙ্গুলিবৎ যে কিছু নূতনত্ব সম্পাদন করিয়া থাকি মাত্র। নতুবা যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহাতে এখনও বলিতে হয় যে, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান কার্য্য, এখনও তাহার শৈশব সীমা অতিক্রম করে নাই। এখনও অনেকে, ইংরেজপ্রণীত পুস্তক সকলের টীকা টীপ্পনী হইতে বহুগ্রন্থের নামাদি নকল করিয়া, স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশপূর্ব্বক স্বীয় অসীম বিদ্যাবত্তা ও গবেষণাশক্তি অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। দেশে একজন সর্ব্বগ্রন্থ ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত থাকিলেই রক্ষা থাকে না; কিন্তু আমাদের সটীপ্পনী বাঙ্গালা পুস্তক সকল পড়িলে, অবশ্যই বলিতে হয় যে, তেমন পণ্ডিত আমাদের দেশে অসংখ্য! অসংখ্য বটে, তথাপি কিন্তু আমাদের যে সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক অভাব ও দুর্দ্দশা ঘুচে না, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।

উহারই মধ্যে যাহারা বা কিছু স্বাধীন ভাবে বিষয়ানুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাহাও প্রায় ছাপার পুঁথি দৃষ্টে। আমাদের প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি নকল প্রায়ই স্পর্শাতীত

---

সাদির তাজাভর্ত্তি থাকে মোট ৫০ বৎসরই পাওয়া যায়। অতএব আইন-ই- কেহবী ও অপরাপর গ্রন্থে, বল্লালের রাজত্বকাল ৫০ বর্ষ বলিয়া যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে সত্য, সে কথা উপরোক্ত হিসাবেও অনেক অংশে উত্তমরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

আর একটী কথা, লক্ষ্মণসেন প্রবর্ত্তিত অব্দ সন, যাহা এখনও মিথিলায় প্রচলিত, তাহা বর্ত্তমান ১৮৯৭ খৃঃ ৭৮৯ বর্ষ পরিমিত, সুতরাং ১১০৮ খৃষ্টাব্দে উহার আরম্ভ। এই ১১০৮ খৃঃ হইতে লক্ষ্মণের ৩৭ বৎসর রাজত্ব শেষ ১২০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত, ৯৭ বর্ষ পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা এই দুইটী বিষয় সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে, প্রথমতঃ অব্দ সন লক্ষ্মণসেনের জন্ম বৎসর ধরিয়া আরম্ভ; দ্বিতীয়তঃ বখ্‌তিয়ার খিলিজীর বাঙ্গালা আক্রমণ কালে লক্ষ্মণসেন যথার্থই অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। এরূপ বৃদ্ধ রাজা হাতিয়া বিনাযুদ্ধে পলাইলে, দোষ তাঁহাকে দেওয়া যায় না; দোষ লক্ষ্মণের পাত্র মিত্রাদির এবং দোষ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির। তাই বলি, সে পলায়ন লক্ষ্মণসেনের নহে; সে পলায়ন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির, লক্ষ্মণসেন কেবল তাহাতে প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—তিনি প্রতিনিধি পলাতক, এই মাত্র তাঁহার দোষ।

লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিক একটা কথা লিখিয়াছেন যে, তিনি অজর রাজা এবং তাঁহার মাতা হুসমন প্রকৃতিকায় অনেকক্ষণ ধরিয়া লক্ষ্মণকে ভূমিষ্ঠ হইতে দেন নাই। এ অদ্ভুত উপন্যাসের প্রতিবাদ নিষ্প্রয়োজন। যাহাহউক, যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না দিলে, সন্তান এবং প্রসূতি উভয়েই বাঁচে কি? ধাত্রীবিদ্যাবিদেরাই বলিতে পারেন। তবে আমরা সোজা বুদ্ধিতে যতটা দেখিতে পাই, তাহাতে বোধ হয় না।

যা হউক, এখন বোধ হয় অনেকেরই ভ্রম ঘুচিবে যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজী-বিতাড়িত লক্ষ্মনিয়া, আর কোন লক্ষ্মণ বা লাক্ষ্মণেয় নহে, মিথিলা ও কাশী পর্য্যন্ত অত্যাচারী এবং মিথিলার অব্দ নামক শকপ্রবর্ত্তক বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনই স্বয়ং। লক্ষ্মণ যৌবনে বীরপুরুষ থাকিলেও, বার্দ্ধক্য ও জরাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধি লক্ষ্মণাস্ত্র সম্মুখে পলায়নপর হইতে নাই, এমন কোন কথা নাই বা অসম্ভবও তাহাতে কিছু দেখা যায় না।

(৩) যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত ও যাঁহারা এরূপ পাণ্ডিত্যাভিমানের অতীত, এখনও দেশে অনেক আছেন। অবশ্যই আমার এ বিদ্রূপোক্তি যে তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই সকল হাতের লেখা পুঁথি বা বহু প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থ হইতে যে কি কত অমূল্য ঐতিহাসিক রত্নরাজি উদ্ধার হইতে পারে, তাহা আমিও এক রকম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যেন অপরিচিত হইয়াই রহিয়াছে।

একটা উদাহরণ স্থলে দেখাই। এই এক রকম্ কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থের মধ্যে, কুলাচার্য্য ভট্টশিবের পুত্র। ভট্টশিব বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের সাময়িক লোক, এবং বহু সময় লক্ষ্মণসেনের সভাতেই অবস্থান করিতেন। সুতরাং স্বয়ং লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজাদের পাঁচ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী যদি এভূমিশ্রে পাওয়া যায়, তবে তাহা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য হইবে কথা। হিন্দুমাত্রেই পাঁচ সাত পুরুষের বংশাবলী রাখা সকলেরই নিতান্ত দরকার; বিশেষতঃ হিন্দুর দশসংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদাই তাহার আবশ্যক হইয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্মণসেন যে নিজের সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী রাখিতেন এটা ঠিক, এবং তাহা হইলে সেই লক্ষ্মণসেনের সভাস্থ কবিগণ, যে বংশের পূর্ব্বপুরুষ সব বিবরণ যদি এভূমিশ্রে লিখিয়া থাকেন, তবে তাহারও সেইরূপ ঠিক হইবার কথা। এবং একথা স্থলে নিতান্ত গণ্ড মূর্খ বাতুল ভিন্ন, কাহ কেহই তাহাকে পেটেন্ট রাজিতে পারেন না ইহা বলা। লক্ষ্মণসেনের পৌত্র দনোজামাধবের বল্লালচরিত কুলাচার্য্য হরমিশ্রের গ্রন্থ সম্বন্ধেও অবিকল এরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

আমি এই এভূমিশ্র ও হরমিশ্র হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, গৌড়ে পূর্ব্বকালে আদিশূর হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকজন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর পালবংশের আদিরাজ গোপাল কর্ত্তৃক শূরবংশ বিতাড়িত হইলে পালবংশীয় কয়েকজন রাজা গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন রাঢ়াধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, পালরাজাদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড় নগর ও নবদ্বীপ রাজধানীর ঐশ্বর্য্যের ক্রমহ্রাস দেখিয়া, বিক্রমপুর অঞ্চলে পরিখা খনন করেন এবং তাঁহার পরেও কতদিন ধরিয়া তথায় ও তাহার নিকটে রাজধানী স্বাধীনভাবে বিক্রমপুর ভূভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন; তথায় ইঁহাদের রাজধানী ছিল বৈদ্যগ্রাম নামক স্থানে। ইত্যাদি।

কিন্তু কুলাচার্য্যদের গ্রন্থ মধ্যে যে এত বড় অমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা অধিকাংশ লোকে, বিশেষতঃ দিয়া, যাহারা এ দেশবাসী ব্রাহ্মণ বংশাবলী

---

(১) একজন ব্রাহ্মণের বেশ এক পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী থাকে, তাহাও একরূপ অসম্ভব বলিয়া অনুমান করিয়া, পাঁচ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে। অবশ্য তাহাই যে বলি যেন তাহারা আরও বেশি পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী রাখিতে চেষ্টা না করেন, তাহা নহে। যাহারা রাখিতে পারেন, তাহারা পর্য্যন্ত রাখিবেন না। কারণ বিশেষ কিছু না হইলে, অধিক পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী রাখিবার প্রয়োজন হয় না। তবে বংশাবলীতে কি কি থাকা উচিত, তাহা পরে লিখিয়া দিব। তাহার কতকগুলি বিষয় পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে।

হইয়াছে, তাহা যে প্রায়ই ঠিক ও অভ্রান্ত, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালার আদিকবি যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তাহার কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত কিরূপ অবস্থার ও কোন্ সময়ের লোক, তাহার আলোচনাতেও আমরা প্রধান অবলম্বন সেই চূড়াচার্য্যদিগের গ্রন্থাবলী। আমি বহুশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া, তবে এই কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থরাশি পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এখনও যাহার নিকট সন্ধান করিতে পারি আছে, আশা করি, সে সকলও শীঘ্র হস্তগত করিতে সমর্থ হইব। এই কৃত্তিবাস নিজ গ্রন্থে, অর্থাৎ যাহা এখন বটতলায় কৃত্তিবাসের নামে ছাপা হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি নিজের পরিচয় এইরূপে প্রদান করিয়াছেন—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিত হইল নাম তার।"

"দ্য মালিনী নাম যার বাপ বনমালী।" ইত্যাদি।

এখন এই মুরারি "ওঝা" শব্দই লইয়া গোল। শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ ভূতের ওঝা, ভাইলীর ওঝা, এ সকল প্রায় ইতর লোক ও বর্ব্বরদেশেই দেখা যায়। তাই লোকে সহজে কৃত্তিবাসকে ব্রাহ্মণ বলিতেই রাজি নহে এবং যদিই বা ব্রাহ্মণ হয়, তবে সে বোধ হয় ব্রাহ্মণাধম হইবে। এখন ওঝা যে উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ এবং যে কালে ব্রাহ্মণেরা। বিদ্যালঙ্কারাদি প্রভৃতি পদবীর ন্যায় বিদ্যার খ্যাতিস্বরূপে ব্যবহৃত হইত, ইহা অনেকের জানা থাকিলে আর এরূপ ভ্রম ঘটিত না। মুরারি ওঝা যে সময়ের লোক, তখনও বিদ্যালঙ্কারাদি উপাধি গ্রাস চলিত হয় নাই; তখনও আচার্য্যই। এখনও ওঝা, মিশ্র, পাঁড়ে ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি অনেক মুরারি ওঝা ও তাহার সন্ততি কৃত্তিবাস কেবল ব্রাহ্মণ ও কুলীন নহেন; তাঁহারা কুলরাজন্যবর্গ। তাঁহাদেরই বংশে এখনকার প্রধান কুলীন বিষ্ণুঠাকুরাদির উৎপত্তি। যাহা হউক, এখন কায়স্থদিগের যে রাজবংশোদ্ভব শ্রেণী হইতে কৃত্তিবাসের বংশাবলী অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ-কুলে উক্ত পরিচয়ের সঙ্গে কতটা মিল হয়। বংশাবলী যথা ক্রমে পর পর পুরুষ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল,—

১। হর্ষ। ২। ঈশ্বর। ৩। শ্রীবিদ্যাধর। ৪। মেধাতিথি। ৫। অরবিন্দ বা অরব। ৬। ত্রিবিক্রম। ৭। কাল। ৮। মুরারি বা ধীমন্ত। ৯। নরসিংহ। ১০। নারায়ণ। ১১। প্রাণেশ্বর। ১২। গুণধর বা ওঝা। ১৩। মনোহর। ১৪।

---

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত ক্ষত্রিয়-জাতি-সমূহের মধ্যে ভোজ ও সাত্বত জাতি আছে, যদুবংশই ইহার মধ্যে প্রধান। ঐতরেয়, মেধাতিথি, মুদ্গলাদি ও ঋষিগণই পঞ্চাল প্রদেশবাসিনী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রধান। ইহাঁরা পাঞ্চাল, ভরদ্বাজ, সাত্বত, বাহ্লীক ও মাদ্রক গোত্র। পাঞ্চাল ব্রাহ্মণদিগের পাঞ্চালত্বের অবসান হইতে, ওঝাও উহাদের গ্রাম হইতে সর্ব্বত্র সম্প্রচার হইয়া, নানা ও বিভিন্ন গ্রাম হইতে, এবং বাঙ্গালা দেশের নানা হইতে। পাঞ্চালত্ব হইলে বাঙ্গালা ব্রাহ্মণদিগের ইহাঁদিগকে এই পঞ্চগ্রাম হইতে বলে,—কামরী, ওঝা, বটব্যাল, দুবেটী এবং চক্রবর্ত্তী। যাহা হউক, নারায়ণ ওঝা যে কোন্ ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত

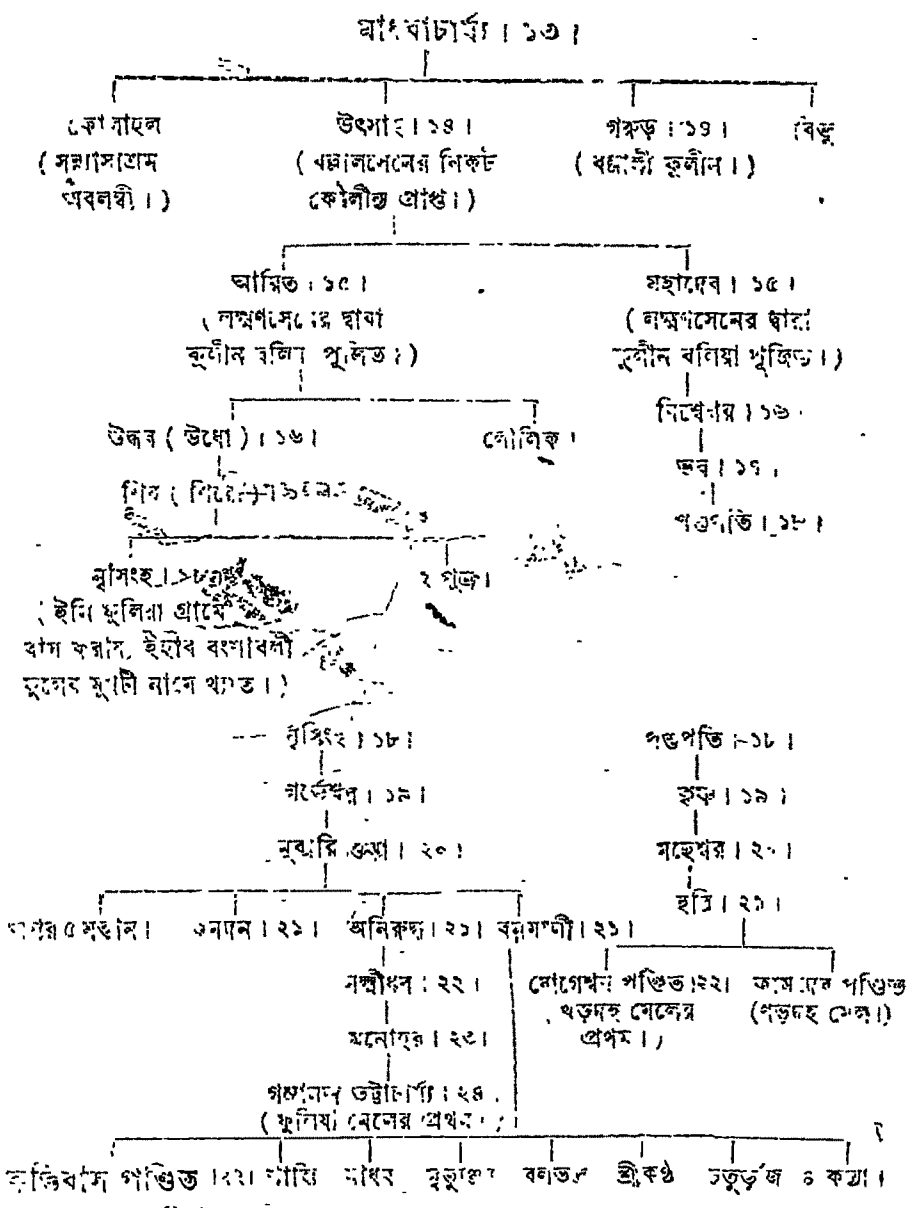


হইতে গৌড়াগত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেন, আমি এখানে তাহাই মানিয়া লইয়া উল্লেখ করিলাম। কাশীর বিদ্যেশ্বর ভট্টনারায়ণাদি পাঁচজনই ঠিক। উহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী রাজগণের কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা এই পঞ্চজনের প্রতি প্রযুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।

* এই সম্বন্ধে বঙ্গে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কবি ফুলের মুখটি ভারতচন্দ্ররায় মুখোপাধ্যায় ভঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশপরম্পরা, যথা—নন্দন ।২১। নারায়ণ ।২২। দেবানন্দ ।২৩। রামাগ ।২৪।

কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী ওঝাটী সম্বন্ধে, ফুলিয়া নিবাসী কবীন্দ্র পরমানন্দ, এই কারিকা দৃষ্ট হয়—

"ফুলিয়া মুখটী মুরারিশ্চ বনমালী।——

শ্রীমদ্বনাই মুখস্তু ব্রহ্মবন্দ্যোপাধ্যায়ঃ
গাঙ্গঃ পুরো মুখরপণ্ডিতমোক্ষকৃতঃ।
তস্যাঃ সদা সুখনিধিঃ দিবাকরোসৌ
ক্ষেম্যো বৃহস্পতিক আশু বিশ্বেশ্বরোপি চট্টঃ॥

কিঞ্চ। বনমালিনা কৃতাচার্য্যে গাং পুরো সংশয়ে যদা।
শিশ্রে দিবাকরে বিদ্যাদার্ঢ্যাৎ দোষাবিমুক্তবান্॥
চট্টোবৃহস্পতিক্ষেম্যঃ তৎসুতা শক্তিরেবচ।
কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তি রথাপরঃ॥
সাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো মহাশয়ঃ।
বলঃ শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বনমালীর ৭ পুত্রের, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসকে ধ্রুবানন্দ মিশ্র "শক্তি ও ধীমান্" এই কয়টী বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের অপর ছয় ভ্রাতার নাম, জ্যেষ্ঠানুক্রমে শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ।

পুনশ্চ, ধ্রুবানন্দের বনমালী বিষয়ক উক্ত কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের পত্নী ও বনমালীর কন্যা দাক্ষিণী। তাহার মধ্যে বনমালী মুখোপাধ্যায় পুত্রদ্বয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রথমা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় কুলে কিছু খাট হইয়া যান। তাঁহার পর দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দিবাকর মিশ্রকে প্রদান করায় সে দোষ কাটিয়া যায়। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যা ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে সম্প্রদান করেন।

অতএব উপরোক্ত বংশতালিকা ও কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, আদি পুরুষ গাঙ্গ নীচ জলধাগ্রগোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত ২২ পুরুষ। তিনি মুরারি ওঝার পৌত্র, বনমালী মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই ছয়টী, নাম—শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। ভগ্নী ৪টীর নাম প্রকাশ নাই, তবে তাঁহাদের চারিজনের নাম এই—পুরন্দর গাঙ্গুলী, দিবাকর মিশ্র, বৃহস্পতি চট্ট এবং বিশ্বেশ্বর চট্ট।

---

ফুলিয়া গ্রামে গোপাল ১৯৯ বাঙ্গালাব্দে ২৭ অগ্রহায়ণে ১২৯৭ সালের ভূমাধিকারী সঞ্জ. কবীন্দ্র রঘুনন্দনের পুত্র সারদাচন্দ্র ঘর ১৩০৫ সালে লেখে, "হেমন্তেই মুরারি ওঝার বংশাবলির এই নাম লোপ হইয়াছে;

এখন মন্তব্য কতদিন। লোক, তাহা দেখা যাউক। উপরে নিরূপিত হইয়াছে যে, ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খৃঃ অব্দে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্তৃক বাঙ্গালায় আনীত হয়েন। সেই সময় হইতে কুলিবাস ১২ পুরুষ। এখন প্রতিপুরুষে ৩০ বৎসর ধরিলে, ২২ পুরুষে হইতে ৬৬০ বৎসর পাওয়া যায়। সুতরাং মোটামুটি কুলিবাসের সময় ১৩৯৪ শক বা ১৩৯৯ খৃঃ অব্দ হইতেছে। অবশ্য, অন্যবিধ উপায়ে গণনা করিলে ইহা হইতে অনেকটা তফাৎ হইতে পারে এবং ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যেখানে অন্য কোন ভাল উপায়ের অভাব, সেখানে কালে কালে পুরুষ গণনার দ্বারা কাল নিরূপণ করিতে হয়। পুনশ্চ, এও দেখিতে হইবে, অন্য চারি গোত্রে। কুলীনের সময়ে মুখটীবংশে অনেক বেশী পুরুষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বংশে পুরুষ হইতে পুরুষান্তর উৎপাদনে অনেক অল্প সময় লাগিয়াছে। অতএব এ সকল গণনায় যে পর্য্যন্ত আরও কিছু কম বৎসরে পুরুষ গণনা করিলে, বোধ হয় কুলিবাসের কাল ঠিকের সমস্ত হইতে পারে।

এ ছাড়া আরও একটী বিষয় দ্রষ্টব্য। যেবীবর বটুক যে সময় কুলীনদের মেলবন্ধন করেন, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন কুলিবাসের জ্যেষ্ঠপুত্র চাঁই সমীধরের পৌত্র পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং ঐ পরমানন্দ ভট্টকে লইয়াই কুলিয়া মেলবদ্ধ হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, দেবীবর কর্তৃক মেলবন্ধন হওয়ার অনেক আগে কুলিবাস। তবে পূর্ব্বোক্ত বংশ-তালিকায় ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, ঐ একই বংশের মহাদেব পাখারু* আর একজন, অর্থাৎ যোগেশ্বর পণ্ডিতও সেই মেলবন্ধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহাকে লইয়াই খড়দহ মেলের সৃষ্টি। এখন কথা হইতেছে যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময় জীবিত ছিলেন বলিয়া, কুলিবাসকেও যে সেই সময়ের লোক হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; যেহেতু, বংশ এবং বংশের শাখা বিশেষে কেহ দীর্ঘজীবী, কেহ অল্পজীবীহেতু, সমগণনায় পুরুষের সংখ্যার অনেক অন্তর হইতে পারে। অথবা ধরিলাম যে, কুলিবাস পণ্ডিত ও যোগেশ্বর পণ্ডিত মূল আদিবর্হ হইতে সমপুরুষ সংখ্যা হেতু উভয়েই সমসাময়িক বা সমান বয়সের লোক; কিন্তু তাহা হইলেও ত তাঁহারা মেলবন্ধনের সময়ের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু, পরমানন্দ ভট্ট তখন বৃদ্ধ পুরুষ; কিন্তু যোগেশ্বর পণ্ডিত অভিশয় বৃদ্ধ, কারণ দেখা যায় যে, মেলবন্ধনের পূর্ব্বেই একে একে তাঁহাকে এগারটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছিল এবং শেষ কন্যার বিবাহ

---

* আদিম শাখা কুলিবাসের উপাধি, আর মহাদেব পাখারু যোগেশ্বরের উপাধি। সুতরাং উভয়ে ৮ পুরুষ ছাড়াছাড়ি। সেখানে ৮ পুরুষে ছাড়াছাড়ি সেখানে কোন্ শাখার কে কত বয়সে কবে, কে বেশী বয়স তাহার ঠিক না থাকায়, উভয়তঃ সমসংখ্যক পুরুষগণনায়, সময়ের অনেক তারতম্য হইয়া যাইতে পারে। তাই বলি, মূল প্রবন্ধলেখক যোগেশ্বরের কথা না পাড়িলেও চলিত। তবে উহাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্বন্ধ ও ছিল, এ কথা আমার পক্ষপাতের পক্ষান্তরে বলিয়াছি, এই শিরোনীতে আর নাই।

অনুচরের সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি যে রোষবিপ্রুত হন, তাহা হইতে তাঁহাকে লইয়া বিভ্রাট-মেলার সৃষ্টি হয়;——

'ক্ষমাপৃথ্বীধুরীণায় সততং যোগেশ্বরায়ত্মনে,
কর্ণেরিকাশত——————' মহাসং।

কেবল তাহাই নহে। আরও দেখ, একদিকে যেমন ওই সময়ে গঙ্গানন্দ ভট্টের কেবল রামে ও বাসু নামে দুইটী মাত্র পুত্র হইয়াছে; অন্যদিকে যোগেশ্বরের ৩ নং ১১ কন্যা ও ১১ জামাই এবং মুকুন্দ, শঙ্কর, ত্রিবিক্রম, ভগীরথ, পরমেশ্বর, জানকীনাথ ও শ্রীকৃষ্ণ এই সাত পুত্র। আবার পৌত্রও তাঁহার ৩ জন এক এক সন্তানে কতকগুলি করিয়া হইয়াছিল দেখ; প্রথম পুত্র মুকুন্দের ৭ পুত্র, দ্বিতীয় পুত্র শঙ্করের ৫ পুত্র এবং ষষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নাথের ৪ পুত্র। এখন যে লোকের ৩ জন জামাই ১১টী কন্যা, তাহার বয়স কত হইলে পারে দেখি? অন্ততঃ ৩০ বা ৩৫ বৎসর, তাহার কম নহে। অতএব কৃত্তিবাস, যোগেশ্বরের সমবয়স্ক বা ৫ বৎসর বড় হইলেও, যোগেশ্বরের যখন সন্তানাদি হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। আগে বলিয়াছি। কিন্তু কৃত্তিবাস যোগেশ্বরের অনেক আগের লোক; যেহেতু কৃত্তিবাস এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ভাই গঙ্গানন্দ ভট্টের পিতা লক্ষ্মীধর, অথবা লক্ষ্মীধরের পুত্র ও গঙ্গানন্দের পিতা নহেন, কিংবা জীবিত থাকিলে ইহাঁদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানন্দকে ভট্টকে লইয়া কুলবিচার হইত না এবং ফেলীবরে কুলবিচারের সময় অবশ্যই ইহাঁদের উল্লেখ থাকিত কিন্তু তাহা না থাকাতে ইহাই নিঃসন্দেহ অবধারিত হইতেছে যে, যোগেশ্বরের জন্মপূর্বেই ভাই ও ভাগিনেয় সমেত কৃত্তিবাস গতাসু হইয়াছেন।

আর যে সকল উপরের যোগেশ্বরের সমসাময়িক যে সকল বিবরণ লিখিলাম, তাহা যোগেশ্বর সম্বন্ধে নিতান্ত সত্য বলিয়া বোধ হয়। যোগেশ্বরের জন্ম গঙ্গানন্দের খুব বয়সে তাহার পর দুরবস্থায় তিনি দেবীবরের অনুগ্রহে এবং সম্মানিত হওয়ায় কিছুকাল পরে কুলিনদিগের সংখ্যা এবং বিবরণ সম্বলিত মহাবংশ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত বহু পুরুষ হইতে গঙ্গানন্দের সময় পর্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উহা দুই তিন পুরুষের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। উহা দুই তিন পুরুষের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাবংশে কৃত্তিবাসের খুড়তুত ও পিসতুত ভাইদের অনেকেরই উল্লেখ আছে, তাহাদের তিন, তাহাদেরও বা চারি পুরুষের পর্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়;—যেমন গঙ্গানন্দ ভট্টের দুই পুত্র লইয়া ৪ পুরুষ হয়; কিন্তু কৃত্তিবাস ও তাঁহার সহোদর ভাইদের বংশের সম্বন্ধে একেবারে কোনই বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহাতে এই রূপ অনুমান হইতে পারে অর্থাৎ কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অধিক, কেহ বহুত নিঃসন্তান হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বা কন্যা উৎপাদনের দ্বারা কুল রক্ষার পূর্ব্বেই গতায়ু হইয়াছিলেন, নয় ত কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় বিবাহিত করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস নবদ্বীপে পণ্ডিত

ও চট্টোপাধ্যায় গ্রামের বৃদ্ধ লোকের মুখে এরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছি যে, তিনি নিজের অসহায় অবস্থার পরিচয় প্রদান করেন।

যাহা হউক, উপরে যাহা লেখা হইল, তদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে, ভূতিরাম পণ্ডিত দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেলবন্ধন হওয়ার অনেক আগেকার লোক। মেলবন্ধনের সমকালিক ও নিকটবর্ত্তী হইলেও, মেলবন্ধনের সময়ে অন্ততঃ ৭০ কি ৮০ বর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে হয়; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের অনেক পূর্ব্বে পণ্ডিত বরদাই প্রভৃতি ছিলেন, তখন উহার উপর নির্ভর করিয়া আর ২০০ বৎসর চলিতেছে, মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী পূর্ব্বে ভূতিরামের কাল ধরিলে অযৌক্তিক হইতে পারে না। এক কথা বেটীর উপর বলিতে গেলে, উহারে যতকিছু বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়সম্বন্ধবিশিষ্ট কেবল এই একটী মাত্র সত্য অবলম্বন করিয়াই সেই কল্পনাগুলি হইয়াছে যে, সপ্তগ্রাম কর্ত্তৃক মেলবন্ধন কার্য্যের অনধিক শতবৎসর পূর্ব্বে ভূতিরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন দেখিতে হইবে যে মেলবন্ধন হইয়াছিল কখন, অর্থাৎ দেবীবর ঘটক কোন সময়ের লোক, সুতরাং তাঁহার সমকালে মেলবন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কিসে তাহা নির্ণয় করা যায়? কবিকুল দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ৺ঈশান নাগরের একটী কারিকায় তদ্রূপ বিবরণের সূত্র পাওয়া যায়। ঐ কারিকায় যে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ আছে, লেখকের লিখন ভঙ্গীতে মনে হইতেছে যে, যেন সে ঘটনাগুলি এক সময়ে ঘটিয়াছিল।

---

(১০) ঈশান নাগরের সে কারিকাটি এই,—

'চন্দ্রে ছোড়া বাঁড় দুই নাসে তাঁর নাম। কথা কৈ মোদী বুদ্ধি ঘটে ঘরে যার॥
কাণা খোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম ঠি, যে। শ্রীধর সে ঘরে যে করেছে বাস॥
তিনকড়ি তিনপথে কাঁটা দিয়ে গেল। আর মৃত্যু একত্রে হইল নিশ্চয়॥
কাণীন নিবাসে যার সেই নাম হয়। আচীন বটির মত কথা হয়ে যায়॥
পরী ছেলে নিয়ে বেটা বটে ঠি বড়। মাতা নারী দুই জাতী সন্তানেতে দড়॥
এই কথা যাহে যাকে সে হোল ধুরা। বড় বড় ঘর যত হইল নির্দ্দূর॥
সেই কালে সপ্তগ্রাম বসে এক জন। মনে যাহে যেমনি লোকে মানে মান॥
সে ছোড়, মনে করে কুল্য করে ভাগ। তদবধি তুলে যাহে কুলিনের দাগ।
ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই চারি ঘর। আসন দুখান পেয়ে হয়ে গেল বড়।'

এ বিষয়ে সকলের নিকট নিবেদন যে, ইহার অন্তর্গত নিগূঢ়তত্ত্ব, ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঘটনার কালনির্ণয় প্রভৃতি যে যে বিষয়ে যাহার কিছু বক্তব্য থাকে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা লিখিয়া পাঠাইলে, ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনার জন্য বিশেষ সুবিধা হইবে। ইতি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

[illegible] [illegible] [illegible] [

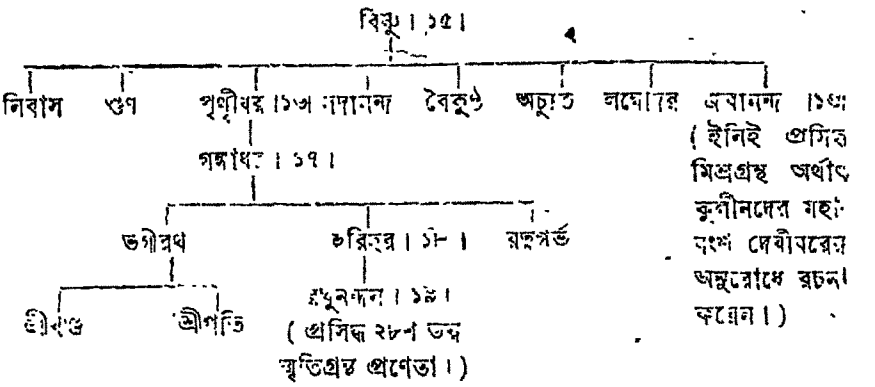


এক্ষণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবকাল বা জন্ম-সময় রূপ অতি বৃহৎ ও পরিচিত ঘটনার মধ্যস্থল মানদণ্ডরূপে স্থাপন করিয়া, কৃত্তিবাসের সময়ের শেষ মীমাংসা যথাসম্ভব সম্পন্ন করিতেছি।

১৪০৭ শকে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। উপরে দেখান গিয়াছে যে দেবীবর কর্ত্তৃক মেল বন্ধনের সময় হইতে ন্যূনাধিক একশত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব। এখন চৈতন্যদেবের জন্ম-শকের কত বৎসর পূর্ব্বে মেলবন্ধন হইয়াছিল, তাহা যদি নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মোটামুটী অথচ নিঃসংশয়রূপে কৃত্তিবাসের কাল নিরূপিত হইতে আর কোনই প্রতিবন্ধক থাকে না। অবশ্য তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সন তারিখ পর্য্যন্ত যে একেবারে নির্ভুল ও ঠিক হইবে, ইহা বলিতে যাওয়া এবং বিশ্বাস করা, উভয়ই বাতুলের কার্য্য। উহা সকল সময়ে ও সকল স্থানেই মোটামুটী মকমে হইয়া থাকে। মনে কর যেমন বিদ্যাপতির কাল নির্ণয় করিতে হইবে; এস্থলে বিদ্যাপতির কি জন্ম কি মৃত্যু, এসবটাই ঠিক পাইবার যো নাই। একপ স্থলে একটি মাত্র এই ঘটনা

---

মূল পুস্তক দুই খানি নহে, পটকারগণের নিকট কথা সংগ্রহ করিল। এই জন্যই বোধ হয় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের এক খানি তালিকায় কোথাও একটী পুরুষ পড়িয়া গিয়াছে, আবার কোথাও বা নিজের এক পুরুষ উর্দ্ধে উঠিয়া,—উপরের পুরুষ সংখ্যা বাড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, কোন পুস্তকবিশেষ হইতে উঠাইয়া সে ভুল দেখাইতে ইচ্ছা করি না। এই বংশ তালিকার আর একটী কথা জানা আবশ্যক, অর্থাৎ মুখোপাধ্যায় বংশ, যিনি বল্লালের কাছে কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন, তিনি মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে ১৪শ পুরুষ। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে যাঁহারা সেই মর্য্যাদা পান, তাঁহারা মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে কেহ ৯ম এবং কেহ বা ১১শ পুরুষ। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবশ্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে সাহস হয় না যে, মুখোপাধ্যায় বংশ হইতে বন্দ্যোবংশের লোকেরা অধিক দীর্ঘজীবি থাকাতেই, উভয়ের মধ্যে এরূপ পুরুষবৃদ্ধি অসঙ্গত বাড়িয়াছে। কৌলীন্য সংস্থাপনের পরবর্ত্তী কালেও, মুখো বংশে এইরূপ পুরুষাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে যাঁহারা বন্দ্যোবংশোদ্ভব তাহারা মূল পঞ্চব্রাহ্মণ হইতে কেহ ৩০, কেহ ৩১।৩২ বা ৩৩ পুরুষ, কিন্তু মুখোবংশের সে স্থলে ৩৭।৩৮।৩৯ পুরুষ পর্য্যন্ত গণনা হইতে দেখা যায়

পাওয়া যায় যে, ১৩২৩ শকে মিথিলার রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। তখন এই শক চৈতন্যের জন্ম শক ১৪০৭ হইতে বাদ দিলে ৮৪ পাওয়া যায়। সুতরাং উহারই অবলম্বনে সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে যে, বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩২৩ শকে বিদ্যাপতি কত ছিলেন কি বুঝা ছিলেন, অথবা তাহার কত বৎসর আগে তাঁহার জন্ম ও কত বর্ষ পরে মৃত্যু হয়, তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। তবে যে ঐ শক, বিদ্যাপতির জীবনের কোন এক সময়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছে, ইহাই মোটের উপর ধরিয়া, ঐ ১৩২৩ শককে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল বলিয়া গণনা করা যায়। যেখানে আদি অন্ত সকলই অনিশ্চিত এবং যেখানে সেই আদি বা অন্ত এতদুভয়ের যে কোন একটি উদ্ধার করিবার কোনই উপায় নাই, সেখানে জীবনকালজ্ঞাপক কোন একটা সময়ের সন্ধান পাইলেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সর্ব্বত্র উহাই রীতি। এখানেও তাহাই। কৃত্তিবাসের যে সময় আমি নির্দ্দিষ্ট করিতে যাইতেছি, তাহা কৃত্তিবাসের সেই এক বা অতীত সময়ের সম্বন্ধ করিবেই বটে, কিন্তু সেখানে যে কারণে ও যে ভাবে উপাদানে কৃত্তিবাসের কাল নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে, তাহাতে বুদ্ধিমান পাঠকের মহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সেই কাল কৃত্তিবাসের জীবনকালের মোল এবং সম্পূর্ণ বলিয়াই সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছে।

উপরে যে বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে বহাদুর কুলীন বলিয়া মহেশ্বরবংশ হইতে ১০ সংখ্যায় উপেন্দ্র ঠক্কুর স্মৃতিপ্রণেতা ভট্টনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য, ঠাঁহার সহযোগী ছয় ঘোষ ও বসুদের পঞ্চ বাড়ি হইতে ৩, রঘুনন্দন এবং চৈতন্য উভয়ের বয়স প্রায় একই ছিল; যেহেতু অনেক কাল সহাধ্যায়ীদের মধ্যে সেই নিয়মই দেখা যায়। অতএব এখন রঘুনন্দনের গুরু প্রসিদ্ধ ভবানন্দ মিশ্র, রঘুনন্দনের কত কাল পরে উঠিয়া মহাবংশ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থই বংশের অপর সকলের নিকট উৎসাহ হইয়াই যে রঘুনন্দনের কত কাল পরে বর্ত্তমান করিয়াছিলেন, ইহা নির্ণয় করিতে পারিলে, মহাধ্যায়ী সম্প্রদায়ে চৈতন্যদেবের ভাবী ভক্ত আদর্শ বলিয়া কত কাল পরে আখ্যাত হইতে পারেন। তাহার পর চৈতন্যের জন্মসন বৃহৎ ও সন্দেহরহিত ঘটনা লক্ষ্য করিয়া কালোদ্ধার অবশিষ্ট অংশ সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে।

উপরে যে বংশ-তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, মূল একই বংশের দুই বিভিন্ন শাখায় রঘুনন্দন ও দেবীবর ২য় পুরুষ, রঘুনন্দন ১৯ ও দেবীবর ১৮। ইহাতে সকলেই মনে হইতে পারে যে, তবে বুঝি দেবী বর ও রঘুনন্দন এক সময়ের লোক, অন্ততঃ দেবীবর এক পুরুষ আগে জন্মিয়া দেবীবরের বার্দ্ধক্যে, ও রঘুনন্দনের যৌবনারম্ভে উভয়ের দেখা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এমা বড়ই ভুল। পুরুষই আমার নির্দ্দিষ্ট

যে কোন দুই ভ্রাতা, তুলনা করিলে বয়সের কোন দুই পার্থক্য, মুখের গঠনাদিতে সাধারণ সমতা দেখিলেই তাহাদের যমজ-সম্পর্ক অনুমান করা অতি সহজের কার্য্য। বিভিন্ন বংশ বা একই বংশে বিভিন্ন পরিবারের, নারীগণের দীর্ঘজীবিত্ব বা অল্পজীবিত্ব হেতু, পুরুষ গণনায় সংখ্যা সমতা থাকে বা ব্যবধান অতি বিপুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আমাদের দেবীবর পুরুষ সংখ্যায় ১৮ ও রঘুনন্দনে ১৯ হইলেও দেবীবর রঘুনন্দন, অর্থাৎ অনেক আগের লোক এবং একথা নিঃসঙ্কোচ বিবেচনায় সাধারণ নিয়মরূপে প্রমাণিত হইতে পারিবে।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে, যে দুজনের কিছু বেশী পরে, দেবীবর যাহাকে অনুযুক্ত বৈদ্য কুলানন্দ কুলীনদিগের সভাপণ্ডিত রচনা করেন—রঘুনন্দন ঐ পুস্তকে উল্লিখিত ১০ পুরুষ হইতেও, নিজের সময়ের অনেক কি, বিশ্ব পরে বাঙ্গলার স্মার্ত্ত পুরোধাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। এখানেও নিজের বংশ কুলীনবংশ, তিনি যখন অকুলীনের নাম পর্য্যন্ত করেন নাই, তখন নিশ্চয় তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল বলিয়া মনে করা হইবে। কলতঃ ঘটনাচক্রে তাহাই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, রঘুনন্দনের সময়ে সর্ব্ব কনিষ্ঠ দেবানন্দ, তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতা হরীন্দ্রদেব এবং রঘুনন্দন বাঙ্গলার বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। তখন, তাঁহারা, অসংগঠিত। ইহার মধ্যে তাঁহাদের দুইটি পুত্রের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে; কিন্তু দেবানন্দ, নাম ব্যতিরেক ও কুলে কোনরূপ ইহাদের কোন পুত্র-সন্তান আদৌ কোন প্রকার কুলীনের উল্লেখ একেবারেই নাই। সুতরাং এই কারণ হইতে নিঃসন্দেহই বলা যাইতেছে যে, রঘুনন্দন মহাবংশ রচিত হন; তখন রঘুনন্দনের জন্ম হয় নাই। এদিকে রঘুনন্দনের মনে হেমাদ্রি কল্পতরুর উল্লেখ আছে, তখন রঘুনন্দনের জন্মের যে অনেক আগে হেমাদ্রি রচিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয় বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলে কত আগে?—এ আলোচনা ঠিক করিতে পারা যাইলে, যদি শরিফের কত সন্তান-পরে তাঁহার বংশ মধুসূদন ঘটকের কি হেতুর জন্য রচিত হইতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা যখন জানিতে পারা যাইতেছে না, তখন দেবীবর উপর রঘুনন্দনের জন্ম হইবার যে বহু আগে মহাবংশ রচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। দেবানন্দ নিজে অতি বৃদ্ধবয়সে যে ৩ খানি গ্রন্থ রচনা করেন, সে সম্বন্ধের প্রমাণ—এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট যে, এই ৩ খানি গ্রন্থের শেষোক্ত গ্রন্থের প্রথমোক্ত পর্য্যন্ত (অর্থাৎ উদয়রাজ জীবনের পূর্ব্বভাগ) দেখিতে পান, সে ব্যক্তি কখনও অতিবৃদ্ধ না হইয়া যায় না।

তবে, মহাবংশ রচিত হইবার যে কোন সময়ের পরে ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এখন পর্য্যন্ত হইতেছে যে মেলবন্ধনের কত পরে রচিত।

দেবীবর ঘটকদিগের দোষ-গুণ বিচার করিয়া ৩৬ মেল বদ্ধ করেন। যাহারা মেলী, অর্থাৎ যাহাদের লইয়া মেলবন্ধন হয়, তাঁহারা যাঁর যাঁর জীবনকালে নিজ নিজ মেল ঠিকমত রাখিতে আপনারা চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে আর কোন নূতন দোষ

পার্থ হইতে দেখা যাই। কিন্তু তাঁহাদের পরে বহু স্থলেই আর সেরূপ নাই না; [illegible] পুরুষ পোত্রদের মধ্যে অনেকেই ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। কেহ নিজের, কেহ পুত্র-কন্যার বিবাহে, মেলের বিচারটি কার্য্য করিতে লাগিল, মেলের মধ্যে মধ্যেরাটী, নাগরেখ নামে প্রভৃতি খুঁটিনাটি এবং মহেশ্বরী, কুলিনাভি, বাসুদেবী প্রভৃতি [illegible] সকলে কুলীন হইতে লাগিল। এখন খুব দেখি, ইহাতে ক্ষতি মনে যায়? একটা দৃষ্টান্ত দিলে [illegible] দেখ বংশের সময় কুলে মাতুলের মুখাপেক্ষা নাই; তিনি বংশ, মেল [illegible] বিচারিবেন। একজন কন্যার পক্ষ তাঁহার মুখ হয় মহাশয়। এই কন্যা [illegible] কন্যা হইলে, সেই কন্যা লইয়া মেলের মুখটীর সঙ্গে কুল কথা নাই সেই মেলে [illegible] মেলে একটা ঘাক খুঁজে বাহির করেন। [illegible] তাহার পর তাহার কন্যা হওয়া ও সেই কন্যা বয়স্থা হইলে তবে কন্যাটীর সঙ্গে কুল কথা। ইহাতে [illegible] হইতে পারে? ৩০।৩৫ বৎসরের ত কম নহে। পাছে এই ইতেওই [illegible] এবং তাহার গর্ভে পতিষ্ঠিত [illegible] মেলেরও উন্নতে মহাবংশ লোপ পেয়ে যায়। [illegible] মহাবংশ নষ্ট হইলে, [illegible] খুঁত ও [illegible] দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] ইহার আর অন্য এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কি হইতে পারে যে, [illegible] আর [illegible] [illegible] কর্তৃক [illegible]

[illegible] মেলবন্ধনের [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

হইবে যে, চৈতন্যদেবের নামের ন্যূনাধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক কুলীনদিগের বেলাধন হইয়াছিল।[১৪] পুনশ্চ, পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, মেলবন্ধনের ন্যূনাধিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের জন্ম। তাহা হইলে এই ৫০ এবং ১০০ একত্র করিলে হইতেছে যে, চৈতন্যদেবের প্রায় ন্যূনাধিক ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১২৫০ শকে বা ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে গণনাতেও তাহাই ১৩৫৩ হয়। যথা—

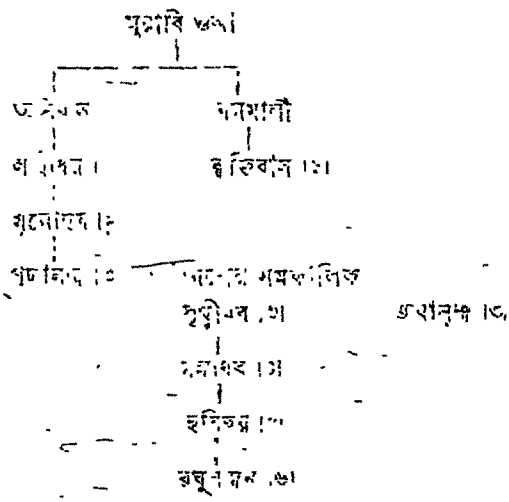


---

(১৪) পূর্ব্বে এস্থলে মুরারি ওঝার কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঐ কারিকা হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীবর ঘটক চৈতন্যদেবের সমকালে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন। ইহার পরে ও অন্যান্য গ্রন্থের সমস্ত কৌলীন্যবিষয়ক আলোচনা, লেখকের একটী ঘটকের নিকটে বসিয়া উহাদের কোন সময়ের ও কোন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখ, —

"নিত্যানন্দের দুই পুত্র শচী বীর। ঈশান জাহ্নবা স্বামী বর্ণপরে গুরু॥
সে কালে বীরভদ্র কন্যা পরিণিয়া যান। সেই কালে লোহে রেখ দেবী ঈশ্বর॥
বসুধার অগ্রে আর বীরে মা জাহ্নবী। অনেক বাড়ুরি নাম অতি গোষ্ঠীবী॥
এমন দুর্লভী গুণ আমি পরিচয়। তাহার কারণে যে। দেবীবরক॥"

এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী যখন কুলিয়ার [illegible] নিত্যানন্দ ও জাহ্নবাদেবীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, সেই সময়ে দেবীবরের জন্ম হয়। এবং ঠিক হইলে দেবী বর ও চৈতন্যদেব সমসাময়িক হইলেও বা, নিত্যানন্দ এই তিন পুরুষ পরে। যে হেতু, নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের অনেক পরে, উপরন্তু ও বিবাহ করিয়া পরে পুনরায় চৈতন্যের অন্তর্ধানের পরে ও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া দুইটী পুত্র রাখিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পুত্রের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে। বীরভদ্রের জন্ম হয় এবং নিত্যানন্দের পরলোক গমন ১৪৩৩ শকের [illegible] ওঝার পর হইতে তাঁহার কন্যা হইয়া বয়স্থা হইয়াছে এবং তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য খ্যাতি পূর্ব্বাপর সমান বিরাজ করিতেছে। সুতরাং দেবীবর চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

ইহার মধ্যে এক পুরুষ ছাড়িয়া দিয়া, ৩ পুরুষে ন্যূনকল্পে প্রতি পুরুষ ৩০ বৎসর ধরিয়া ধরিলেও, ১১০ বৎসর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ তিন পুরুষে একশত বৎসর করিয়া ধরার নিয়মই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত সকলেরই বিশ্বাস বিদ্যাপতি ও তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাস, এই দুইজন বাঙ্গালার আদিকবি। কিন্তু এখন ঐ সকল একরূপ স্থির প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাস তাঁহাদেরও বহু আগের লোক। যদি বলা যায় যে, বিদ্যাপতির যে কাল ধরা যায় অর্থাৎ ১৩২৬ শক, তখন তাঁহার কবি খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত, আর কৃত্তিবাসের যে কাল ধরা হইল, অর্থাৎ ১২৫৭ শক, তাহা তাঁহার জন্ম সময়, ভাল তাহাই হউক, এটাও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতির কবিখ্যাতি হইতে কৃত্তিবাসের জন্ম ৬৯ বৎসর আগে। সুতরাং এদিকে, অল্প পরিমাণে হউক, বা অধিক পরিমাণেই হউক, কৃত্তিবাস যে বিদ্যাপতির অনেক আগের ও প্রাচীন, এ কথায় সন্দেহ নাই।

---

ওদিকে ত ঐ, এদিকে আবার ভামানা দেখ। আর ঐ মেয়ের সঙ্গে যুলিয়া কেন বেণীর বাড়ির গেলেন, সেখানে হওয়ার কথাটা কি, তুলিয়া সেন বিভিন্ন বিভিন্ন জোর সম্পর্ক হেতু তাহাতে ইহাঁর দুইটী যুগের হউক,—মাধবমাসী ও মালঞ্চদাদী। তাহাতেও ছাড়া নাই, আবার তাহার পর, একের সঙ্গে অন্য দোষ সংসর্গে যুগের মধ্যে হইল বিবিধ রূপ। সেই মজার ব্যাপার একটার নাম ধরা যাউক। এ পাড়ার কারণ কেহ জানে কি?—নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র বাঙ্গালী সমাজ সংস্কার হেতু তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া পার্ব্বতী মধুমতে লোকান্তর হওয়ায়, অন্য কেহ তাহার কন্যা বিবাহ করে না। পার্ব্বতী যখন অনাথা হইল, তখন তাঁহার কন্যাকে অনাথিনী করিবার জন্য বিধাতা নিযুক্ত করিলেন। ঐ নাই অনারেবল। এখন সেখানে দৈবগতিকে উপস্থিত কিন্তু হরি কলেজে পুত্র রামদাস। পার্ব্বতী তাকে রামদাসকে, বলিয়াই ছিল, "বাবা তোমার বাপ ত নাই, তুমিই অভিভাবক, সুতরাং বাসি বিবাহ তোমাকেই দিতে হইবে;" ইহা বলিয়া বলপূর্ব্বক রামদাসকে দিয়া তাহাই করাইল। ওদিকে পার্ব্বতীর অপর স্ত্রী ও প্রেত কন্যার মাতা এবং তাই কন্যার স্ত্রী ও রামদাসের মাতা, ঈশানী, শ্মশানে অহোদন, ভয়ী। সুতরাং রামদাসকে যাহাতে লইয়া বাসি বিবাহ ও কুশণ্ডিকা করিতে হইবে, তিনি বলপূর্ব্বক হইলেন। সুতরাং আসে ভয়ী, সঙ্গে বিবাহিতা, সেথে পত্নী। এতদ্বিষয় নিম্নলিখিত ঘটক লিখিয়া আছে—

"আগে পিছে তত্ত্ব পুত্রে ভ্রাতে হয় কন্যাকার জন্মী। বলাৎকারে পার্ব্বতীশক্তিস্বয়ংবিধিতো বরে॥"

"হরিপ্রিয়া মাসীর বিমাতায় পতি। মুখের কন্যা বিহা করি গেল তার সতি॥

কন্যার ভগিনী মাতা দুই সহোদরা। বিমাতা ভগিনীপতি কোথা আছে কারা॥ ফুলঝারিকা দেবরাজা ইহাঁহ লইয়া বীরভদ্রী থাক হইল।"

এখানেও উপরোক্ত সম্বন্ধে লোকে কি অপূর্ব্ব প্রমাণ নহেই উদ্ধৃত করিয়া থাকে। যে মূল এই উদ্ধৃত সম্বন্ধ, তুলোপাড়ে নহেও তাহাই। প্রাচীন ঘটকেরা যেরূপ বিদ্বান্ ছিলেন ও যেরূপ সাবধানতার সহিত ঘটক-কুল নির্ণয় করিতেন, আপেক্ষাকৃত আধুনিক, অনভিজ্ঞ, বাঙ্গালা কবিতাকারক ঘটকে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের লেখা সর্ব্বদাই অতি সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়।

অতএব বাঙ্গালার প্রাচীন কবিদিগের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গৌর্ব্বীপথ্য এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত বাঙ্গালার আদিকবি ও লেখক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্যের পিতৃস্থানীয়। দ্বিতীয় স্থানীয় চৈতন্যদেবের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। তৃতীয় স্থানীয়, চৈতন্যদেবের জন্ম সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে রচিত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা বসুরাজ্যের গুণরাজ খাঁ বা মালাধর বসু। চতুর্থ, চৈতন্যদেবের শেষ বয়সের সময় রচিত চৈতন্যভাগবতপ্রণেতা বৃন্দাবন দাস। পঞ্চম, চৈতন্যের অন্তর্ধান হওয়ার কিছু পরে রচিত চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ষষ্ঠ, চণ্ডীমঙ্গল প্রণেতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অকবর বাদশাহের সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। সপ্তম, পূর্ব্বগত সকল অপেক্ষা অতি মহাকবি ও অতিশয় প্রতিভা-শালী, ভারতরাম রায়, বাঙ্গালা মহাভারতের কর্ত্তা। ইনি তিনশত বৎসর হইল, ভাটোরা ও দাঁইহাটের কাছে এবং অদ্যকা গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত সিঙ্গিগ্রাম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টম, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কবি ভারতচন্দ্র রায়। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের মধ্যে এই ব্যবধানকালে, বাঙ্গালার আরও অনেক পুঁথিলেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকল উল্লেখের বড় এখানে স্থানাভাব।

কৃত্তিবাস সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কবি বলিয়া, কৃত্তিবাসে প্রাচীনত্বের ব্যবহার এবং ছন্দে মাত্রা ও অক্ষরের ব্যভিচার সর্ব্বাই অতিশয় বেশী বেশী এবং ছন্দও এত পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। পয়ারই প্রায় সর্ব্বত্র, ত্রিপদী কখনও সাতটি দুই চারিপদ মাত্র। পয়ারের কোথাও ১৪, কোথাও কোথাও ১৫, ১৬, ১৮ অক্ষর, অথবা অপেক্ষাকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আসল কৃত্তিবাস আপাততঃ পাঠককে দেখাইবার কোনই উপায় নাই।[১০] যেহেতু, এখন বাজারে যাহা কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়া চলিত, তাহাতে কৃত্তিবাসের নামমাত্র আছে, তাঁহার রচনা ভাগ তাহাতে কিছুই নাই বলিলে হয়। তাঁহার নামে যে রামায়ণ বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ জয়গোপালী কাণ্ড। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে একজন পণ্ডিত, তাঁহার নিকট কৃত্তিবাসের আসল রচনা ভাল না লাগায়, তাহা সংশোধন বা অন্য কথায় খুন পারাপি করিয়া আসলের পরিবর্ত্তে নিজের রচিত ১৪ অক্ষর পরিমিত পয়ারাদি ছন্দে পুস্তক পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাই এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ নামে মুদ্রিত ও

---

(১০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এখনা কৃত্তিবাসের মূল রচনা যাহা, তাহা উদ্ধার করিবার ভার লইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহারা যদি এ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন এবং একটু শীঘ্র শীঘ্র পারেন; তাহা হইলে তাঁহাদের সভ্যগণের মধ্যে যিনি যিনি গ্রাহক হইয়া তাহা সাধন করিয়া তুলিবেন, তাঁহাতে তাঁহাদের গ্রাহক হওয়ার ফল ফলিবে নিশ্চয়। রামায় নিকট আসল কৃত্তিবাসের যে একখণ্ড হাতের লেখা পুঁথি ছিল, তাহা পরিষৎ সংগ্রহের সাহায্যার্থ সাহিত্য পরিষদে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তথাপি যাহা কিছু লিখিলাম ও উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কেবল স্মৃতি হইতে।

বিকৃত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এমন কোন দুই পংক্তি দেখা হয় নাই, যাহা জন-শ্রোতাদের হাতে রূপান্তরিত হইয়া নূতন না হইয়াছে। তবে উহারই মধ্যে অঙ্গদ ও ইন্দ্রজিৎ এবং তাহার পর রাবণ ও অঙ্গদে যে কথোপকথন, তাহা এতই সুন্দর ও রসপ্রদ যে, এমন যে শ্রুতিশ্রোতা তিনিও তাহার মধ্যে দৈবক্রমে প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়াতে, সে অংশের অবিকৃত পরিচয় দিতে পারেন নাই। অতএব বর্ত্তমান মুদ্রিত রামায়ণে, কৃত্তিবাসের আসল রচনার কেবল ঐ অংশ টুকুই দেখিতে পাওয়া যায়। যে রচনার যমুনা ঐ অংশ টুকুতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ধরণে প্রায় সমগ্র রামায়ণই রচিত হইয়াছিল।

প্রচলিত গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার এবং ছন্দের যথেচ্ছা ব্যভিচার, এ সকল সত্ত্বেও, যে চিত্তমোহকরী রচনা অঙ্গদ রায়বারে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের সহ অঙ্গদের বাক্যালাপে এবং যে রস সেই রচনায় সীমা ছাড়াইয়া উথলিয়া পড়িতেছে, রামায়ণের সমগ্র রচনাতেই কৃত্তিবাস সেই মোহকরী শক্তির সন্নিবেশ এবং সেই রসমাধুরীর পূর্ণ প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই রস ভাবুক পাঠককে মোহকে মুগ্ধবৎ নিরবচ্ছিন্ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এই রামায়ণ, গত পাঁচশত বৎসর হইতে, কি ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডাল, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলকেই রাবণবধে সমান কুতোহিত; ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়তায় মুগ্ধের শিক্ষিত এবং বর্ষ বিষয়ে সমান অমুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছে। কৃত্তিবাসের নামেই এমন একটা মোহকরী শক্তি জড়িয়া গিয়াছে যে, অদ্য পাঁচশত বৎসর হইতে মূল রামায়ণ একাদ্যক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে, কেবল কৃত্তিবাসের নামের গুণেই তাহা সর্ব্বসাধারণে সমান আদরের সহিত চলিয়া যাইতেছে, এবং যদি কৃত্তিবাসের কাব্যে সংস্কার ও মূল উদ্ধার না ঘটে, তাহা হইলেও চিরকাল হইয়া চলিয়া যাইতে পারিবে। এই বাল্মীকি ও ব্যাস ভবভূতি, বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে কি নিরুপম অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কৃত্তিবাস অনেক নবাব ভূপের আদেশে বেড়াইয়াছিলেন, এবং শেষে নাকি কোন রাজার অনুরোধে পড়িয়া তিনি রামায়ণ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না, কৃত্তিবাসের জীবনীতে ভ্রমণ বা অপর কোন বিশেষ ঘটনা পরিজ্ঞাত হইবার আর কোনই উপায় নাই বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। যাহাহউক, কৃত্তিবাসের রচনা পাঠ করিলে, তিনি যে কখনও কোন নবাব বা রাজা, রাজবাড়ী বা রাজসভা এবং তাহাদের চালচলন দেখিতে পাইয়াছিলেন, অথবা পড়ুয়া পর-পরিচালিত, কথঞ্চিৎ দিনপাতক্ষম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কুল আকাঙ্ক্ষাপল্লী স্বীয় বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামের চতুঃসীমার বাহিরে কখনও গিয়াছিলেন, এমনটা যেন মনে আইসে না। যেহেতু তজ্জন্য ক্ষুদ্রপল্লীতে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা এবং তাহারই অতিরঞ্জিত বা ঊনমাত্রায় স্বীয় ধারণা। যাহা কিছু, সেই সকলের দ্বারাই উদ্ভাসিত

কাব্য আগাগোড়া চিহ্নিত ও চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। মুক্তিমুক্তকীর্ত্তির কালালের রাজ-বিভূতির ধারণা যেমন, চাষাভূষার মনে প্রচলিত সামান্য একটা গীত অনুসারে——

"এবার মরে রাজা হব,
খাটে বসে কড়ি মুক্তকী খাজা খাব।"

কৃত্তিবাসেরও সোণার লঙ্কা এবং রাবণের ত্রিলোকজিৎ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির ধারণাও তদ্রূপ। তদানীন্তন রাজসভা এবং তাহার বাড়ী ঘর ও আসবাব আয়োজনাদির দৃষ্টে তাহা উদ্ভূত। মানুষের মন পর্য্যন্ত পদার্থনিকরজাত ভাবরাশিতেই গঠিত হইয়া থাকে এবং যেরূপ গঠিতহয়, মানুষ সেই মানসিক গণ্ডির বাহিরে, কি চিন্তা কি কাজে, কোন প্রকারেই যাইতে সমর্থ হয় না।

হনুমান্ সোণার লঙ্কায় অগ্নি দিতে উঠিয়াই, আগে লাফ দিয়া বড় ঘরের চালের উপর পড়িল। ফলতঃ কি রাবণ, কি বিভীষণ, কি অন্য কেহ! সোণার লঙ্কায় চৌরী—খড়ুয়া ঘর সকলেরই, কুম্ভকর্ণের নিবাসও একখানি অতি বড় গাঙড়া চৌচালা। আরও, এখনও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও বংশে নারিকেল গাছ পুঁতিতে নাই, কাহারও বা চণ্ডীমণ্ডপ করিলে বংশ নষ্ট হয়, সেইরূপ, কে জানে এদের, এ রাবণের বংশেও, পাকা ঘর করিতে বুঝি পূর্ব্বপুরুষের মানা ছিল, অথবা পাকাঘর করিলে বুঝি সহিত না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।—নতুবা এমন একটা সোণার লঙ্কাখানও এত বড় ত্রিলোকজিৎ ঐশ্বর্য্যটা, তাহার মধ্যেও, বলিব কি মাথামুণ্ড, বলি—কেবল খড়ুয়া ঘর। আবার দেখ, অঙ্গদ রাবণের কাছ ঝাঁপ দিয়া ও এমন হঠাৎ একঘরে রাজসভায় উপস্থিত; তাহার পর রাজের কুণ্ডলী করিয়া অঙ্গদের উৎক্ষাসন করার কথাটাও নাটক; অঙ্গদ রাবণে ভোকাভুকিও যাউক; শেষে অঙ্গদ রাবণে মড়াইড়ি ও হউক। শেষে অঙ্গদ রাবণকে ফেলিয়া দিয়া ও তাহার গায়ে মুতিয়া,—মুমুট লইয়া পালিয়ে পার! তখন রাবণের দশা কি হইল?—রাবণ অধোমুখে গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছেন ও পার্শ্বস্থ সভাসদ্‌গণ কেহ যে তাঁহাকে সাহায্য করে নাই, তাই বলিয়া সকলকে গালি পাড়িতেছেন। এত বড় ত্রিলোকজিৎ সোণার লঙ্কাপুরীর রাজসভাটা, তাহাতে এতই ধূলা! সেকালে আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে, এখনকার মত শতরঞ্চি কম্বল বা গালের অভাবে (তাহা মিলিতও না বটে বা কেনার সামর্থও ছিল না অনেকের), টোলঘরে বা চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাসন বিছাইয়া ভদ্রলোকের জমায়েত বা সভাধিবেশন হইত; তাহাতে অবশ্য ধূলার অভাব কিছুমাত্রই থাকিত না। তাহাই কি কৃত্তিবাসের লঙ্কা এবং রাবণের সভাও কি সেইরূপ ছিল?

আবার দেখ,—শ্যামনেমি বধে, শ্যামনেমির মুণ্ডটা লয়ে ফিঁড়িয়া, হনুমানের পথ হইল যে, উহা সেজে জড়াইয়া ও ঘুড়িয়া দিয়া রাবণের সম্মুখে লইয়া ফেলেন। এদিকে সন্ধ্যাবাত্র, ঘুট ঘুট অন্ধকার, দিয়া মোসায়েব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে, এমন

সময়ে ভোগবিলাসী রাবণরাজা কেন না পাত্র মিত্র লইয়া সভা করিয়া বসিবে। সভার কার্য্যও চলিতেছে পূরা দরবারে; এমন সময়ে কি একটা হঠাৎ আসিয়া সভাস্থলে স্তূপ করিয়া পড়িল। কি এটা, দেখ দেখ,—কিন্তু দেখে কে? রাজসভায় আলো নাই! সভায় ত নাই, নিকটেও বোধ হয় ছিল না, নতুবা তাহার অপেক্ষা না করিয়াই সকলে জিনিষটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে যাইবেন কে? যাহা হউক, তখন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া স্থির হইল, মুণ্ডটা কামনোয়ারই বটে! বাড়ীর পাহির প্রাঙ্গণের পার্শ্বে পূর্ব্বে থাকবণের উপর, ঢাকাটা তামাকের হুঁকা হাতে ও সান্ধ্যসমীরে ঘুট ঘুট অন্ধকারে ঢাকিয়া পাড়াগাঁয়ের পাড়াগেঁয়ে গৃহপালিত মোষদের ভ্রমাবেশ কখনও কি পাঠক দিগের সন্দেহস্থল হইয়াছিল? সেকালে উহা সাধারণ ছিল, একালেও এখন সে সাধে এমন নহে। রাবণের সাধ্য সভাতে ও তাহাতে বিশেষ কি?

কৃত্তিবাসের উপমাও তাঁহার পাড়াগাঁ খুঁজিবার বৃথা ঘুরেই গৃহীত। কুম্ভকর্ণের নাকের ছিদ্র কত বড়?—না যেন এক এক খান পঁচিশের বন্ধ ঘর। এখানে একটু বলার দরকার যে, আমাদের এই নদীমাতৃকেলায় যে সকল গৃহস্থের খড়ুয়া ঘরে বাস; তাহাদের ঘরের মধ্যে পঁচিশের বন্ধ তাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাই বলি, যে যত বড়ুক এবং কৃত্তিবাসের রাজারাজড়া ও নবাবনবোর সভায় যেমনের যতই প্রমাণ দিউক, আমি কিন্তু কেবল তাঁহার সাধুপাঠ করিয়াই বলিতে পারি যে, কৃত্তিবাস তাঁহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপল্লি কুলিয়ার চতুঃসীমার বাহিরে কখনও যান নাই; এবং যদিই বা কোথাও গিয়া থাকেন, তাহাও সেই কুলিয়ার ন্যায় সমান অবস্থাপন্ন স্থান।

উপরে বলিয়াছি যে, কৃত্তিবাসের বিষয় ধারণা, গ্রাম্যধারণার কেবল মন্ত্রণায় নহে, অধিকাংশ স্থলে তাহা উন্মাদগ্রস্তের স্বপ্ন। অনেক দিনের পর কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া সুতরাং অতি ক্ষুধার্ত্ত, অনেক আহার করিলেন। আহারীয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কুম্ভকর্ণ যে ধাওতা চৌবীর ঘুড়ুয়া ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন, তেমন দশটা চৌরীতেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। এত আহারের পর মুখশুদ্ধির জন্য সাজেই একটা পান খাওয়া উচিত। সাজেই কৃত্তিবাসও কুম্ভকর্ণকে পান খাওয়াইতে বাধ্য হইলেন। সে পান খাওয়া কিরূপ?

"পাঁচ সাত ছালা গুয়া খাইল আট দশ বোঝা পাণ।
তবু না পূরিল বীরের বদন চৌদ্দ খান॥
কত মণ খয়ের খাইল যেন বুটের রাশি।
মুখেতে ঢালিল তুল গণ্ডেক কলসী॥"

কি সর্ব্বনেশে পান খাওয়া! এতদ্বারা কৃত্তিবাসের পয়সা ও তাহার অঙ্কের সংখ্যার প্রতিও দৃষ্টি করা উচিত। তাহার যুদ্ধের সাজোদম হইতেছে, বিশ লক্ষ ঢাক, দশ লক্ষ কাঁসর, ত্রিশ লক্ষ সানাই ইত্যাদি বরাদ্দ ত আছেই। আমাদের দেশে ডুলিবাহক সকলের

অপেক্ষা আমির আদরটা বড়ই কম, প্রায় একটা যা মোর দুইটা হইলেই হয়। কিন্তু এখানে কবিরই জয়, তাহা একবার দেখ ;—

"আটি কয় মোর বাপে নয় মোর বাপি
দগড়ে বাড়ি দিছে তিন কড় কাঁপি ॥"

আর পগড়ে বয়ং কাহন ই, এই পর্য্যন্তই থাকুক। এই ত ব্যাপার, কিন্তু তথাপি কৃত্তিবাসের প্রতি অক্ষয় কবিকঙ্কণ এবং সমস্ত কবিতার রস গড়াইয়া পড়িতেছে। বস্তুতঃ কৃত্তিবাসের আদর রচনা পড়িয়া যে অপার আমোদ ও আনন্দ পাওয়া যায় ও তাহাতে মানব যে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালায় আর কোন কাব্য পড়িয়া হয় না। বাঙ্গালার আদিলেখক এবং কবিগুরুর পক্ষে তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। কৃত্তিবাসের দোষ সমালোচনা আমার এখানে উদ্দেশ্য নহে, তবে প্রসঙ্গক্রমে যা দুই একটী কথা বলা গেল এই মাত্র। তাহাই আপাততঃ যথেষ্ট হউক।

উপরেই বলিয়াছি যে, কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে এখন, এই দুরতর সময়ে কোন বিশেষ ঘটনাই উদ্ধার হইবার উপায় নাই। যাহা সর্ব্বগ্রাসকারী অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। অতএব আমার বাসস্থান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

নবদ্বীপ হইতে ঠিক দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে মুরারিহ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন এবং সেই হইতে ইহাঁরা ফুলিয়া গ্রামে বাস। নবদ্বীপ যেখানে ভাগীরথী মহকুমার বর্ত্তমান প্রধান লেখকের বাসস্থান হইতে চারিক্রোশ দূরে এবং কাঁচরাপাড়া হইতে এককোশ দক্ষিণপশ্চিমকোণে ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। কৃত্তিবাসের সময়ে এবং তাঁহারও অনেক দিন পর পর্য্যন্ত, ফুলিয়া গ্রামের নীচে দিয়া ভাগীরথী স্রোত প্রবাহিত ছিল, এখনও সুস্পষ্টরূপ গঙ্গার প্রাচীনগর্ভ বা খাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমানে গঙ্গা ফুলিয়ার দুই ক্রোশ পশ্চিমে বয়ড়া গ্রামের নীচে প্রবাহিত। এই বয়ড়ায় একটী ভাগবত ঘাট, তাহা পূর্ব্বে ফুলিয়ার সীমানায় ছিল। কিন্তু তথায় তরঙ্গের প্রতি স্থানীয় লোকের অসহ্যবহার হেতু, তাহা উঠিয়া বয়ড়াগ্রামে আসিয়াছে

---

(১৫) এই মুখোপাধ্যায় পদ যদিও ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি "উপাধ্যায়" শব্দযুক্ত পদবী, বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের পদবী ছিল না; তখনকার পদবী মুখটী, কন্যাসী, ভট্ট ইত্যাদি। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে গঙ্গানন্দ মুখো, ঘোষেশ্বর মুখো এবং এই প্রবন্ধ লেখকের পূর্ব্ব পুরুষ রামাই (রমাই) ওঝা প্রভৃতি সাহিত্যের বিশেষ খ্যাতি হেতু, আপন আপন উপাধিতে "উপাধ্যায়" যোগ করিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হয়েন। ক্রমে উহা বংশ পরম্পরা চলিয়া পুরুষানুক্রমে বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের উপাধ্যায় ছিলাবে বলিতে গেলে, কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম।

এবং কৃত্তিবাস যে সুপণ্ডিত, তাহার চিহ্নস্বরূপ ফুলিয়ার নাম যোগ করিয়া, ডাকনামটির এখন নামকরণ হইয়াছে "ফুলিয়া বনেড়া" ডাকঘর।

যে ফুলিয়া অতি প্রাচীনপ্রধান স্থান এবং যেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতি বসতি করিতে পাইত না, যেখানে এত বলভাবে, যে কালে গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং সে গ্রামের নামে, কুলীনদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যেন দুইটীর মধ্যে একজনের নামকরণ হইয়াছিল "ফুলিয়া মেল"; সেই ফুলিয়া এখন কালের কুটিল গতিতে জনশূন্য ও জঙ্গলময় হইয়াছে। যেমন তেমন জঙ্গল নহে, তথায় ব্যাঘ্রাদি বন্যপশু সকল নির্ব্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দমনে বসবাস করিয়া থাকে। দিবাভাগেও তথায় একাকী কেহ যাইতে সাহস করে কি না সন্দেহ।

লোকের মুখে আর তথায় এখন কোথাও দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের মধ্যে একটী সুখের কথা এই শুনা, যে স্থানে কৃত্তিবাসের বাসগৃহ ছিল; পরিতাপের বিষয় এখনও কাহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও লোকে সেই জঙ্গল পরিপূর্ণ ভূখণ্ডকে কৃত্তিবাসের ভিটা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অবশ্য সাধারণ নহে। এ ভিটা এমন যত্নের যে, এখন লোকের কোন গাছ গাছড়ার দরকার হইলে, যদি কোথাও খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তবে সেই অনুসন্ধান স্থান কৃত্তিবাসের ভিটা,—কোথাও না পাইয়া থাকে, কৃত্তিবাসের ভিটায় খোঁজ করিয়া দেখ, অবশ্য পাইবে। ফলতঃ কৃত্তিবাসের পুণ্য প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, যে সকল গাছ গাছড়া গ্রাম্যলোকের প্রায়ঔষধে সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহা প্রায় সমস্তই কৃত্তিবাসের ভিটায় খুঁজিলে পাওয়া যায়।

ভক্তশিরোমণি নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী হরিদাস ঠাকুরও বহুদিন ফুলিয়া গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে কৃত্তিবাস ঠাকুরের ভিটা, সর্ব্বসাধারণে তাহারই সংলগ্ন এক ভূমি খণ্ডকে হরিদাসের পাট বা সাধনস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হরিভক্ত হরিদাস বোধ হয়, যেন সেই অসাধারণ ব্যক্তি রামচরিতপ্রণেতাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়াই তাহার বসতস্থানের নিকটবর্ত্তী নির্জ্জনে পরম পুণ্যপ্রদ ভাবিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক তথায় আপনার আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। যেমন কৃত্তিবাস, তেমনি হরিদাস; সুতরাং উভয়ের বাসস্থানের একত্র সন্নিবেশ অতি উপযুক্তই হইয়াছে বলিতে হইবে। দুজনেই মহান মিলিয়া থাকে, একথার সম্পূর্ণ সার্থকতা যে এইখানে, তাহা বলাই বাহুল্য।

যখন একবার কৃত্তিবাসের ভিটায় একটী ঔষধালয় স্থাপনের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য কতকটা টাকাও সংগৃহীত হয় এবং আদায় হইয়াছিল। তাহার পর জানিনা, কেমন করিয়া তাহা আস্তে আস্তে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। যাহা হউক, নির্ব্বাণ হওয়াতে আমি দুঃখিত নহি, বরং অনেক সুখী, যেহেতু তাহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্র রক্ষিত হইয়াছে। আন্দোলন সময়ে, আমার বড়ই আশঙ্কা হইয়াছিল যে,

পাছে এইবার বুঝি গুণের গুরু প্রতিষ্ঠায়, আমাদের চিরপ্রচলিত জাতীয় চরিত্রে কলঙ্কচিহ্ন লাগিয়া যায়। তা হইবে কেন?

কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গবাসীতে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করিয়া যে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধ তাহারই পত্রসারণ মাত্র। ইতি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

## পরিশিষ্ট।

এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হওয়ার কিছুকাল পর, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক একখানি পুস্তক আমার হাতে পৌঁছে। তাহাতে ১৪২৩ শকের হাতের লেখা রামায়ণ পুঁথি হইতে কৃত্তিবাসের নিজ দত্ত আত্মবিবরণ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন মনে হইতেছে, ইহা বুঝি সেই নাপেন পা ও ডুমুরের স্বত্ব স্বরূপ শ্রীযুক্ত হারাধনদত্ত ভক্তিনিধির প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি, যাহার অস্তিত্ব আছে, অথচ লোকের চক্ষুর্গোচর নাই। যাহা হউক, পরিচয়টীর উৎপত্তি যেমন করিয়াই হউক ও যেখান হইতেই তাহা উদ্ধৃত করা হউক, উহা পড়িলে কিন্তু যেন খাঁটি বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে। উহার মধ্যে অনেক কথা আছে, যাহা এই প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহ মিলে এবং তদুক্ত সময়টীও, এই প্রবন্ধ নিরূপিত সময়ের যে কতদূর এদিক্‌ওদিক্ ঘটে হয়। এই সকল কারণে, পরিচয়টী এখানে উদ্ধৃত করার বিশেষ আবশ্যকতা দেখিতে পাই।

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজ।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।
দেশ যে পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের অধিকার।
সেভাগে জন্ম ভিন্ন বংশের সংসার॥
বঙ্গদেশে আমার হৈল সবংশে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

---

(১) ইনি সেই জনৈক্য-পাল, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রপৌত্র। এদিকে বসিয়ে মুখটী ওঝা, লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক সৃষ্টিত কুলীন পারিষদ বর্গীয় প্রপৌত্র। সুতরাং দনোজমাধব ও বসিষ্ঠ মুখটী, এ উভয়েই সমসাময়িক হইতেছে।

(২) বর্দ্ধমানাধিপ।

মুখেতোর ইচ্ছা হয়ে গাও মুখে।
বসতি করিতে হয় ভূমি ভূলে ভূলে॥
গঙ্গাতীরে গিয়া ইয়া চতুর্দ্দিগে চায়।
রাত্রিকাল ছিল তবে ভাবিল উপায়॥
গোহাইতে আছে যবন একে রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিগে চায়।
হেনকালে জাকাতনদী শুনিবারে পায়॥
মালি জাতি ছিল পূর্ব্বে সেথা এ খানে।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার কারণে॥
গ্রামবর ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে গঙ্গিতে বহে পূর্ব্বে তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চলিয়া হয় পশ্চিমের মত।
ধন ধান্যে পুত্রে পৌত্রে আছয়ে সতত॥
গর্ভেশ্বর নাম পুত্র ছিল গুণবান।
মুরারি হুর্য্য সোদর তাঁহার সমান॥
জ্ঞানেতে কুবেরে ছিল মুরারি ভূপতি।
সাতপুত্র তাঁর তার সংসারে বিদিত॥ ৩

৩। মুরারি বসুর গ্রাম মালিপোতা, এক্ষণে এই গ্রামের কুল বিভিন্ন নাম। প্রাচীন, অধিক সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক কথাগুলো বলে, এই মালিপোতা অর্থাৎ মালির ভিটা অর্থাৎ গ্রামের কোন সম্বন্ধ আছে কি না।

৪। পশ্চিম পশ্চিম এখনও গঙ্গার সমান্তরাল খাদের চিহ্ন আছে। আজ সমস্ত এই খাদ শুকনা থাকে। বর্ষায় যে সময় বেশী জল যায়, সে সময় পানী চালিত হইল, এই খাদে প্রবেশ করিলে, যে কোনও স্থানে অনায়াসে বাহির করা হইয়া থাকে।

৫। তুলনা নৃসিংহদেবের শ্লোক—

"——— তৎস্তম্ভমন্তাভিহতং স্বমুষ্টিভিঃ।
মুবাদিশন্তং পরিহস্য সুর্য্যদমা ইতি।"

প্রবাসে মিল হইল। প্রবোধানন্দ। সরোবর

৬। তুলনা শ্রীমদ্ভাগবতে মুরারিঃ।—

"——— ——আষ্টা তত্র সনবঃ,
ভৈরবঃ সৌরকলোকং নিপতে যন্ন কিঞ্চনঃ।
মার্কণ্ডেয়ো দিবাসঙ্ক্ষ্য ব্যাপ্তি মহোরগঃ॥" প্রবোধ। সরোবর।

৭। গোত্র মিলিল না। ভাস্করের মতে ৮ পুত্রের নাম কৈলাস, সৌর, নন্দন, আনন্দ, বনমাল, মার্কণ্ডেয়,

জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তাঁর নাম যে ভৈরব।
রাজারি পণ্ডিত তাঁর অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে খ্যাতি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত রহে যে মানী॥
গুণবন্তিত বলা সুন্দর যুবতি।
মার্কণ্ড রায় এমশাঙ্কে ধারণী।
গুণীল ভগবান তথি বনমালী।
তাহার বিভা হৈল ওঝা কুলেতে মাধুরী॥
ফুলে ঘীলে ঠাকুরালে গোঁসাই প্রসঙ্গে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়বে সম্পদে॥
মহাভয় পতিব্রতার ধর্ম্ম রাখিতে যোগিনী।
দুই সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সমান সতত কুটিবাস।
তাই মৃত্যুঞ্জয় ভরে বড় উপবাস।
সহোদর পতি নাহি মর্ম্মদোসর দুখি।
শ্রীকর তাই তাহে নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্থ। নাহেত তাহার।
আর এক বহিন হৈল সভার উপর॥
নারিনী, নামেতে খ্যাতা রূপে বনমালী।
হেন ভাই উপবিদায় সংসারে খাওয়ালী॥
আপনার ভাগ্য কথা লিখিব যে আছে।
পুথটী বংশের কথা আরও লিখিতে আছে॥
সুধাপতি কর পুত্র হৈল নাম বিদ্যাধর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত নামের সোসর॥
সূর্য্যপুরে নিবাসতি হয় ঠাকুরাল।
সভে সম্মানক লোক বাসেতে রহায়॥

---

ভণিতায় ও আছে। কিন্তু উপরের পদ্য অনুসারে সাতপুরুষ নাম ভৈরব, মুরারি, মার্কণ্ডেয়, ভগবান, সুশীল, ও বনমালী। আমরা মনে করি, বংশ কবি ভাবভট্ট ও অনিরুদ্ধরূপে ত্রিপুরাধিকারী প্রসিদ্ধ সুশীলবংশে।

(৭) পৃষ্ঠাঙ্কে মিথিলা ও, প্রবন্ধভাগে দেখান হইয়াছে যে ভবিষ্যদের নাম বনমালীর ৭ পুত্র ও ৭ কন্যা।

(৮) ঠাকুরদের পুরোপের পরিচয় কি মহাদেব কি কুলপঞ্জিকা কোথাও পাইলাম না।

রাজা গৌড়েশ্বর দিব্য সোনারী এক সোঁতা।
শান্তমিত্র সভাতে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ ওঝা আদিত্য ঠাকুর বঙ্গজ।
বিষ্ণুপদি কুল ওঝা তাঁহার তনয়॥
ভৈরবভক্ত গঙ্গাপাত্র বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাহার॥
মুখটী বংশের যশ শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জন নিয়ে যাঁহার আচার।
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মতেজ ওঝা।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্যবারে শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলেন কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িল ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আপনি লইল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে বিদ্যারম্ভের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
আগায় নিবড়ে যখন বয়সে হৈবেক।
হেনকালে পড়িতে যেমন উচিত দেখ॥
মুহূর্ত্ত তিথির শুদ্ধি যে হোক শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত পাঠায় বড়য়া-সভায়॥
তথায় কবিবাস আসি বিদ্যার বিচার।
সর্ব্বা যথা নাই তথা বিদ্যার বিচার॥
অবশ্যতা আছিল, আমার পরিবারে।
নানা ছন্দে নানা গাঁথা আপনা হইতে স্ফুরে॥

---

৯। গোবিন্দের পুত্রাদির পরিচয়ও পাইয়াছি।

১০। গঙ্গাতীরপতিত্ব [illegible]। ভৈরবভক্তিজন্য [illegible] গঙ্গাদাস, মহাশয়, এখানে মিলিত।

১১। বার বৎসরের ছেলে বড়গঙ্গা তথায় পুঁথি লইয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পাওয়ায় বিস্ময় লাগে কালে, কিন্তু বেশ আশ্চর্য্য বোধ হয়। যখন কাহার কোন আর্ষ্ম চক্ষুও উহাদেশে পাইয়া থাকিবে সেই সূত্রে কৃত্তিবাসেরও তথায় গমন ঘটিয়া থাকিবে। তখনও কি সংস্কৃত পড়িবার রীতি একেবারে হয় নাই? বোধ হয় না হইবারই কথা, নতুবা হুকুম করিয়া তখনকার দিনে সেই দূরের উড়িয়াদেশে অনুবাদ করাইতে যাইবে কেন

বিদ্যা লাভ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি তাপন।
হেন গুরু ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উপাধ্যায়।
হেন গুরু ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
অকস্থানে মেলানি পইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিয়া মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥[১২]
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেওয়ানে পাড়ে হাঁক।
শীঘ্র গতি আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি॥

---

১২। এ কোন্ হিন্দু গৌড়েশ্বর? মুসলমান অধিকৃত হওয়ার পর একজন মাত্র হিন্দু গৌড়ের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তিনি রাজা গণেশ। তাঁহার প্রকৃত নাম কংসনারায়ণ। "কংস" মুসলমান ও ইংরেজ ঐতিহাসিকের হাতে পড়িয়া, "কানিন" শাম্সি" ও অবশেষে "গণেশে" পরিণত হইয়াছে। ইহার রাজত্বকাল ১৩৮৫ হইতে ১৪০২ খৃঃ পর্য্যন্ত। এখানে মুটিয়ারীর অনুমানিক জন্মকাল ১৩৩৫ খৃঃ ধরা হইয়াছে। সুতরাং এখন তিনি যদি সত্য সত্যই বঙ্গেশ্বরের আদেশ আনিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বয়স তখন ৫০ বৎসর বা তাহারই একটু এদিক্ ওদিক্ হইবে। উদ্ধৃত শ্লোক হইতে বোঝা যাইতেছে যে, মুটিয়ারী পাঠ সাঙ্গ করিয়া আগে 'অকস্থানে' আসেন ও তাহার পরে গৌড়েশ্বরের সহিত দেখা করেন। সুতরাং আগে কংস সিংহ গৌড়ে হিন্দুরাজার মত পইলে তবে গৌড়ে হন। কিন্তু ইতিহাসে মুসলমান ক্ষমতাপ্রবাহের পক্ষে, কংসনারায়ণের অতি বিপন্ন অবস্থার রাজত্বের খবর নিয়ে, সে কালের ছাড়া সেই অরাজকতাপূর্ণ সময়ে, মুটুর মাধিবারী পল্লী যুলিয়া পাঠক যথাসময়ে পৌঁছিয়াছিল? কে জানে,—কেমন যেন বিশ্বাস হয় না। তাহার পর গৌড়েশ্বরের পাত্রসভা হইতে দেখা যায় যে, ইনি হইতেছেন মুসলমান যেন একেবারে নির্ব্বাসিত। কিন্তু বস্তুতঃ তখনও মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী যে, কংসনারায়ণের মৃত্যুর পরেই, তাঁহার পুত্র আর হিন্দুয়ানী বাঁচিতে না পারিয়া আবিলম্বে মুসলমান হইয়াছিলেন। এদিকে আর এক কথা, সেন রাজবংশ গৌড়চ্যুত হইলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলিয়া ঘোষিত করিতেন। এমন কি, তাঁহারা বাঙ্গলা ছাড়িয়া আসিয়া পরেও, আপনাদিগকে গৌড়েশ্বর বলাইতে ত্রুটী করিতেন না; যেহেতু গৌড় অর্থে তখন কেবল গৌড় নয়, বাঙ্গালা দেশও গৌড় আখ্যায় আখ্যাত ছিল। কৃত্তিবাসের এ রাজাটী কংসনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের গৌড়েশ্বর নহেন কি? আমার বোধ হয় সেই তাই। যে পুঁথি হইতে গণেশ উঠাইয়াছেন, তাঁহারা এইকার বিশ্ব বলেন যে, এ গৌড়েশ্বর কংসনারায়ণ। হয়, তাহাই হইলেও, আমার বর্ত্তমান নিবন্ধ কৃত্তিবাসের সময়ের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইতেছে না।

তার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্বরায় বসে আগে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে ঈশ্বরী।
সুন্দর শ্রীবংস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ, রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্য গীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াপাই রাজার আভাসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাজা মাদুরি।
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে শরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥

পঞ্চ গৌড় শ্রেষ্ঠ এ আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে ফুরে।
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ দিয়ে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজ যা হয় বিধান॥
পঞ্চ গৌড় চাহিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়ের পূজা হৈলে ওড়ের হয় পূজা।
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কাহো কিছু নাহি নাই করি পরিহার।
যথা তথা ওড়ার দেশে আছে সার॥
যত যত নর পালিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সশ্লোক।
আমারে ছুঁইতে নারিবা অপযোক॥
এতেক পাইয়া বাহির হইলাম সত্বরে।
যাপুর্ব্ব স্থানে যায় লোক আমা দেখিবারে॥
চলনে তুরিত গতি লোক আনন্দিত।
পথে পথে যত গণ্য মানিয়া পণ্ডিত॥
ভূমে মাথা নোয়াইয়া বাণীরে বন্দনা।
সভিতের গণ্য জানিবা তুমি॥
সবে মাত্রে আশীর্ব্বাদে শুদ্ধ সাস্ত্বা দান।
রাজপ্রিয় বড় গীত অতি [illegible]
নীত কথা বর্ণা [illegible] দেবের হরিষে।
শ্লোক বুঝিবারে শুদ্ধ কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশে কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস কহে সিদ্ধ বরদাতী বরে।

যাহা হউক, এ পত্রের অনেক কথাই যখন ফুলাচার্য্যের গ্রন্থের সহিত মিলিতেছে তখন উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তীতে কৃত্তিবাসের নিজ-দত্ত পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করার পক্ষে বড় একটা প্রতিবন্ধকতা দেখা যাইতেছে না। তবে বংশাবলী সম্বন্ধে যে দুই চারি কথার অমিল হইল, তাহা একেবারেও মীমাংসিত হইতে পারে। একালের ন্যায় সেকালেও কুলীন-ঠাকুর-দের দূর দূর স্থানে অনেক বিবাহ হইত এবং এমনকার এক মায়ের সন্তান অন্য মায়ের সন্তানদের খোঁজ না রাখার ন্যায় তখনও সম্ভবতঃ সকলে সকলের খোঁজ রাখিত না। এক বাপের বিভিন্ন স্ত্রীর সন্তান পরস্পর খোঁজ না রাখিলেও, ঘটক ঠাকুরদের কাছে কিন্তু কোনটাই এড়াইয়া যাইতে পারিত না; যেহেতু তাহাদের ব্যবসায়ই ছিল তাহার সন্ধান রাখা। সুতরাং বংশাবলী সম্বন্ধে কৃত্তিবাসের সহিত ফুলাচার্য্যের দুই চারি কথা অমিল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব পঙ্‌ক্তীটী যেখানেই পাওয়া যাউক ও যেখান হইতেই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' গ্রন্থকার উহার উল্লেখ করুন, উহাকে খাঁটি জিনিষ বলিয়াই যেন আমার বিশ্বাস হইতেছে।

পঙ্‌ক্তীর মধ্যে কৃত্তিবাসের জীবনী সম্বন্ধে যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পাঠকেরা পড়িয়া পাঠ করিয়াই জানিতে পারিবেন, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমার আর বেশী কিছু বলিতে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

কৃত্তিবাস তবে সত্যসত্যই রাজা ও রাজসভায় গিয়াছিলেন। গিয়াছেন তাহা অধিক, বিশেষতঃ কৃত্তিবাসের এ রাজাও মাঘ মাসের শীত নিবারণের জন্য রৌদ্রে পৌষা হইয়া থাকেন। অতএব এখনও বলি যে এ সকল সত্ত্বেও, গোঁয়ের কবির গোঁয়ে বুদ্ধি ও মাতৃভাষা ব্যতিরেকে হওয়ার কারণ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

# কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "প্রত্নতত্ত্ব" পত্রিকায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর গবেষণা, প্রচুর অনুসন্ধান ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। বিশেষতঃ কবিবরের জন্মস্থান, বংশ ও যে মহাত্মদিগের নাম উল্লেখ করিবার জন্য আমরা প্রয়াসী হইয়াছি, সেই কুলিয়ার সম্বন্ধে যিনি এতাদৃশ গবেষণা ও পরিশ্রম সহকারে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের উপকার করিয়াছেন, তিনি যে সাহিত্য পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিনি কৃত্তিবাস পণ্ডিত সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সকলই যে অভ্রান্ত সত্য ও সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে, এরূপ মনে করা যায় না। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, নিক্ষোভ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, দোষশূন্য কাহাকেও বলা যায় না। এই কারণে আমরা পরিষৎপত্রিকার যে সকল প্রবন্ধের বিষয়ীভূত মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি, তাহা কখনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্যপদ্ধতিকে তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ করা এবং বোধহয় পরিষৎও তাহা সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহাই ভক্তজনের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। তাহাতে বিষয়ের বর্ত্তমান পরিস্থিতি হইল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, এবং যে সকল লেখক যে কারণে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা পরিষৎপত্রিকা দ্বারা কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহার অধিকাংশই একত্রিত করিয়া এখানে উপস্থিত করিয়াছি। যে যে বিষয় তিনি উল্লেখ করেন নাই অথচ যেগুলি আমরা উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিয়াছি, সেই সেই বিষয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রথমে আদিত্য ও বেদগর্ভ নামক দুই ব্যক্তির যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা কৃত্তিবাস প্রবন্ধের প্রকৃত বিষয়ীভূত না হইলেও ঐতিহাসিকতা ও বিশেষ প্রীতিকর বলিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছি—

আদিত্যের পরিচয় সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা প্রচলিত হইয়াছিল। একথা লইয়া বোধহয় ইতিপূর্ব্বে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি। কুলিয়ার পূর্ব্বপুরুষগণ আদিত্য সম্বন্ধে একটী বিশেষ ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি কখনই কুলিয়া বিদ্যাধরপুরের অধিবাসী ছিলেন না। তাঁহার ইতিহাস ঐরূপ সংশোধন করা হইয়াছে। তবে আদিত্যের ব্রাহ্মণত্বসম্বন্ধে একটা কথা, কিন্তু সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন, আমরাও সেজন্য আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম, তাহা এখানে উল্লেখ করিয়া দিলাম। তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশে সন্নিবেশিত করিলাম।

যখাবাপর বিদেশ ঐমনিভাবে তাহাই প্রকৃত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে ১৫৩ সনে গৌড়ে এসেছিলেন। আদিশূরের বংশ গৌড়দেশে রাজত্ব করেন, তৎপরে পালবংশ, তৎপরে সেনবংশের অভ্যুদয়। এই দেবতাপীয় ভূতপূর্ব রাজা লক্ষ্মণসেনকে লইয়াই কথা।

লক্ষ্মণসেনের বিষয়,—মহারাজ বল্লালসেন ১১৬৮ খৃ. অব্দ হইতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭ বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার এক সময় ইহাই প্রকৃত বলিয়া জানিতাম। একণে অবশ্য হইয়া, তাহা লিখিয়াছি। এরূপ স্থির করিবার কারণ এই—

লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস সুক্তিকর্ণামৃত নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেন যে ১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলিত হয়; তাহার সেই সময়ে লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছেন, তখন এখনই মনে হয়, লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত বা মৃত হইয়াছিলেন। শ্রীধরদাসের সেই শ্লোকটি এই—

"শাকে নন্দ্রিদিগন্তরাদিবসকৃৎসংখ্যাতে সম্বৎসরে
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূমিপতিনা সাকেতপুর্য্যাং পুরে।
শ্রীধরদাস পণ্ডিতেন কবিনা সংকর্ণিতা সূক্তয়ঃ
সদ্যঃ কর্ণরসায়নং রচয়তা পঞ্চামৃতং নির্ম্মিতম্॥"

এখানে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সুক্তিকর্ণামৃতের বয়স পাঠাইয়া দেন, আমি এই—

"শাকে সপ্তবিধান্ধবারিধি [তা]ম্রকরাঙ্কে [ও] বৎসরে।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূমিপতিনা সাকেতপুর্য্যাং পুরে॥" [১]

আমার 'সনরায়ণ' প্রবন্ধে অনু বেদচন্দ্র দিয়া এই বচনটি শ্রীযুক্ত উমাকান্ত লিখিয়াছেন—

"শাকে সপ্তবিধান্ধবারিধি-তাম্রকরাঙ্কে বৎসরে।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূমিপতিনা কি রসরসে সাকেতে॥" [২]

যেমন, উপরে এই শ্লোকের তিনটী পাঠ উদ্ধৃত করিলাম। ইহাদের মধ্যে কোন্ পাঠ সঙ্গত প্রভৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? আমাদের বিবেচনায় প্রথম পাঠ। দ্বিতীয় অপর চরণ কোনটাই ঠিক নহে। উক্ত বচনটী ঐতিহাসিক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ১২০৫ শকে অর্থাৎ ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে সুক্তিকর্ণামৃত রচিত হয়। 'শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনাভিধেয়' বলিয়াছে বলিয়া এই টুকু বলা যায় না যে, তখন লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব ছিল। [৩]

---

(১) Dr. Rajendra Lala's Notices of Sanskrit MSS. Vol III. p. 24

(২) বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ ৫৩২ পৃঃ।

(৩) সেনরাজ। ৩৭ পৃঃ।

তারা কবি 'লসং' নামক কোন অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, এইমাত্র বোধ হয়। লসং লক্ষ্মণ-সেনের জন্মাব্দে অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি।(৪) এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অব্দেই লসং আরম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে ৮৬ লসং হয়। কিন্তু আমরা উক্ত বচনের কোনটী হইতে ৮৬ সংখ্যা পাইতেছি না। সংস্কৃতবিৎ ওপ্পের্ট-সাহেব জর্ম্মণ প্রাচ্যসভার পত্রিকায়(৫) শুক্তিকর্ণামৃত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও ঐ শ্লোকটী একবারেই উদ্ধৃত করেন নাই। বোধ হয় তাঁহার সংগৃহীত পুথিতে ঐ শ্লোকটী ছিল না। ইত্যাদি নানা কারণে ঐ শ্লোকটীর উপর আমাদের আস্থা নাই।

বিশেষতঃ মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের(৬) সমসাময়িক বিবরণের লেখায় স্পষ্ট জানা যায়, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ছাড়িয়া 'সকনাতে'(৭) পলায়ন করেন। এরূপস্থলে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহার ৬ বর্ষ পূর্ব্বে তিনি গৌড়রাজ্য হারাইয়াছেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরগণ অনেক দিন বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবদ্বীপ হারাইবার পর লক্ষ্মণসেন আর কোথাও যে রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, এপর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের গ্রন্থ পাঠে স্পষ্ট জানা যায়, যখন যবনেরা গৌড় আক্রমণ করে, তখন লক্ষ্মণসেনের পুত্র রাজা কেশব যবনের ভয়ে গৌড় ছাড়িয়া পলায়ন করেন। আবার কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র লিখিয়াছেন, রাজা কেশব স্বজন ও কুলীন ব্রাহ্মণগণ সহ (বঙ্গে) এক রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই রাজা তাঁহার ও ব্রাহ্মণগণের জীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং কেশবের নিকট আপন পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত কুলবিধি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে কেশবের সহচর কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র তাঁহার নিকট কুলবিধি কীর্ত্তন করেন। এই রাজার নাম কি, তাহা আমরা অদ্যাপি এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি নাই; এড়ুমিশ্রের সম্পূর্ণ কারিকা বাহির হইলে বোধ হয়, তাঁহার নাম পাওয়া যাইতে পারে। তবে আমরা যেটুকু পাইয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিয়াছি ঐ রাজাও সেন-বংশীয় কুলবিধাতা মহারাজ বল্লালসেনের এক পৌত্র।

---

(৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXV, pt. I. p. 27.

(৫) Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

(৬) বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ কেবল 'বখ্‌তিয়ার' নাম করিয়া থাকেন, কিন্তু এটা মহাভুল। বখ্‌তিয়ার, কেবলমাত্র এদেশে আগমন করেন নাই। যিনি নবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তিনি বখ্‌তিয়ারের পুত্র মহম্মদ, এই জন্য তাহার নাম পারসী ভাষায় 'মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার'।

(৭) 'সকনাত' নাম লইয়া গোল। অনেকের মতে সকনাত নগরই 'লক্ষ্মণাবতী' নামের কারণ। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় 'সকনা' 'লক্ষ্মণ' বা সংস্কৃত 'লক্ষ্মণ' শব্দের অপভ্রংশ বা অপর, নামিয়া বোধ হয়।

এদিকে আবার হিমালয়ের যোগেশ্বর মন্দির হইতে আবিষ্কৃত খোদিতলিপি দ্বারা জানা যাইতেছে—যে ভট্টনারায়ণবংশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত লক্ষ্মণসেনের মূল মাধবসেন কেদার-নাথে গিয়াছিলেন। মিনহাজের তবকাৎ-ই-নাসিরি পাঠে জানা যায়, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই রাজা লক্ষ্মণের অমাত্য, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। আমাদের বোধ হয়, সেই সময় মাধবসেনও তীর্থযাত্রাচ্ছলে কেদারনাথে পলায়ন করেন। অনেক ঐতিহাসিকই লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন এবং মাধবসেনের পর তাঁহার ভ্রাতা কেশবসেন রাজত্ব করেন। সেকুবর্ষের উপর নির্ভর করিয়া, আমরা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রমাণ করিয়াছি, লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন ও কেশবসেন রাজা হন নাই। হরিমিশ্র ও এতদ্ভিন্নের কারিকা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের জীবদ্দশাতেই কেশব গৌড়ে "রাজা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং যখন তিনি বিক্রমপুরে পলাইয়া যান, তখন তথায় বল্লালের আর এক পৌত্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার নাম কি? বিশ্বরূপ। আজ পাঁচ বৎসর হইল, আমরা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন পাইয়াছি। এই তাম্রশাসনে "গৌড়েশ্বরলাঞ্ছনপ্রলয়কালরুদ্রোঽয়ং নৃপঃ" বলিয়া বিশ্বরূপকে সম্বোধন করা হইয়াছে। যখন বাবা কেশব বিক্রমপুরে পলাইয়া যান, তখন যে যবনেরা তাঁহার অনুসরণ করেন নাই, তাই বা কে বলিবে? বোধ হয়, লক্ষ্মণপুত্র বিশ্বরূপসেন যবনের নাহিব যোগেশ্বর মুনি কারিয়া কেশবকে উদ্ধার করেন, এই জন্যই তিনি 'যবনকুলের কালরুদ্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বিশ্বরূপের পর ঠিক কে রাজা হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। আইন্-ই-আকবরীতে দনৌজা (দনৌজারি) পূর্ব্বে সদাসেন নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত বিশ্বরূপ বা সদাসেন সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয় নাই। সকল প্রাচীন কুলাচার্য্যই সগৌরবে দনৌজামাধবের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দনৌজা মাধবের সভায় কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহ বা নরসিংহ ওঝা সম্মানিত হন। দনৌজামাধব সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিত কুলীনদিগকে আহ্বান করিয়া এক সমীকরণ করেন। তৎপরে সম্রাট্ ঘুলবনের অভিযান ও তুঘ্রিলখাঁর বিদ্রোহ ঘটে। এই অশান্তির সময়েই নরসিংহ ওঝা দেশত্যাগ করিয়া ফুলিয়ায় আগমন করেন। দনৌজামাধবও বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া চন্দ্রদ্বীপে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন।

আজ পাঁচ বৎসর হইল, আমরা সর্ব্বপ্রথম বিশ্বকোষে কুলীন শব্দে সাহিত্য সমাজের সুগোচরার্থ কৃত্তিবাস ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের যে বংশাবলী* প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে

---

(৮) এসিয়াটিক সোসাইটী পত্রিকায় ঐ বিষয় প্রমাণ সুলিপি দিয়াছি।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXV. pt. I. p 65.

* এখন এই বংশাবলী প্রকাশ না হওয়ার পূর্ব্বে বোধ হয় আমাদেরই জানিতেন না যে, কৃত্তিবাস নরসিংহ ওঝার পুত্র। তাই আমরা বলি, বিশ্বকোষে ইহা প্রকাশিত হইবার পরেই কৃত্তিবাস পণ্ডিত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া পণ্ড-

থাকিত ও তাঁহার সঙ্গেপরি এখন প্রায় সকল ব্রাহ্মণ কুলীনগণ যে যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তাহা লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রতাপ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াও বঙ্গীয় কুলীন সমাজে চন্দ্রদ্বীপের সেনরাজগণ 'গৌড়াধিপ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১০] হরিবংশবংশীয় মুরারি ওঝার পৌত্র আমাদের কবি-কৃত্তিবাসও সম্ভবতঃ ঐরূপ নাম মাত্র 'গৌড়েশ্বর' উপাধিধারী কোন চন্দ্রদ্বীপরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; এ সম্বন্ধে প্রফুল্ল বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গীন বলিয়া বোধ হয়। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাস গৌড়াধিপ কংসনারায়ণের সভায় গিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা কংসনারায়ণের রাজধানী কাঁহার সময়ে গৌড়ে যবনপদভূমি, গৌড়ের রাজসভায় সেকালে সর্ব্ববিষয়ের আড়ম্বরপ্রিয়তা ও আদবকায়দা তৎকালীন দেশীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস-পাঠে আমরা জানিতে পারি, কৃত্তিবাসের বর্ণনায় তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তখনকার সেই দেশ-সম্ভাবের গুণেই আমরা অল্পদিন পরেই কংসনারায়ণের পুত্রকে ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখি। কিন্তু সেই চিত্র ও ফুটলাইটেও কৃত্তিবাসের কোথাও দেখিতে পাই নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বর্ণনীয় গৌড়েশ্বর মণিমাণিক্যখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন না, তাঁহার গৌড়েশ্বরের—

"আখিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। তার উপর পড়িয়াছে মেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া পোতে মাথার উপর। নাম মাসে বসে পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর॥"

উক্ত বর্ণনাটী পাঠ করিয়া যিনি যতই উচ্চভাব মনে করুন, কিন্তু আমাদের যেন চন্দ্রদ্বীপের সেনবংশের অস্তিম অবস্থা স্মরণ করিয়া দেয়। পূর্ব্ববৎ সে আড়ম্বর নাই, অথচ সেই প্রাচীন নব্য দেউড়ী শোভা পাইতেছে। হিন্দু রাজা এখনও সেই পুরা ব্রাহ্মণ্যভাব বজায় রাখিয়াছেন। বড় বড় অমাত্যগণের উপাধিতে যবন সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, কিন্তু রীতিনীতি চাল চলন এখনও ম্লেচ্ছভাবাক্রান্ত হয় নাই। তখনকার

---

কলিকাতা পত্রিকায় এবং তৎপরে স্বদেশভূমিসম্পাদক জন্মভূমি পত্রিকায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাহারা যে সকল বিষয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অনুরোধেই বিজ্ঞাপনে ঐ সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। রোহুনী নিবাসী পরম মহাশয় কি কারণে দুঃখে ঐ সময় কিছু লিখিলেন না, তাহা দুঃখের বিষয় তিনি আমায় লিখিয়া জানান নাই। এখানে একটী বিশেষ কথা বলিয়া রাখি, ঐহর্ষের বংশাবলী সম্বন্ধে বিশেষে এইরূপ শুনা যায়—শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র ঐগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীমিশ্র, তৎপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র ঐহর্ষ ইত্যাদি। (বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৭৩১ পৃষ্ঠা।) কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রগণের কোন কুলাচার্য্য গ্রন্থে ভলিবাপুত্র মেধাতিথির নাম নাই। বিশ্বকোষে মুদ্রাঙ্কণের দোষে এ ভ্রমটী ঘটিয়া গিয়াছে। এই ভ্রমটী কর্ণগোচর হইয়াই সংশোধন করিব মনে করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জন্মভূমি সম্পাদক এবং এখন দেখিতেছি প্রফুল্লবাবুও আকবর ঐ ভ্রমটী গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আমরা সেই ভ্রমটী এইরূপে সংশোধন করিয়া লইলাম,—মেধাতিথি, তৎপুত্র শ্রীহর্ষ, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র শ্রীবিবাস, তৎপুত্র অনন্ত ইত্যাদি।

(১০) চন্দ্রদ্বীপরাজবংশাবলীর একখানি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি; পুথিখানির নাম 'গৌড়রাজবংশাবলী'।

চন্দ্রদ্বীপে স্বাধীন রাজত্ব ছিল, ততদিন আমরা এই ভাব দেখিয়াছি। এই সকল আলোচনা করিয়া যেন কামুর বাবুর অনুমানই কতকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

আর পাঁচ বৎসর হইল, আমরা লিখিয়াছি, "কুলপঞ্জিকা অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেবের প্রতিষ্ঠিত আদিত্যের অবতন ৮ম পুরুষে এবং গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষে কৃত্তিবাস আবির্ভূত হন। একণে স্থলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ন্যূনাধিক ২৫০ বর্ষ পরে এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গঙ্গানন্দের ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে কৃত্তিবাস ১৪১৫ হইতে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।" [১১]

তৎপরে দীনেশ বাবু স্থির করিয়াছেন—কৃত্তিবাসের কাব্যরচনার কাল ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। [১২]

এখন প্রফুল্ল বাবু প্রকাশ করিতেছেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৫৭ শকে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল।

এখন দেখিতে হইবে, তিনটী মতের মধ্যে কোনটীকে আমরা অধিক প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি?

প্রফুল্ল বাবুর মতে—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণেরা দেবীবর কর্ত্তৃক মেলবদ্ধ হন। কিন্তু আমরা তদ্বিরুদ্ধ প্রমাণ পাইয়াছি এবং বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে চৈতন্যদেবের বিদ্যমান কালেই মেলের সৃষ্টি হয়। এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে যে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বন্দ্যঘটীয় কুলীন জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। এই চৈতন্যমঙ্গলে পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থের নাম আছে। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায়—

"রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥"

প্রফুল্ল বাবু লিখিয়াছেন, কৃত্তিবাসের ভিটার পার্শ্বেই হরিদাস ঠাকুরের পাট। কবি জয়ানন্দ ফুলিয়ার সেই হরিদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। যখন চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে হরিদাস ঠাকুরকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিলেন, ভক্ত হরিদাস সেই সংবাদ পাইয়া যখন ফুলিয়া ছাড়িয়া চৈতন্যকে দেখিবার জন্য ছুটিলেন, সেই সময় উপলক্ষ করিয়া জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

"শুনিঞা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল। ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
হরিদাস শ্রিয় বড় সুগেন পণ্ডিত। মুরারি-হৃদয় নন্দ সংসারে বিদিত॥

---

(১১) সাহিত্য, ১৩৮ পৃষ্ঠা।

(১২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কৃত্তিবাস শব্দ ৯০ পৃষ্ঠা

জগন্নাথ মনোহর মুখ যে ভূলীন। তাহার নন্দন হুসেন পণ্ডিত প্রবীণ।
মুলিয়ার দেবতা শ্রীঅদ্বৈতদাস ঠাকুর। অহর্নিশি তারে মনে পেলা বহে দুর॥"
(৭০ পাত্র। ২য় পুঁথী)

রমাইদেবের উক্ত কবিতা হইতে আমরা দুইটি বিষয় জানিতে পারিতেছি—১ম, যে মুখাটি বংশে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন, সেই মুখাটির বংশে বনমালিপণ্ডিত (মনোহরের পুত্র) হুসেন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন; ২য়, পণ্ডিতবর হুসেন মুলিয়ার গৌরব ও ইতিহাসকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। যখন রমাইদাস ঔৎকণ্ঠ্যাতিশয়ে যাত্রা করেন, তখনকার লোকের সহিত হুসেন পণ্ডিত কিছু দূর রমাইদাসের অনুগমন করিয়াছিলেন।

এই হুসেন পণ্ডিতের পরিচয় বেশী করিয়া দিতে হইবে না। মহাবংশাবলী প্রভৃতি সকল পুঁথিতেই কুলিয়ার মহাকুলীন হুসেন পণ্ডিতের পরিচয় আছে। যাঁহাকে লইয়া কুলিয়া-মেল হয়, সেই গঙ্গানন্দের ইনি জ্যেষ্ঠ সহোদর। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই হুসেন পণ্ডিতের খুল্লপিতামহ। যখন গঙ্গানন্দকে লইয়া কুলিয়া মেল হয়, তখন হুসেনের মৃত্যু হইয়াছিল।

চরিদাস ঠাকুর যখন নীলাচলে মহাপ্রভুকে দেখিতে যান, তখন গৌরাব্দের বয়ঃক্রম ৩৫।৩৬ বর্ষ অর্থাৎ ১৪৩২-৩৩ শক (=১৫১০-১১ খৃঃ অঃ) হইবে, কিন্তু তখন হরিদাসের বয়ঃক্রম প্রায় ৭৫ বর্ষ। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কৈশোরের জীবদ্দশাতেই হুসেন পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর গঙ্গানন্দকে লইয়া কুলিয়া মেল হয়। এই মেলের সময় গঙ্গানন্দের বয়ঃ পঞ্চ বৎসর হইয়াছিল। তাহাতে গঙ্গানন্দের দাদাজ্যেঠ বলিয়া গণ্য হন। এক্ষণ স্থলে কুলিয়ার বন্য গঙ্গানন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর হুসেন পণ্ডিতেরও বয়স অন্ততঃ পক্ষে হরিদাস ঠাকুরের সমান হইয়াছিল, তাহা মোটামুটী স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ স্থলে পারমার্থিক ১৩৭০ হইতে ১৩৮০ শকের মধ্যে হুসেন পণ্ডিতের জন্মকাল ধরিয়া লইলাম। তাহার অন্ততঃ ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ কৃত্তিবাস পণ্ডিত জীবিত ছিলেন বলিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। এরূপ স্থলে হুসেন পণ্ডিতের পিতামহ-স্থানীয় কৃত্তিবাস হুসেনের ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ১৩৩০ হইতে ১৩৩৫ শকে (১৪০৮ হইতে ১৪১৩ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। এরূপ মোটামুটী কালনির্ণয় হইল দুই চারি বর্ষের এদিক্ ওদিক্ হইলে ধর্ত্তব্য নহে। অতএব প্রায় পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে আমরা কৃত্তিবাসের যে কালনির্ণয় করিয়াছি, এখনও তাহাই যেন সঙ্গত অনেকটা কাছাকাছি বলিয়া বোধ হইতেছে। যে পর্য্যন্ত আরও বিশিষ্ট প্রমাণ বাহির না হইবে, ততদিন আমরা কৃত্তিবাসকে ১৪০৮ হইতে ১৪২০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারি।

এখন কৃত্তিবাসের রামায়ণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পাঁচ শত বর্ষ হইতে চলিল, কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে কত শত লেখকের হাতে পড়িয়া কৃত্তিবাসের মূলগ্রন্থ যে বিকৃত হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও বড় কষ্ট হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের জিনিস। পূর্ব্বে ঘরে ঘরে নিত্য এই গ্রন্থ পঠিত হইত। তখনকার প্রাচীন লেখকগণ যেখানে প্রাচীনতম পুঁথির ভাল বা অর্থ সহজে বুঝিতে পারিতেন না, অথবা বঙ্গভাষার সেই শৈশবকালের পর বা পরিবর্ত্তী কালের অক্ষরে লিখিতে হইবে না ভাবিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলে তাঁহারা যাহিয়া পরিয়া নূতন রচনা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কেবল সে পাপগুলিকে দেখিতে পাই কেন? তাঁহারা দেখিতেন, এমন শত শত প্রাচীনতম কৃত্তিবাসের সেই প্রাচীনতম ভাষার পুঁথি সংগ্রহ করিতে কত চেষ্টা কত যত্নই না করিয়াছেন। তাঁহারা ভাল ভাবিয়া যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, এখন আমাদের নিকট তাহা অমার্জ্জনীয় বোধ হইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের দুইখানি প্রাচীন হস্তলিপি মিলাইয়া দেখুন, কেবল পাঠান্তর নয়, অনেক স্থলেই ভাবান্তর, অর্থাৎ এমন কি এলের ও বিস্তরেরও তারতম্য দেখিতে পাইবেন। মাণিক্য-পরিষৎ নাম্নী সভা হইতে ১৩।১৫ খানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি পাইয়াছেন; তন্মধ্যে, আমরা দুই শ্রেণীর পুথি বাহির করিয়াছি। এক শ্রেণীর পুথি শিল্পাকর দস্যুর উপাখ্যান হইতে আরম্ভ এবং অপর শ্রেণীর পুথি দশরথের বিবাহ হইতে আরম্ভ। এক শ্রেণীর বিভাগ: তার পর একশ্রেণীর দুইখানি পুথি লইয়া দেখিতেছি, অনেক স্থলেই এক পংক্তির পাঠান্তর যে দুইখানিকেই ভিন্ন পুথি বলিয়া ধরিলেও দোষ হয় না। এক শ্রেণীর একখানি পুথিতে যে বিষয় লইয়া ১০।১২টী কবিতা লিখিত হইয়াছে, আবার সেই শ্রেণীর আর একখানি পুথিতে সেই বিষয় লইয়া ৩০।৪০টী কবিতা আছে। এখন ভাবুন দেখি, আমরা কি মুস্কিলে পড়িয়াছি! কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ কি উদ্ধার করা যে কত কঠিন ব্যাপার, তাহা বোধ হয় এখন অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। এই কারণেই পরিষদ্ হইতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এখনও এত বিলম্বে চলিতেছে। পরিষদে ১৫।১৫ খানি পুথি সংগৃহীত হইলেও ১০০ বর্ষের অধিক পুরাতন পুথি আসে নাই। সেগুলি রামায়ণের এইরূপ পুথিবিভ্রাট; তাহার উপর আর পাঁচ ছয় বর্ষের রচনা ১০০ বর্ষের পুথি হইতে উদ্ধার করিতে হইলে মুস্কিলের নয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ। যদি গ্রন্থ উদ্ধার করিতে হইলে অন্ততঃ দুইখানি, কি তার চাই শত বর্ষের প্রাচীন পুথি চাই। যত দিন না এরূপ প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইতেছে, ততদিন কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ করা উচিত নহে। যিনি কৃত্তিবাসের পুঁথি-বিভ্রাট মিটাইতে পারিবেন, যিনি কৃত্তিবাসের মূল গ্রন্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিবেন, বঙ্গভাষা তাঁহার চিরঋণী হইবেন।

৪র্থ ভাগ। ] [ ৩য় সংখ্যা।

# সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

## বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ত্ব*।

আমি নিজে ব্যবসায়ী ভূতত্ত্ববিৎ নহি বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্যার সাধারণ দুই একটি তত্ত্ব ভিন্ন, তাহাতে পাণ্ডিত্যও আমার কিছু নাই। সুতরাং আমার এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষা ও পারিভাষিক শব্দের যে কোন ধার ধারি না, তাহা বলাই বাহুল্য এবং তজ্জন্য যদি কোন দোষের কথা হয়, তবে তাহা কমাই যেন। আমি আমার বিষয় কার্য্য উপলক্ষে এই বঙ্গভূমির প্রায় সমস্ত স্থানই ভাল ভাল করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। সেই ভ্রমণকালে, বাঙ্গালাদেশের ভূমিভাগের প্রতি কিঞ্চিৎ মনঃসংযোগের সহিত অবলোকন করাতে, তাহাতে যে কিছু দেখিবার দেখিয়াছি ও যেখানে যেমন বুঝিয়াছি এবং সেই সকলের ফলস্বরূপ যাহা ভাবে, যে একটা ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাই এখন, পুনর্ব্বিবেচনায় কিছু কিছু বা ছাঁটিয়া ফুটিয়া, কিছু কিছু বা জোড়া গাঁথা দিয়া, অদ্যকার এই প্রবন্ধ আকারে আবেদন করিলাম। জানি না, ইহা কাহারও প্রীতিকর হইবে কি না। এ কথা কেহ কেহ ত বলিতে পারেন যে, তবে এমন অপূর্ব্ববিদ্যা-খরচে লোক থাকিতে এ অজ্ঞত বিষয়ে বিদ্বান্ খরিবার চেষ্টা প্রয়োজন?—নষ্টস্য কাঙ্খা গতিঃ। অথবা তোমরা বলিতে পার, এ অকর্ম্মা কর্ম্মকারের ঔষধ কি?

বাইবেল গ্রন্থে আছে, "মানুষ যতই উঠা পড়া করিতে থাকে, ততই তাহার জ্ঞানলাভ হয়"—(Man will run to and fro and the knowledge will gather) এও না হয়, সেই বহু উঠা পড়ার মধ্যে একটা বলিয়া ধরায় ক্ষতি কি? উঠিয়াছি ও অনেকবার; একবার না হয় পড়িয়াই দেখা যাক্, কেমন লাগে!

---

* বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব প্রবন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় আছে। (৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মূল মহাভারতের সভাপর্ব্বে ১১৩ অধ্যায়ে, পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রা বিবরণে যেরূপ লিখিত আছে যে, যেখানে কৌশিকী তীর্থ, অর্থাৎ যে স্থানে বর্ত্তমান নাম কুশী ও প্রাচীন নাম কৌশিকী নদী গঙ্গায় আসিয়া সংমিলিত হইয়াছে; রাজা যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং তথা হইতে সাগরদ্বীপে কপিলাশ্রমে দেব দেখিয়াছিলেন। অনেকেরই মন্তব্যতঃ এ সংবাদে তাচ্ছিল্য আর করিবার কথা, কারণ—কোথায় কুশীসঙ্গম আর কোথায় গঙ্গার সহ সাগর-সংমিলন; এখনকার হিসাবে এ দুয়ের মধ্যে ৩২৫ মাইল ব্যবধান, অথচ ইহারই নাম কুশীনদসঙ্গমের "কিঞ্চিৎ পরে;" এ আবার কোন দেশী "কিঞ্চিৎ পরে" তা কে জানে! আমাদের দেশে ও "সেকান্দরী" গজ, "সেকান্দরী" হাত; এক কথায় "সেকান্দরী" বিশেষণ সংযোগে সকল জিনিষই আজ বহু বহু দূরায় গিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু এখানে সে "সেকান্দরী কিঞ্চিৎ" বলিলেও পারা যায় না। কুশীর সহ গঙ্গার সঙ্গম এখন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত কাহালগাঁ নামক গ্রামের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত। এই কাহালগাঁ কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লাইনের ঠিক অনুসারে ২৪৮ মাইল এবং কলিকাতা হইতে বর্ত্তমান সাগরসঙ্গম ন্যূনাধিক ৪০০ মাইল হইবে। এখানে কেহ হয়ত মহাভারতোক্তির মর্ম্মগতি নিরূপণ প্রয়াসে বলিতে পারেন যে, কুশীসঙ্গম সে কালে—সে মহাভারতের কালে, যে ত সাগরও দক্ষিণে ছিল। কিন্তু কুশীসঙ্গমকে "কিঞ্চিৎ পরের" সহিত সঙ্গত করিতে তাহাকে কতই দক্ষিণে আর লইয়া যাইতে পারিবে? বিশেষতঃ এই প্রদেশ যাঁহারা বিশেষরূপে দেখিয়াছেন এবং কুশীনদীর অববাহিকা সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু মাত্র দর্শন আছে, তাঁহারা আর এরূপ কথা—বলিবেন না; তাৎকালিক কুশীসঙ্গমকে যদি একান্তই স্থানান্তর করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান সঙ্গমস্থল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উত্তর কিম্বা দক্ষিণে কখনই তাহার অবস্থান নির্দ্দেশ করিবেন না। বস্তুতঃ অতি পুরাকালকাল হইতে কুশীর খাত পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রভৃতি সবই দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা বোধ মহাভারতকারের বর্ণনা অসঙ্গত,—উপস্থিত ব্যক্তিদের সহ এমন কথিল,—সুতরাং বোকা চাষি উড়াইবার জন্য এক উপায় আছে; যারা অতি সহজ, সরলা, নিজেরও কিছু কিছু বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ পায়, অথচ তাহার জন্য কাহার কাছে বিশেষ জবাবদিহি করিতেও হয় না। সে উপায় না?—কোথায় হিমালয়ের কোলে বদরিকাশ্রমে বসিয়া গাছের ছালে পাঁচড়াইয়া মহাভারত লেখা,—আর কোথায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গম; 'পেটের জ্বালায় অস্থির ভিন্‌গাঁয়ের ঠাকুরের পক্ষে' তাহা সম্ভব নয়। সম্ভব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এমনকি ও অনেকটা যাহার মূল, সেই প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, বিশেষতঃ যাহা স্মৃতিতে পুরাণাদিতে যাহা কিছু লেখা, তাহা সকলই স্বাধীন দেশের এবং কল্পনায় পরিপূর্ণ। আমাদেরই কিন্তু পূর্ব্বদেশে সেই সনাতনী

ইংরেজীনবিশগণ, যাঁহারা স্বজাতীয় হিন্দুর ঘরে গোহাড় ফেলিয়া আপনাকে বীরপুরুষ ভাবিতেন; যাঁহারা "বাঙ্গালা জানি না" বলিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন এবং যাঁহাদিগকে "ক খ" র দাগা বুলাইতে দিলে আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়া—আহ্লাদিত হইতেন; তাঁহাদের বিশ্বাস এবং উপায়টা ঐরূপই ছিল। এ শ্রেণীর জীব এখনও খুঁজিলে, দুই একটী পাওয়া যায় কি না জানি না। পাওয়া গেলেও, সৌভাগ্যক্রমে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এবং এখনকার ইংরেজীনবিশ যাঁহারা, তাঁহারা ততটা অবিশ্বাসী নহেন এবং বিস্তার গৌরবও তাঁহাদের সে প্রকারের নাই, বাদ কেবল ইংরেজীতে চিঠি পত্রটা লেখা। তা—সেটা—পূর্ব্বকার ইংরেজীনবিশদের তুলনায় অতি সামান্য রোগ বলিয়াই ধরিতে হয়।

যাহাহউক, বোকা ব্যাসঠাকুরের বোকা কথা যে একেবারে ফেলিবার জিনিষ নহে, তাহা অপরবিধ কয়েকটী প্রামাণিক উপায় দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বা প্রায় চারিশত বৎসর প্রাগব্দে, মগধেশ্বর সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন গ্রীক রাজদূত থাকিতেন, তাঁহার নাম মিগাস্থনিস্[১]। মিগাস্থনিস্ তাঁহার ভারতীয় বিবরণে লিখিয়াছেন যে, পাটলিপুত্র—অর্থাৎ পাটনা হইতে গঙ্গাসাগর সঙ্গম ন্যূনাধিক তিনশত মাইল হইবে। তাহা হইলে এই সাগরসঙ্গম, কলিকাতার কত উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছে! বর্ত্তমান হিসাবে, গঙ্গাসাগরসঙ্গম পাটনা হইতে, রেলপথের মাপ লইয়া ধরিলে, প্রায় ৪৫০ মাইল এবং প্রচলিত লোক চলাচলের পথ অনুসারে ৫০০ মাইলের কম হইবে না। পুনশ্চ, কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীর পঞ্চম তরঙ্গে, রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, রাজা ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আইসেন, তখন গৌড় নগরের অত্যল্প দেশ পরেই সাগর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। এখনকার ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্গণও বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গাসাগর এক সময়ে, রাজমহল বা তাহার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্গণের একথা আরও আশ্চর্য্য নহে কি?

কাশ্মীরপতি রাজা ললিতাদিত্য, যিনি গৌড়নগরের অত্যল্প দেশ পরেই পূর্ব্বসমুদ্র প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তিনি বড় বেশী দিনের লোক নহেন। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে, ইনি ৬১৯ শকে কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৬৫৫ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ১৮১৯ শক হইতে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের ৬১৯ শক বাদ দিলে ১২০০ বৎসর অন্তর হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, ন্যূনাধিক বারশত বৎসর পূর্ব্বে, গৌড়ের অতি নিকট পর্য্যন্ত, পূর্ণ প্রবাহে না হউক, অন্ততঃ এখন যেমন খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে এবং মেঘনা নদীর মুখে, সেইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে দ্বীপ, চরভূমি ও জলাভূমিসমন্বিত পূর্ব্বসমুদ্র প্রবাহিত ছিল। সর্ব্বত্র ভাল বুনানীর ন্যায় নদীর মটা, মধ্যে মধ্যে কোন কোনটা আবার এত বিস্তৃত যে কূল কিনারা নজর

১। Megasthenes Frag. VI.

হয় না, কোথাও বা নদীর মুখের নিকট সমুদ্রগর্ভস্থ চুনযুক্ত প্রবেশ করিয়া তরঙ্গলেখা খেলিতেছে, কোথায় বা চরভূমি ভাটার সময় জাগিয়া উঠে, জোয়ারের কালে ডুবিয়া যায় এবং কোথাও বা ভূমিভাগ জলরেখা উত্তীর্ণ হইয়া সুন্দরী প্রভৃতি নানাবিধ জঙ্গলে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই যে চিত্র এখনকার, তখনও বোধ হয়, গৌড়ের অতি সন্নিকটে ইহার বিদ্যমানতা ছিল। সুতরাং বলিতে হয় যে, তখনকার কালে এখনকার এই নদীয়া, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশপরগণা এবং মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ এই কয়টি জেলার অস্তিত্ব ছিল না। ক্রমে দ্বীপ ও চরভূমি সকল প্রবল ও প্রশস্ত হইতে থাকায়, যত ও যেমন সমর পড়িয়া গিয়াছে, ততই দেশ সকল ক্রমান্বিবেশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এই রূপেই কালে উক্ত কয়েকটী জেলা-সমন্বিত বর্ত্তমান দ্বীপের উদয় হইয়াছে। ইত্যাকার ক্রমোন্নত দ্বীপাধিবাস হইতেই, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, চরদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপাত্মক নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

উক্ত দ্বীপাত্মক নাম ভিন্ন, এই বাঙ্গের বদ্বীপের মধ্যে আরও অসংখ্য স্থান আছে, যাহাদের অন্তর্ভাগে "দীয়া" শব্দ সংযোজিত; যেমন কাঁটাদীয়া, সাগরদীয়া, আলোকদীয়া, কালাদীয়া, জয়দীয়া, মহেন্দ্রদীয়া ইত্যাদি। এখানে বলিয়া দেওয়া বাহুল্য যে, এই "দীয়া" দ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মুসলমান বাদ্য আসিয়া বসত হওয়ায়, অনেক স্থানের নাম কাটা হইয়াছে, যথা বিলাসকাটী, নায়েবকাটী, স্বরূপকাটী, আদিলকাটী, বিষ্ণুকাটী, বালীকাটী ইত্যাদি। এখনও এই বর্ত্তমান কালেও বরিশাল জেলায় বহু বৃহৎ নদী ও সমুদ্র পাড়ি সকল পড়িয়া যাওয়ায় ভূমিভাগের উদয় যেমন তাহা অধিবেশিত হইতেছে; চরভূমিতে অধিবাস হেতু, সেই সকল স্থানের চরান্তক নাম হইতেছে, যেমন ঝালকাঠির চর, গোপালচর, মধুচর, লোয়ের চর, পাঁচচর, চরভদ্রাসন ইত্যাদি। কয়েকটা পরগণাও হইয়াছে, তাহাদের নাম চরান্তক, যেমন চর বাসিয়া ইত্যাদি।

উপরে বলা হইয়াছে, ঐ বারশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া প্রভৃতি জেলার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ঐ সময়েরই ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভাগীরথীতটে নবদ্বীপ নগরে গৌড়পতি বল্লাল এবং লক্ষ্মণসেনের সাময়িক বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে সমুদ্র বা বালা ছিল, সেখানে এরূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল, ইহা ভাবিয়া হয়ত অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুমাত্র নাই; যেহেতু যে পরিবর্ত্তন বার শত পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, এখনও তাহার অভিনব পরিবর্ত্তন এবং বর্ত্তমান সময়ের সে অভিমুখ নিয়ত হইতেছে কি পরিমাণে সমর লাগিতেছে তাহা দেখিলেই তদ্দ্বারা সে কালের সেই পরিবর্ত্তনে কত সময় লাগিয়াছিল, তাহা অনায়াসে অবধারিত হইতে পারিবে। তখনকার ও এখনকার এ উভয় কালের যে অভিনয়, তাহা উভয়তঃ একই প্রকার একই কারণ হইতে উৎপন্ন এবং পরিশেষে একবিধ ফলে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে।

মেঘনা নদীর সাগরসঙ্গমস্থলে বাহুরা, মানপুরা প্রভৃতি দ্বীপ, যাহা ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল ভাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত; যাহা তখন সম্পূর্ণ বাদার অবস্থায় পরিণত হয় নাই, সুতরাং বাদা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন ছিল; এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এ দুইটী দ্বীপ সম্বন্ধে যে কিছু খবর, তাহা পাঠকগণ নিরস বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রবন্ধ-লেখকের নিকট তাহা বড়ই সরস। ফলতঃ আমাকে এ দুইটী দ্বীপের খবর বড়ই বেশী বেশী রকম রাখিতে হয়, যেহেতু এখান হইতেই আমার আহারীয়ের জন্য খাঁটি ভরসা ঘৃত আনান হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহার পর নাজীরচর, ফালকনচর নামে আরও দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ, যথায় খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালেও জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, এখন তথায় বহুলোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাবণাবাদ নামক কয়েকটী দ্বীপ, কুকড়ি-মুকড়ি চর, ধোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দ্বীপ গত ৬০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে লোকাবাস হইয়াছে। তাহার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অত্যন্ত দক্ষিণভাগে, যেখানে শতবর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উত্থিত ভূমি ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বিলি হইতেছে এবং নিত্য নূতন জঙ্গল কাটাইয়া সেই সকল স্থানে আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সকল উদ্ভব-ক্রম-পরিণতি দেখিলে, নবদ্বীপাদি স্থানের উদয় ও বসতি স্থাপন অন্ততঃ অনেক বেশী সময় বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে।

ফলতঃ সুন্দরবনের দক্ষিণে এবং গঙ্গাসাগরের মুখে এখনও নিত্যই সমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন জমির উদয় হইতেছে, এবং সেজন্য গঙ্গাসাগরসঙ্গম ক্রমেই দূরে যাইয়া পড়িতেছে। যেহেতু কেবল পঞ্চশত নহে, এখন দ্বিপঞ্চশত নদী সর্ব্বদাই গঙ্গার সহচারিণী থাকিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে অপার মৃত্তিকারাশি আনিয়া নিকটবর্ত্তী সাগরকে শুষ্ক করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল, অভিজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিতেরা গাজীপুরে একবার নানা উপায় প্রয়োগে নিরূপণ করিয়াছিলেন যে, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে ১৭৩৮৪০০০০ মণ মাটি আনিয়া উপস্থিত করিয়া থাকে। এই হিসাব হইয়াছিল, গাজিপুরে বসিয়া। কিন্তু গাজিপুরের দক্ষিণে স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, সুন্দরবনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী, তাহার পর উত্তরপূর্ব্বকোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি, এ সকলের দ্বারা আরও কত মাটি বাহিত ও আনীত হইয়া থাকে, তাহার আর হিসাব হয় নাই। এখন ঐ গাজিপুরের হিসাবের সাদৃশ্যে এ সকলের বাহিত মাটির পরিমাণ কত, তাহা যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, কি প্রভূত মাটিই প্রতি বৎসর সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে এবং ইহাতে

যে এত শীঘ্র সমুদ্র ভরাট হইয়া নূতন জমী উত্থিত হইবে ও সেই সকল স্থানে নূতন দেশ বসিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কোথায়?

অতঃপর আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের মাটির অবস্থা পরীক্ষা করিলে স্থানভেদে তাহার এই চারি প্রকার প্রধান বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্মার ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটী পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপঘাটী হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমধার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, এই সমস্ত ভূভাগের সর্ব্বত্রই, প্রায় এক প্রকৃতির মাটি। অবশ্য ভূতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহার মধ্যে বিভাগ দৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু আমাদের এই আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য যতটুকু, তাহার মধ্যে তাদৃশ সূক্ষ্ম বিভাগ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। স্থূলতঃ এবং মোটা দৃষ্টিতে যতটুকু দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এখানে যথেষ্ট হইবে। সেই মোটা দৃষ্টিতে এক প্রকারের মাটি বলিতেছি। ইহা সর্ব্বত্রই কাঁকর পাথর পূর্ণ অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি। এ বিষয়ে আরও একটু বলার প্রয়োজন যে, যদিও রাজমহলের দিকে এবং মেদিনীপুরের দিকে, বিষ্ণু ও পূর্ব্বঘাট শ্রেণীর প্রকৃতি ভেদে, মাটির প্রকৃতিরও দুই রূপবিভাগ হইতে পারে বটে, কিন্তু উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগে এবং আমাদের প্রয়োজনে যতটুকু আবশ্যক, তাহাতে তদ্ভিন্নকে একশ্রেণীর মাটি বলিয়া ধরায় কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না। আমাদের প্রয়োজনানুরূপ, উভয়ই সমান কাঁকর পাথর পূর্ণ ও পাহাড়িয়া মাটি। যেখানে বা কাঁকর পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন বর্দ্ধমান-জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ, সেখানেও মাটি এত কঠিন ও তাহার প্রকৃতি এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোন স্থানে তাহার অনুরূপ মাটি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাহাও যে এই বিভাগের অপরাপর মাটির সঙ্গে সমশ্রেণীর ও সম-ধর্ম্মাক্রান্ত সে পক্ষেও কোন সন্দেহ থাকে না। এই সমস্ত ভূভাগের মাটি বহু যুগযুগান্তর হইতে নির্ম্মিত; সুতরাং ইহাকে সোজা কথায় পাকা-মাটি বলিয়া ধরা যাইবে। উহা পাকা মাটিই বটে। ইহা নিশ্চয় যে, এক সময়ে সমুদ্র গৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত ছিল অথবা আরও পূর্ব্বে, গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন ইংরেজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নির্দ্দেশ অনুসারে রাজমহলের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ের সেই সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিহ্ন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সুতরাং ঐ মাটিই যে আগে সমুদ্র এবং পরে সমুদ্র-বালার পশ্চিম সীমা ছিল, তাহাতে সন্দেহ অতি অল্পই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ তরাই পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে

পুরীর উত্তর তট পর্য্যন্ত, ক্রমাগত চালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্ব্বত্রই মাটির প্রকৃতি এক প্রকার। সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত বালুকারাশি বিস্তৃত হইয়া আছে এবং তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি জন্মিয়াছে, যদ্দারা মৃত্তিকা-সাধ্য চাষ আবাদাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই চালু বালুকাময় ভূমিতে, সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই জলসিক্ত ও আর্দ্র। ফলতঃ ভূমির জলসিক্ত ভাব এতই অধিক যে, এখানে আলু, ইক্ষু প্রভৃতির চাষে কখনও জলসেচন করিতে হয় না। আমি রঙ্গপুর ও অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধান করিয়া চাষাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, এখানে আলু প্রভৃতিতে জলসেচন করিলে, তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, গাছিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বালীর ভাগ এ সকল প্রদেশে এত অধিক যে, কূপ ব্যতীত, পুষ্করিণী খনন করিতে পারা যায় না। পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেই, বালী আসিয়া বসিয়া যায়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীঘি ভিন্ন, সঙ্কীর্ণ আয়তন পুষ্করিণী খনন, বালীর প্রাচুর্য্যে এতরূপ অসাধ্য ব্যাপার অত্যুক্তি হয় না। এখানে এ কার্য্যে কাহারই সম্পূর্ণ সফলকাম হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু এত বালুকা আসিল কোথা হইতে? ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট শুনিতে পাই যে, পৃথিবীর ভূগর্ভের নির্ম্মিত হওয়ার "ইওসিন্" যুগে, হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। হিমালয়ের কেবল তটভাগ নহে, তাহার বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখনও সলিলময় ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য যে, এ দেশের যে স্তূপাকার অসীম বালুকা ভিত্তি, ইহা কি সেই প্রাচীন ইওসিন্-সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার ফল? কিন্তু তাই বা বলি কি করিয়া, সেত ইওসিন্ যুগ যে, সেত অনেকদিনের কথা! ইওসিনের পরও কয়েকটী স্তর হইয়াছে যথা, মিওসিন্ পিওসিন্ এবং ইহার পরে অগস্তবের চতুর্থযুগের ওর নির্ম্মাণ-ক্রিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে পিওসিন্ হইতেই প্রথম সমুদ্র সৃষ্টির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিহ্নগুলি অতি অল্পই ও সন্দেহ-সঙ্কুল। উপর মিওসিন্ হইতেই কেবল যাবতীয় অস্তিত্বের সার্থ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়ার আরম্ভ বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই সকল স্তরের এক একটা নির্ম্মিত হইতে অন্ততঃ লক্ষ বর্ষ লাগা সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং এত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালী কি আজিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া নিরাবরণে থাকিতে পারে?—ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। তাই বলিয়াছি যে, উহা হিমালয়ের গাত্র-ধৌত বালুকা। এই প্রদেশ হইতে হিমালয়ের তরু, তার প্রস্তর-প্রবর সরিয়াছিল, সুতরাং বালী জমা হইবার পক্ষে কারণের অভাব কোথায়? অবশ্য, এ বালীর এ সকল ভূভাগ জমিবার বহুকাল পূর্ব্বে জমিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিস্তারের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিস্তারের সহ সম পুরাতন ও নিম্নাংশের জমি

তদপেক্ষা কিছু আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক হইলেও ইহার দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিভাগের ভূমি মোটের উপর এতটা পুরাতন হইলেও, যে দৃঢ়তা তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাহাও ইহার কোন অংশে যে দৃষ্ট হয় না তাহার কারণ, ইহার ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতট হইতে নওয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং এদিকে তমোলুকের নিকটবর্ত্তী স্থান। নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ প্রকৃতির ভূবিভাগ উদিত হইয়া থাকে, এই সমস্ত স্থানের প্রকৃতি অবিকল তদ্রূপ। কালক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়াই, এই সকল ভূভাগের উদয় হইয়াছে এবং সমুদ্র সরিয়া যাইবার সময় যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে, (যাহাকে চলিত কথায় বালিয়াড়ী বলিয়া থাকে,) তাহাই, ইহাদের প্রাচীনত্বের ইতর বিশেষ হেতু, কোথাও খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি-উচ্চ পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। [illegible] বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র। কিন্তু চট্টগ্রাম [illegible] অঞ্চলে, তাহা পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের গাত্রবিদারণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্ব্বত্রই ঝাঁঝুরিকে জলজন্তুদের পঞ্জরে পরিবর্ত্তিত। এ সকল পর্ব্বতগুলি এত খণ্ড খণ্ড ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে, এক চট্টগ্রাম সহরের ভিতর ও পার্শ্বেই গণনায় ১৪।১৫টা হইবে। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীর্থে যে সকল পর্ব্বতমালা আছে, তাহারা যদিও কিয়ৎপরিমাণে স্বাতন্ত্র্য স্বভাববিশিষ্ট, তথাপি তাহাদেরও উৎপত্তি ও পরিণতি কালের প্রকারের সামুদ্রিক বালিয়াড়ী হইতে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমায়, দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে যে পর্ব্বতমালা প্রধাবিত হইয়া হিমালয়ে লীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল হইতে এই বালিয়াড়ীনির্ম্মিত পর্ব্বতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সকল পর্ব্বতমালা বহুযুগ পূর্ব্বে সৃষ্ট এবং সমুদ্র যে এক সময়ে তাহারই পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল ও কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া যে এই তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকলের উদয় করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুপরিমাণে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যদিও অবশ্য সে দৃঢ়তা মোটের উপর ধরিলে, কখনই প্রথম বিভাগের সমকক্ষতায় আসিতে পারে না।

চতুর্থ বিভাগ। এই বিভাগের মৃত্তিকা যাহা, তাহা সর্ব্বত্র পলমৃত্তিকা, কোথাও কদাচ কোন বিশেষ কারণে কিছু কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প ও দৃঢ়তা এত সামান্য যে, তাহা গণনার মধ্যেই আসিতে পারে না। প্রথম

এই চতুর্থ বিভাগের মধ্যে উভয় উভয়ের তুলনে, মাটি যে কতই পৃথক ধর্ম্মাক্রান্ত, তাহা অতি স্পষ্ট ভাবে গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার ও উত্তরে মালদহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার অতি নিম্ন তীর পর্য্যন্ত, এবং পাথর ও কাঁকরযুক্ত কঠিন রাঙ্গা, মেটেল মাটি আর তিল তাহার তাবতের সমস্ত ভূমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলাই দো-আঁস পলী মাটিযুক্ত অথবা কেবল রাজমহল ও মালদহের পার লইয়াই বা বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথী ব্যাপিয়া দুই পারের মাটির তুলনা করিলেও, তদুভয়ের মধ্যে বিপুল যে প্রকৃতি ভেদ তাহা সামান্য দৃষ্টিতেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। অবশ্য ভাগীরথীর পশ্চিম পারের দ্বিতীয় ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিও না, তাহা হইলে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইবে না। যে পলল নদীর দ্বিতীয় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া তাবত মাটির সঙ্গে তুলনা করিলেই, আমার কথার সার্থকতা অনুভব করিতে পারিবে।

এই চতুর্থ বিভাগের আয়তন, পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্ব্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র। এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগকেই গাঙ্গেয় বদ্বীপ কহে। বদ্বীপের সমস্ত ভূমিভাগই, পদ্মা এবং তাহার অসংখ্য শাখা নদী সমূহের প্রবাহ বাহিত মৃত্তিকায় সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িতে থাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। এজন্য ইহার সমস্ত ভূভাগই পলী মাটি জাত এবং এখন পর্য্যন্ত, মধ্য মধ্যে সামান্য টুকরা ভূখণ্ড ব্যতীত, প্রায় সর্ব্বত্রই পলী মাটির চিহ্ন সকল অতি স্পষ্ট এবং কোথাও কোথাও একেবারেই অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ পলী মাটি জাত বলিয়া, এ ভূভাগের প্রায় সমস্ত স্থলিম উর্ব্বরতা শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর কোন বিভাগের মৃত্তিকা তুলনাই হইতে পারে না। এখানে জমির মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং জমি পতিত থাকিলেও যত শীঘ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা নিরস জমি প্রথম বিভাগীয়; তথায় জমি বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের জমির ন্যায়, জঙ্গল সম্পূর্ণ অরণ্য কোনকালেই হইতে দেখা যায় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাদির বৃদ্ধি ও বিস্তার তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্ব্বরতা শক্তি এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ এবং কোন কোন অংশে এমন কি চতুর্থ বিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি, উভয়ই যদিও সমুদ্র ক্রমে পলিয়া যাওয়া জাগিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্ম্মাণ প্রকরণে যে বিভিন্নতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। তৃতীয় প্রকারে মাটি নির্ম্মাণে সমুদ্রের নিম্ন জোয়ার ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভাটার সময় যে প্রকার

সমুদ্রের চাতু ভীর-ভূমিতে সমুদ্রের জলকে ধাক্কা রাখিয়া জল নীচে গিয়া নামিয়া পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন নৈসর্গিক কারণবশে ক্রমান্বয়ে যেমন সমুদ্র জল হইতে—তটকে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি জমির উচ্চ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে মৃদু আবার বালুর প্রবল আঘাতে বালুকারাশি স্তূপীকৃত হইয়া ও তাপাধিক্য কারণে ক্রমোৎকর পুষ্টিপ্রাপ্ত করিয়া, এখানে প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ প্রকারের মৃত্তিকা নির্ম্মাণ করিবার প্রকরণ অন্যবিধ।

যিনি বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং সুন্দরবনের অবস্থা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনি এই চতুর্থ প্রকার ভূমি-নির্ম্মাণের কৌশল অতি সহজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার ক্রিয়াযোগে যখন নদীর সঙ্গম স্থলস্থ সমুদ্রের চর পড়িতে থাকে, তখন তাহা প্রথমোদ্গমের খানিকটা পরিমাণ স্থান লইয়া ও তাহার চারিদিকের সমান ভরাট হইয়া সমান ধারিয়া উঁচু হইয়া উঠিতে দেখা যায় না। নদীপ্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকা সমুদ্র-গর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে সমত্রিকোণ ত্রিভুজের আকারে সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণক্ষেত্রের শুরুদেশ নদীর মুখে এবং ভূভাগবর্ত্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ, যে যে স্থান পরিসরে অতি অল্প, তাহা কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এইরূপে যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক সুবিস্তীর্ণ ত্রিকোণ খণ্ডনির্ম্মিত হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহার অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে এবং যে ভূমির প্রান্তে, বিশেষতঃ যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত নিশ্চয়ই, নদীমুখ হইতে সমুদ্রাভিমুখে অল্পবিস্তর (যেমন হউক কম) আকার প্রাপ্ত হয়। এদিকে, ভরাট ভূখণ্ড যখন ক্রমে সমান বাড়িতে থাকে, কিন্তু জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই; তখন সমুদ্র জলের স্রোত-বেগ যদিও আর তাহাদিগকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিম্ন ও তরল অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে এবং এই সকল নদীর রেখাই, জল ছাড়াইয়া উঠিলে, তখন তাহার মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। উহাদের জলক্রিয়া দ্বারা নবোদিত ভূমি পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ও ক্রমাগত স্রোতোবেগ দ্বারা ধৌত হইয়া পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইতে থাকে, তখন তাহা একরূপ চিরদিনের মত স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় বলিলেও বলা যাইতে পারে। তখন ঐ প্রকারের পূর্ণনির্ম্মিত মাটি হইতে নদীসকল বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে গড়িয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তদাকারে নির্ম্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্ম্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনায় ও আকৃতিতে নামমাত্র এবং তদ্দ্বারা ভাঙ্গা গড়ার কার্য্যও এত মৃদু হইয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা বহুকালেও দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাতে বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। সাগরের বর্ত্তমান এইরূপেই

গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে চলিতে থাকায়, নিত্য নিত্য মনুষ্যের বাস ও ব্যবহার-উপযোগী নূতন নূতন ভূমি ও সমুদ্র ছাড়াইয়া উদয় হইতেছে। উপরে যে একালের ভূগঠনপ্রক্রিয়া বলিলাম, এখনও তাহার অস্তিত্বে, সমুদ্রগর্ভের অনেক দূর লইয়া নদী সকলের আনীত মৃত্তিকার নিম্নে এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এখনও জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে, এবং ঢেউয়ের উপর নদী ও খালের যে পাতরেখা পড়িয়াছে, তাহা বড় সুন্দর ভাবে কাদা মিশ্রিত বালুকার পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। উহাই সম্প্রতি আবার সে সকল ভূখণ্ড সমুদ্র হইতে ছাড়াইয়া মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে, তাহার কতকাংশ বা ঘন ঘোর জঙ্গলে সমাকীর্ণ, কতক বা ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপাকারে পরিণত এবং এ সকলের সর্ব্বত্রই দূরে বৃহৎ ও বিস্তারশীল নদী এবং তার ক্ষুদ্র খাল উভয়েরই দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। এ সকল নদী খাল যেমন একদিকে বিপুল বেগে ভাঙ্গা গড়ার কার্য্য করিতেছে তেমনি অন্য দিকে প্রতি জোয়ারে অতিশয় ঘনীভূত ঘোলা জলে সমস্ত স্থান প্লাবিত করিয়া পলি মাটির দ্বারা তাহার ক্ষয় পূরণ করিতেছে। কালে যে এ সকল নদীনালায় সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ সকল দেশভাগে সংযুক্ত হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌড়ের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ সমুদ্র যখন উক্ত প্রকারে ভরাট হওয়াতে উন্নত ভূখণ্ডের উদয় ক্রমেই দক্ষিণে সরিয়া যাইতেছিল এবং এখন যেই উন্নত ভূখণ্ডে বর্ত্তমান সুন্দরবনের স্থান। অসংখ্য নদী ও খাল পড়িয়াছিল, সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে একসময় যাহা তৎসমস্ত অপেক্ষা অতি প্রবল নদীধারা ছিল গঙ্গার মূলপ্রবাহ।

কিন্তু এই মূলপ্রবাহ, যাহা বর্ত্তমান কালে পদ্মার আকারে এমন দুর্জ্জয় ও প্রমাদশালিনী দেখা যাইতেছে, তাহা তখন কোন্ বিশেষ খাত দিয়া প্রবাহিত হইত? প্রথমতঃ নদী সকলের ধর্ম্ম প্রায়ই একরূপ যে, দুই পারের মধ্যে যে দিকে অপেক্ষাকৃত মাটির কাঠিন্য সেই দিকেই প্রবাহের পক্ষে বাধা বেশী, সেইখানেই তাহার বাঁধা প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রাভিমুখে গমনকালীন, যে পথ অতি সোজা অথচ ঢালে উন্নত নিম্নভূমি, সেই পথ প্রোক্ত কঠিন মাটির বাধা বা অধিকার দেশ হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও, নদীস্রোত প্রথমে সেখান দিয়াই গমন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই, নিজের নৈসর্গিক ধর্ম্ম অনুসারে, পার্শ্বস্থ নরম মাটি গলিয়া চুরিয়া কঠিন মাটির বাধা যেখানে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখনকার কালে, বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী হইতে তাহার পশ্চিমবর্ত্তী, উহার দ্বিতীয় বিভাগীয় ও পূর্ব্ব তৃতীয় বিভাগীয় এই ভূখণ্ডদ্বয়ের সমাচ্ছন্ন বেথ পর্য্যন্ত, চরভূমি, জলাভূমি, সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত অন্তর্ভূত

ইত্যাদি যদৃচ্ছা বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এই সকল কারণ ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, গঙ্গায় যে দুর্জ্জয় মূলপ্রবাহ এখন পদ্মার খাদ দিয়া চলিতেছে, তখন তাহা বর্ত্তমান ভাগীরথী খাদ দিয়া, পদ্মারই ন্যায় সমপ্রবল অথবা হয়ত প্রবলতর বেগেও প্রবাহিত হইত। এখনকার ন্যায় তখনও গঙ্গার অপর যে অসংখ্য শাখা প্রশাখা ছিল, তাহারা ভাগীরথীর পূর্ব্বস্থ তাৎকালিক সেই অসম্পূর্ণ বদ্বীপের বহুলাংশ ব্যাপিয়া আপনাপন জলরাশি ঢালিত। এখন যাহাকে পদ্মা বলা যায়, তখন তাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না সন্দেহ; অথবা থাকিলেও হয় ত, সেই অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে, কোন একটী শাখা পদ্মানামে গণিত হইত এবং এখনকার তুলনায়, তখন যে তাহার প্রবলতা অতি সামান্য ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

ফলতঃ সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, যখন বদ্বীপ সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রথম উত্থিত হয়, তখন মূলগঙ্গার প্রবাহ ভাগীরথী খাদ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়াই লোকে উহাকে গঙ্গা ও উহারই সাগরসঙ্গমকে গঙ্গাসাগরসঙ্গম বলিত এবং তৎস্বরূপেই উহা এতকাল গণিত ও মানীত হইয়া আসিতেছে। নতুবা, এরূপ বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন, গঙ্গার এত বড় বড় শাখা প্রশাখা এবং তাহার মূলস্রোতস্বরূপ পদ্মা, এ সকল থাকিতে তাহাদিগকে ফেলিয়া, সামান্য একটা খাদ ভাগীরথীকে যে লোকে আসল ও মূল গঙ্গা বলিয়া মানিবে, এটা প্রকৃতপক্ষে বড়ই আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় কথা হইয়া পড়ে।

বোধ হয়, যখন বদ্বীপের আর সমস্ত অপূর্ণ ও তাহার স্থানে স্থানে অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া চরভূমিসমন্বিত সমুদ্র খাড়ী সকল প্রবাহিত হইতেছিল এবং হয়ত যখন গৌড়ের অদূরে পর্য্যন্ত সে খাড়ীর ধিয়োদেশ বর্ত্তমান ছিল, তখনও ভাগীরথীর পূর্ব্বকূল সহ-ভূমি দক্ষিণে অনেকদূর বিস্তৃত ও নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ একপ বিবেচনা ভিন্ন এ দুই কথায় একথা সঙ্গতি হইতে পারে না;—অর্থাৎ প্রথমতঃ রাজতরঙ্গিণী অনুসারে দেখা যাইতেছে যে, বারশত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য গৌড়ের অতি নিকটেই সমুদ্রের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লুসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তেজপত্র ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বাহিনী নৌকা ও জাহাজ যোগে গাঙ্গেয় বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই গঙ্গার মূল প্রবাহ ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত না থাকিলে আর, বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবঙ্গ হইতে গঙ্গাদ্বারা বাহিত হইয়া তমোলুক মুখে আসিতে পারে না।—কিন্তু একটা কথা, মূল গঙ্গা ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত থাকিলেও, তদ্দ্বারা এখন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, গঙ্গা তখন তমোলুক পর্য্যন্তই বিস্তৃত ছিল। অথবা এখনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়ীকেও গঙ্গা বলিয়া ডাকিত এবং সেই অর্থেই পেরিপ্লুসে,

গাঙ্গে। বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে গঙ্গারই নির্ব্বিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সোপোত্র অনুমানই যে ঠিক, তাহার আনুষঙ্গিক এই দুইটী প্রমাণও পেরিপ্লুস হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়;—১ম গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থে যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত; নদীতে যে সকল নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই এই সামুদ্রিক পোতের ব্যবহার ছিল। ২য়—যে সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ "গঙ্গে" নামক একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ গঙ্গার মুখে ছিল।[১] অবশ্যই গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্ত্তে বহুবিস্তৃত সমুদ্র খাড়ী না হইলে আর পেরিপ্লুসের এ দুই কথার সঙ্গতি হয় না।

ভাগীরথী খাদে গঙ্গা বড় কম দিন প্রবাহিত ছিল না। যেহেতু গঙ্গার উক্ত খাদে প্রবাহিত হওয়ার তখন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে পেরিপ্লুসে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় শতকের প্রথম শত বীতে এবং শেষ পরিচয় চীন পরিব্রাজক হিউএনসিয়াঙের বিবরণে,[২] তাহা হইতে সপ্তম শতাব্দীতে। এই ৬ শত হইতে ছয়শত বৎসর গঙ্গা সেবা যাইতেছে, মুগপাত্র ভাগীরথীখাতে পতিত এবং ইহার পরেও যে কতদিন পর্য্যন্ত [illegible] তাহার মূল প্রবাহ ঐ খাদে চালিয়া ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের বোধ হয়, হিউএনসিয়াঙের কিছুদিন পরেই, পরে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং যৎকালে নদীপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূবিশ্লেষ সকল নির্ম্মিত ও পলরেখা ছাড়াইয়া মস্তকোত্তলন করিয়াছে, সেই সময়েই বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খাদ পরিত্যাগ করিয়া পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বন পূর্ব্বক, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলের আরও উত্তর পূর্ব্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যেই পদ্মা যতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালঙের নৈম দিয়া যাইয়া কীর্ত্তিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তাহা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার মূল খাদ ছিল; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৬।১৭ ক্রোশ উত্তরে। অনূন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে ক্ষুদ্র নদী কুমার নামে ফরিদপুর জেলায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার বহুলাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তাহা হইতে পদ্মা এখন বড়ই সরিয়া গিয়াছে।

পেরিপ্লুসে ভমোকুক পর্য্যন্ত গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ার কথা লিখিত আছে, এবং

---

১। Mc Crindle's Periplus of the Erythrean. p 141-142

২। হিউএনসিয়াঙ যদিও ঠিক কোন্ খাদে পদ্মার পথ নির্দ্দেশ করেন নাই তথাপি তাহার গ্রন্থে বিবৃত পথে বলিয়া, তদ্দ্বারা গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত ছিলিয়াই বোধ হয়। হিউএনসিয়াঙের বিবরণে তলিবক্ত পদ্ধতি স্থানের অস্তিত্ব এখনে কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না।

হইতে পারে, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানও তখন সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্ষণিক উদয় হইয়াছিল, কালে পুনর্ব্বার তাহা বসিয়া যাওয়ায় তথায় সমুদ্রপ্রবাহ প্রবাহিত হয় এবং ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বেও সে সমুদ্রপ্রবাহ সরিয়া যায় নাই। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ যে এক সময়ে সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া কিছুকাল বাদাবন থাকিয়া, তাহার পর আবার সমুদ্রগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, তাহার অনেকই প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে। কলিকাতার ভূতত্ত্বপরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের ৩০।৩৫ ফুট নিম্নে এখনও উদ্ভিদের সুন্দরী ও অন্যান্য বাদাবনসুলভ বৃক্ষাদির স্কন্ধ অর্থাৎ গুঁড়িসকল দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুদিনব্যাপী বনবৃক্ষাদির স্তর দীর্ঘকাল মাটির নীচে থাকিলে যেরূপ পাথুরে কয়লা হইয়া যায়, এই সকল স্থানের নিম্নে তদ্রূপ অপরিণত পাথুরে কয়লার সামান্য স্তরও লক্ষিত হয়। কলিকাতা শিয়ালদহ রেলওয়ে ষ্টেসনের মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার খননকালে ভূতত্ত্বশাস্ত্রদর্শী ব্লানফোর্ড সাহেব ঐ স্থানের যে ভূতত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের ৩০ ফুট নিম্নে অপরিণত অবস্থায় পাথুরে কয়লার স্তর আছে এবং সেই স্তরের মধ্যেও দণ্ডায়মানভাবে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরস্থিত কয়লা এখনও সম্পূর্ণতঃ পাথুরে কয়লায় পরিণত না হওয়ায়, উহাতে এখনও অগ্নি সংলগ্ন হয় না। এই স্তর সমস্ত কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান লইয়া বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার স্তরের যেরূপ ধর্ম্ম দেখা গিয়াছে, এখানেও সেইরূপ। ঐ অপরিণত স্তর সর্ব্বত্র সমগভীর মাটির নিম্নে নহে। শিয়ালদহে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফুট নিম্নে, কেল্লার কাছে তাহাই ৫১ ফুট নীচে নামিয়া গিয়াছে; আবার কোম্পানির বাগানের কাছে তাহা অতি অল্প মাটির নিম্নেই দৃষ্ট হয়। মাটি এরূপ বসিয়া যাওয়ার পক্ষে, ভূকম্পনাদি নানাবিধ নৈসর্গিক কারণই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভূকম্পন ব্যতীত, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়াতেও ভূপৃষ্ঠের অনেক স্থানই ধীরে ধীরে কোথাও বসিয়া যাইতেছে এবং কোথাও বা উচ্চ হইয়া উঠিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্যার পুস্তকে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। শুনিতে পাই নাকি, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক অংশ ঐরূপ ধীরে ধীরে বসিয়া যাইতেছে।

উপরোক্ত সামান্য এবং মোটামুটী কয়েকটী ভূতত্ত্ববিদ্যার দ্বারা এক্ষণে আমরা এই পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিতেছি যে, এই বঙ্গদেশের বর্ত্তমান আকার এবং লোকের বাসভূমি এখন যেমন দেখিতে পাই, বারশত বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা নিরূপিত হইতেছে যে, তাৎকালিক দৃশ্য সংক্ষেপতঃ এরূপ ছিল। গঙ্গার মূল স্রোত, যাহা এখন পদ্মা দিয়া যাইতেছে, তাহা তখন ভাগীরথী খাদে প্রবাহিত এবং সেই প্রবাহ কলিকাতার অনেক উত্তরে সমুদ্রে সংমিলিত ছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন, অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দ্বীপাকার বহুসংখ্যক চরের

অবস্থানে বিস্তৃত ছিল। গুপ্তপল্লী, চকচর, মধ্যে গুপ্তপল্লী, চকচর মধ্যে এঁড়োগ্রাম, প্রভৃতি নাম সে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গুপ্তপল্লীটি স্থানের উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ ভূমি তখন বা তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই উন্নত হইতেছিল; যেহেতু নদীগর্ভে অবস্থিত থাকাপেক্ষা এই স্থানের ভূমিভাগ অনেকটা উচ্চ ও জলোচ্ছ্বাস কঠিন আকারে দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও, তৎকালে ভাগীরথী নদী বর্ত্তমান মেঘু, অনেক স্থান যে নীচুভাবে অবস্থিত ছিল, সে পক্ষে অগ্রদ্বীপ নবদ্বীপ, চরদ্বীপ প্রভৃতি নামই তাহার সাক্ষ্যস্থল। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের [illegible] সময়, নদীগর্ভের আর সমস্ত স্থানেও সেই অবস্থা ছিল অর্থাৎ কোথাও জলপ্রবাহ থাকা সাধারণ নদীগর্ভের মত, কোথাও জলমগ্ন নয়, সে স্থানে নদীতে বাদাবন এবং যেখানে যে নদী নদীগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, সেখানেই তাহা পার্শ্ববর্ত্তী সমভূমি হইতে বিভক্ত ও বেষ্টিত হইয়া আছে। এ সকল অপেক্ষাকৃত বহু অনুমিত করে। তদ্ভিন্ন 'কাটী', 'দিয়া' ও 'ঘেষ' ইত্যাদি নামবিশিষ্ট গ্রাম ও নেপথ্য সকল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সপ্তগ্রাম তৎকালে। এই নদীপথ যদি সেকালে [illegible] লোকালয় হইয়া থাকে, তবে তাহা ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ সপ্তগ্রাম হইবে, এবং সপ্তগ্রাম যে বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। গ্রামের নদীটি যে তখনও [illegible] হয় নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৌড়েশ্বর রাজা যদি খুব কাছাকাছি হইতে সাধিক ৩ বৎসরের মধ্যে গঙ্গা [illegible] করেন, তাহা হইলে তাহাদের বাসভবনে খুব গোলযোগে ১৫৯ বা ৩০ [illegible] ঊচ্চ সম্ভ্রান্ত পরিবার [illegible] পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিকগণ, তাঁহাদের আধকার মধ্যে [illegible] স্থাপনের পূর্ব্বে ১৫৯ খৃষ্টাব্দে [illegible] তাহা ৩০ বৎসর [illegible] বসবাস করিবার জন্য, ইংরেজদিগকে ১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে, ইংরেজ গ্রামের একটীও পরিবর্ত্তন করেন নাই, সমস্তই উত্তর বঙ্গে, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরস্থ [illegible] পশ্চিম বঙ্গে, বিক্রমপুরের নিকট [illegible] দিক পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরভাগে। অথচ এখনকার [illegible]

---

১। [illegible] হইতেই [illegible] তৎকালে সোনারগাঁ হইতে ভাগীরথীর [illegible] নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু [illegible] ব্রাহ্মণদিগের যে ১৫ খানি ওলন্দাজী নাম্নি তাহার [illegible] নৌকাযোগে গত হওয়ার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেজন্যই, এখন [illegible] প্রয়োজন নাই। আজকাল যখন রেলওয়ে [illegible] স্থানে [illegible] তখন [illegible] [illegible] সকলে এক সপ্তাহ দিন, তাহাতে [illegible] [illegible] এই এক প্রমাণান্তরে [illegible] [illegible] পরিমাণ সেই [illegible] [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বলিতে গেলে, গাঙ্গেয় বদ্বীপের তুল্য রমণীয়, শিষ্ট নিবাসযোগ্য স্থান ঐ সকল স্থানের একটিতেও নাই; বিশেষ তায়-আবার গঙ্গার তীর। বর্দ্ধমান জেলার চৌংখণ্ড প্রভৃতি স্থানে পর্য্যন্ত এই ৫৫ পরিবারের কাহাকে কাহাকে বসান হইয়াছে, অথচ নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থান উপেক্ষিত হইয়াছে; বদ্বীপের অন্যান্য স্থানের ত কথাই নাই। এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা বলিতে হইবে! আমি উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, এ আশ্চর্য্য ঘটনার সেইরূপ কারণ ভিন্ন আর কিছুই নির্দ্দেশিত হইতে পারে না। বদ্বীপের কোনস্থান তখন শিষ্ট নিবাসোপযোগী থাকিলে, তাহাকে সদ্‌ব্রাহ্মণশূন্য রাখা কখনই গৌড়েশ্বরগণের অভিপ্রেত হইত না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থা যদি তখন এইরূপই ছিল, তবে তখনকার দেশ-বিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার একটু আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং কাজিনগড়ের পরেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। কাজিনগড় ঠিক কোন স্থানে তাহা হিউএন্‌সিয়াঙের ইংরেজী অনুবাদক ঠিকরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। বর্ত্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন যথায়, তাহারেই নিকটবর্ত্তী দেশকে কাজিনগড় বলিয়া অনুমান করা যায়। তথায় পর্ব্বতোপরি তেলিয়াগড় নামক প্রাচীন কেল্লা, গৃহাদির অনেক ভগ্ন ও সুন্দর ভগ্নাবশেষ এবং অনেক ভগ্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, এই কাজিনগড় ও কুশী নদীর পূর্ব্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ, ইহা লইয়া প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য।

এখানে হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দূরত্ব নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্‌সিয়াঙের অভিপ্রেত। বর্ত্তমান ঢাকা, পাবনা, রাজসাহী প্রভৃতি জেলা বোধ হয় সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই রাজ্য পদ্মার বর্ত্তমান স্থানের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবার কথা; কালে এই দক্ষিণাংশ, পদ্মা আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া যাওয়ায়, গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সেকালের সমতট রাজ্যের আয়তন এ কালে যে পদ্মার গতির দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন?—এ কালের বিক্রমপুরেরও পদ্মার গতির দ্বারা বহুল রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিণস্থ ভূভাগ, যে সমুদ্রতট বাহিয়া অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

সমতট এবং রক্তমৃত্তিকার পূর্ব্বদিক ভূভাগ নকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান তৎকালে কিরাতাদি বিবিধ অন্যান্য জাতির বাস ছিল।

তাম্রলিপ্ত রাঢ়ের দক্ষিণ হইতে এবং তাম্রলিপ্তীর পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া প্রাচীন রাঢ়ের। দক্ষিণে মেদিনীপুরের সীমা পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই ভূভাগ। ইহা কোন কোন সময়ে রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণাদি তিন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইত। উহার দক্ষিণ ভাগ-স্থিত বর্দ্ধমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। গৌড়নগর গৌড়ের প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই অন্তর্গত ছিল। পরে গৌড়নগর স্থাপিত হইলে ভাগীরথীর পশ্চিম, সমস্ত বঙ্গরাজ্য এবং কালে বর্দ্ধমান সমস্ত রাঢ়দেশই গৌড় বা গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। গৌড় নাম প্রবল হওয়ায়, কালে তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্র প্রভৃতি বিভাগ ও তাহাদের নাম সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

চারিশতাব্দীর পশ্চিম কুলজ্ঞ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে রাঢ় বঙ্গ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং হুগলীর জেলারও কিয়দংশ লইয়া তমলুকী প্রভৃতি রাজ্য। বর্ত্তমান তমলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। হরিবংশের বনপর্ব্বে ১১৪ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চাল নরপতিকে পরাজয়ের জন্য কাম্পিল্যে আসেন, তথা হইতে ভ্রাতৃগণ সহ সমুদ্রের ধারে ধারে গমন করিয়া, তাম্রলিপ্ত নামক দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। ঐ কালিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। এখানে বলা বাহুল্য যে হরিবংশের এই নির্দ্দেশ দ্বারা এমন কিছু বুঝায় না যে তাম্রলিপ্তি রাজ্য ছিল না। পরন্তু তখন না থাকিলেও, বারশত বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল তাহা নিশ্চয়।

উপরে দেখাগিয়াছে অবস্থান সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, তাহাই এখানে যথেষ্ট হইবে। এই সকল দেশাদির অবস্থান ইতিপূর্ব্বে "বাঙ্গালার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে" বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীএকেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

১। "স রাজসত্তমঃ কাম্পিল্যে পঞ্চালেষু বৃ।
সর্ব্বরত্নান্যাদায় পঞ্চালানাং মধ্যে চক্রে সমাবেশম্।
ততঃ সমস্তসৈন্যেন জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তস্মাৎ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত।
অতে কলিঙ্গে সৌত্যেষ বঙ্গ তাম্রলিপ্তকা নদী।"

সভাপর্ব্ব ১১০ অধ্যায়

---

# লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র।

যে শিশু ভাবি-জীবনে জয়যুক্ত, দুগ্ধপোষ্য অবস্থাতেই তাহার কতক চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়; যে গাছ বাঁচিবে, অঙ্কুরেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভাষার সুদূর অতীত আলোচনা করিলে আমরা এ কথার কতক প্রমাণ পাই। বঙ্গভাষার উৎপত্তির প্রাচীনতা যত দূরই হউক, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এই অভিনব ভাষার শৈশব জীবনে এক বৈদ্যুতিক তেজ—সজীবতার বিশিষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হয়। তখনকার সুপ্রচারিত কাব্য চৈতন্যভাগবত,* ইহার—

"নাচে বিশ্বম্ভর, সবার ঈশ্বর,
ভাগীরথী তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতূহলী,
সবেই ধরয়ে শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সুধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
শ্রীভুজ তুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
বলে হরি বলি॥"

ইত্যাদি স্থল আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তখনই বঙ্গভাষা কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল—সে সময়ের সুপ্রচারিত দার্শনিক গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত—নবীন বঙ্গভাষায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ব্যক্ত হইতে পারে, কঠিন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিবৃত করা যাইতে পারে, চরিতামৃত তখনই ইহা প্রদর্শন করিয়াছে। তখনই আমরা বঙ্গভাষায় গদ্যরচনার পরিস্ফুট চেষ্টা দেখিতে পাই।†

কিছুদিন হইল, আমরা গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত আরও একখানি গদ্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার নাম "আশ্রয় নির্ণয়।"১ ইহার আরম্ভ এইরূপ—

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩য় ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় "ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ" প্রবন্ধে অনবধানতাবশতঃ চৈতন্য-ভাগবত রচনা কাল ১৪৯২ শক নির্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার অনেক পূর্ব্বে, ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবন-দাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। পূর্ব্বে ইহার চৈতন্যমঙ্গল নাম ছিল। ১৪৯২ শকে চৈতন্যভাগবত নাম-করণ হয়। [জগানন্দের চৈতন্যমঙ্গল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

† আমরা অবগত আছি যে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৩০০ বর্ষের লিখিত একখানি বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থ পাইয়াছেন। ১১০০ সালের লিখিত আর একখানি গদ্য গ্রন্থ আমরা তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি।

১। ঐ নামে পদ্যেও অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ দেখিয়াছি।

"অথ আশ্রয় নির্ণয়। আশ্রয় পঞ্চ প্রকার। নাম আশ্রয়। মন্ত্রাশ্রয়। ভাবাশ্রয়। প্রেমাশ্রয়। রসাশ্রয়। এই পঞ্চ প্রকার। তথাহি রসভক্তিচন্দ্রিকায়াং।" এই স্থানে পঞ্চ আশ্রয়ের ব্যাখ্যা গদ্যে আছে। তৎপর—"ভক্তি বলি কারে? ভক্তি শ্রীগুরুর চরণ। ভক্তির অন্ত কি? নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় সদা সেবা। অন্ত ভাব। ভাব বলি কারে? সিদ্ধ দেহকে ভাব বলি। ভাবের অন্ত কি? সদা সেবা। সেবা কয় মত? সেবা দুই মত। সাধকরূপে বা সিদ্ধ রূপে। তথাহি"—এই স্থানে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যত্র—"অথ সিদ্ধদেহ। সিদ্ধদেহের আখ্যান তিন প্রকার। প্রবর্ত্তের আখ্যান। সাধকের বত্রয়ী আখ্যান। সিদ্ধের স্থায়ী আখ্যান।" অতঃপর দশা বর্ণন ও ইহা হইতেও কিছু নমুনা দিতেছি—"অহেতু নবন দশা-বড় বিষম। অন্তরে ব্যাকুল বাহিরে অচেতন। দশম দশা সহিতে পারি না। তেহি সে মরিতে চাহি তমালের তলে॥ এই দশম দশা শ্রীমতি রাধিকার। পূর্ব্বরাগ হৈতে নন্দের নন্দনে কিঞ্চিৎ রতি॥ রতি তিন প্রকার। সামর্থা। সামঞ্জসা। [illegible]। সামর্থারতির পাত্র শ্রীমতী রাধিকা। সামঞ্জসা রতির পাত্র রুক্মিণী। সাধারণী রতির পাত্র কুব্জা।" ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতে "কামগায়ত্রীর" ব্যাখ্যা যেরূপ লিখিত, ইহাতেও সেইরূপই লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থে একটী মাত্র ভণিতা আছে; তাহা পদ্যে লিখিত—

"শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদাম্বুজে করি আশ।
আশ্রয়-নির্ণয় কথা কহে কৃষ্ণদাস॥"

এইরূপ গদ্যে ও পদ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। যাহা হউক; পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তাগণ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। ঈদৃশ প্রতিভাশালী মহাজনগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা আজ বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড়াইতে পারিত কি না, কে জানে? এইরূপ উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতগণের রচনা প্রায়ই জটিলতাবর্জ্জিত—প্রাঞ্জল। অদ্য আমরা বৈষ্ণব-জগতে পূজিত এইরূপই এক গ্রন্থকারের পরিচয় দিব; ইনি গৌরব মহিমায় শ্রীরূপাদির সমকক্ষ ছিলেন; ইহার রচনাও যথা সম্ভব সহজ ও সরল। আমরা লোকনাথ গোস্বামী প্রণীত সীতাচরিত্রের কথা বলিতেছি। বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীচরিত একখানির অধিক দেখি নাই, সেই একখানিই সীতাচরিত্র।[২]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধান অনুসঙ্গী নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভু। যশোহরের তালখড়ি গ্রামবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী এই অদ্বৈতের আবাল্য সঙ্গী ছিলেন; পদ্মনাভ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন।[৩] বৃদ্ধবয়সে পদ্মনাভের একটী পুত্র জন্মে

২। সীতা-চরিত্র মুদ্রিত হয় নাই; আমরা যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা অতি প্রাচীন, কিন্তু লেখক তারিখ না দেওয়ায় প্রতিলিপির প্রাচীনত্ব বলিতে পারিলাম না।

৩। "পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী বিদিত সংসারে। প্রভু অদ্বৈতের অতি অনুগ্রহ যাঁরে॥
পরম বৈষ্ণব অলৌকিক সর্ব্ব কাজ। সর্ব্ব গুণে পরিপূর্ণ রাঢ়ী বিপ্রমাঝ"—নরোত্তমবিলাস।

ইহারই নাম লোকনাথ।[৪] লোকনাথের মাতার নাম সীতা।[৫] লোকনাথ বাল্যকাল হইতেই ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত। পিতার অভিপ্রায়ানুসারে লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন।[৬] অদ্বৈতের শিক্ষা ও সঙ্গ গুণে লোকনাথের হৃদয় কর্ষিত ও ভক্তিলতা শীঘ্রই প্রবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই সময়ে গৌরচন্দ্র প্রচারিত প্রেম-ভক্তিতে বঙ্গদেশে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, ভক্তির সুধাধারায় বিরসতা—কঠোরতা ভাসিয়া গিয়াছিল। লোকনাথ বালক হইলেও গৌরাঙ্গের প্রতি তাঁহার চিত্ত এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, একদা বশোহর হইতে একাকী নবদ্বীপে উপস্থিত হন; কিন্তু তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর "বিজয়ের" অবস্থা। লোকনাথ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তিনি লোকনাথকে অতি কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সঙ্গে রাখিতে দিলেন না, বিলুপ্ত তীর্থপ্রকাশার্থ তাঁহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন।[৭] বৃন্দাবনে তীর্থপ্রকাশের জন্য বাঙ্গালীর এই সর্ব্ব প্রথম গমন (১৪৩২ শক)। লোকনাথের বৃন্দাবন যাইবার প্রায় দুই মাস পরেই[৮] শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। লোকনাথ বৃন্দাবনে গেলেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সুমুখে বঞ্চিত হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এই জন্য তিনি বিরলে বসিয়া কখন কখন ক্রন্দন করিতেন।[৯]

লোকনাথ অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, অদ্বৈত শাখা গণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম আছে।[১০] অদ্বৈতের অন্যতম শিষ্য ঈশানদাসও স্বীয় গ্রন্থে একথা লিখিয়াছেন।[১১] কিন্তু মধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় প্রণালীতে দৃষ্ট হয় যে, লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য।[১২] বৈষ্ণব-সমাজ-সম্মত এ সকল "গুরু-প্রণালী"কে অপ্রামাণ্য

৪। "পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি॥"—ভক্তিরত্নাকর।

৫। "মাতা সীতা পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী।"—ভক্তিরত্নাকর।

৬। "লোকনাথ কহে আইসু পড়িবার তরে।"
"লোকনাথ কহে মোর পিতার সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত পড়ো কৃষ্ণলীলামৃত॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ।

৭। "যত দুঃখ যত সুখ জানে মোর মন। কেবল আছয়ে সাক্ষী কুঞ্জ বৃন্দাবন॥
প্রভাতে উঠিয়া তুমি যাহ বৃন্দাবন॥"—প্রেমবিলাস।

৮। "মধ্যে পৌষ মাস আছে মাস শুক্ল পক্ষে। তৃতীয় দিবসে সন্ন্যাস করিব যেন দেখে॥"—প্রেমবিলাস।

৯। "আর না দেখিব গোরা তোমার চরণ। রহিলাম মাত্র মাত্র করিয়া ধারণ॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু যে করিলা লীলা। লিখিত করিয়া মোরে এথা পাঠাইলা॥"—প্রেমবিলাস।

১০। "লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারী প্রভিত।"—চৈতন্যচরিতামৃত ১২ পরি।

১১। "এত শুনি লোকনাথ আনন্দিত হৈলা।
গঙ্গা গর্ভে মোর প্রভু স্থানে মন্ত্র নৈলা॥"—অদ্বৈতপ্রকাশ।

১২। প্রেমবিলাসেও শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লোকনাথের তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ ও তাঁহাকে লোকনাথের গুরু বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—"তাঁর মুখে শুনিলে সব হয়েত নির্দ্ধার॥"—প্রেমবিলাস।

বলা যাইতে পারে না। ইহাতেও দুই একটি কথা আছে; পরবর্ত্তী [illegible] ইহার সমাধান দেখিতে পাই। তাহাতে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতের আপনি [illegible] চৈতন্যদেবের ঐশী ক্ষমতা অসাধারণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। এই হইতেই লোকনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।[১]

সীতাদেবীর দুই স্ত্রী,—শ্রী ও সীতা। [illegible] ইহারা দুই বোন্ [illegible] ভেদের নমস্কারের উপর সীতা দেবীর অত্যন্ত অভিমান ছিল। লোকনাথ এই সীতাদেবীর জীবন সম্বন্ধে যেরূপটী ঘটনা সীতাচরিত্রে লিখিয়াছেন, [illegible] সীতাচরিত্রে প্রকাশ আপন পরিচয় সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই। যে সময়ে [illegible] বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতে তাহা হইতে তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া [illegible] কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পূর্ব্বে [illegible] তাঁহাদিগকে অনুমতি গ্রহণ করেন। এই অনুমতি-লাভকালে লোকনাথ [illegible] দীনা হইয়া তাঁহার বিষয় কোন কথা লিখিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন। তাই পাছে ছড়াইয়া পড়ে।[২] সীতাচরিত্রে [illegible] লোকনাথ সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে হয় নাই। এই লোকনাথ আপন গ্রন্থে আপন [illegible] যে কিছু বলিবেন, তাহা [illegible] বলা যাইতে পারে না।

সীতাচরিত্র অতি বৃহৎ গ্রন্থ নহে, মোটে ৩৭ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের শেষ এইরূপ—

"শ্রীচৈতন্য বিদ্যানন্দ পদে করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥
এমোদর ঘোষ এই ইহা সংশোধিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল যে কথিত।"[৩]

এই গ্রন্থে অবতারাদি [illegible] নির্দ্দেশ [illegible] করা হয় নাই, এক একটি অধ্যায়

---

১। "অদ্বৈত তাহি গুরু। অদ্বৈত [illegible] করি লোকনাথের কহে।
ইগনিত দৈন্য মহাপ্রভু শোচে।
প্রভু কহে আহে বিপ্রাজি সব জানেন।
লোকনাথে [illegible] তত্ত্বানুসন্ধান॥
এত করি ভিন্ন পত্রে গৌর বর্ণিয়া।
ঈশ্বরত্ব লোকনাথে জানাবার তরে॥ —ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ।

২। "অত্যন্তে [illegible] কথা পূর্ণিতে।
সর্ব্বত্র লিখিতে নাহি শ্রী নাম সীতা। —ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ।

৩। [illegible]

অন্তর্বর্ত্তি বিষয় গুলিকে এক একটি অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা যায়। সমস্ত গ্রন্থে এরূপ দশটি ভণিতা দৃষ্ট হয়; কিন্তু সেই ভণিতাস্থলে "ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ" লিখা আছে।

অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে সর্ব্বত্র একভাবে যেমন স্বীয় গুরু অথবা ভজনীয় দেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক ভণিতাগুলি লিখিত হইয়াছে, সীতাচরিত্রে সেরূপ একনিষ্ঠ ভণিতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কখন অদ্বৈতের নাম, কখন চৈতন্যপ্রভুর, কখন বা সীতাদ্বৈতের নাম স্মরণ করা হইয়াছে। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামস্মরণের কারণ ইহাই বোধ হয় যে, লোকনাথ শ্রীমহাপ্রভু ও অদ্বৈত, এই উভয় গুরুর নাম গ্রহণই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন। চৈতন্য ও নিতাই অভিন্ন বলিয়া উক্ত। তাই নিত্যানন্দের নাম গ্রহণও উচিত বিবেচিত হইয়া থাকিবে ‡। এ স্থলে কএকটি ভণিতা উদ্ধৃত হইল—

১ম ভণিতা— "কহে লোকনাথ দাস,
অদ্বৈত চরণে আশ,
সীতার চরিত্র রসখনি।"

২য় ভণিতা— "অদ্বৈত চৈতন্য পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথ দাস॥"

৩য় ভণিতা— "কহে লোকনাথ দাস; শ্রীচৈতন্যপদে আশ,
করি সেই ব্রজবাস॥"

৩য় ভণিতা হইতে আমরা তাঁহার ব্রজবাসে আসক্তির পরিচয় পাইতেছি। "সেই ব্রজবাস" হইতে একান্তিকতা ও প্রার্থনার ভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। নিয়ত ব্রজবাসী শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীকেও এইরূপই প্রার্থনা করিতে দেখা যায়। ব্রজবাস হইতে চ্যুত না হন, ইহাতেই এই ভাবই বোধ হইয়া থাকে।

বলিয়াছি, লোকনাথের রচনাপ্রণালী সরল ও অপেক্ষাকৃত দোষবিবর্জ্জিত। সীতাচরিত্র হইতে যে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দুই পাঁচটি অপ্রচলিত শব্দ যে ইহাতে মিলিবে না, ইহার কোন কারণ নাই। হইতে পারে তখনকার কালে ঐ সকলই পরিষ্কৃত শব্দ ছিল। দুই চারিটা উদাহরণ দেওয়া অনুচিত হইবে না। যথা—

"না ভাঙ"=প্রতারণা করিও না। "পাতিস"=চাহিল।
"নাবিল"=নামিল। "খেদাড়িয়া"=তাড়াইয়া।

---

* হইতে পারে আমরা যে খণ্ডিত পাইয়াছি, তাহা অসম্পূর্ণ। এই কারণে, বিশেষ অনুসন্ধানে, সীতাচরিত্রে এই দশটি ভণিতা অধিক পাইব, ইহা আশা করিয়াছি।

† "অভিন্ন চৈতন্য নিত্যানন্দ"—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

‡ পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা দ্রষ্টব্য।

"বিস্তর" = অনেক। "বাহুল্য" = বাৎসল্য।
"ঠারে" = যেমন। "ছেন" = হৈল।
"খাউতের" (অর্থ বোধ হইল না।) ইত্যাদি।

মুসলমানী দুই চারিটি শব্দের সমাবেশও ইহাতে আছে; যথা—

"মোকাম।" "সুবা।"
"লস্কর।" "জাহির।" "তাকিদ" ইত্যাদি।

সীতাচরিত্রে কোন কোন স্থানে পয়ারের চতুর্দশাক্ষরী রীতি রক্ষিত হয় নাই।

(ক) "মহেশ্বর বলেন তোমরা আইলে কোথা হৈতে।"

(খ) "লইতে আইলাম তাঁর পাদপদ্মের ছায়া।"

(গ) "গুমলিঙ্গের শিশু মোরা কোন জানে নাহি।"

(ঘ) "আমাদের নব পতিব্রতা নাহি আর।" ইত্যাদি।

এ স্থলে দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োগ না করিয়া, লোকনাথের সুস্পষ্ট রচনা হইতে গৃহীত কিঞ্চিৎ নমুনা প্রদত্ত হইল;—

"হরি হরি কি হইল কালের ফান্দ।
ছাড়ি মহীমণ্ডল, গৌরাঙ্গ সে কোথা গেল,
আচার্য্যের মাথে পৈল বাজ॥
নীলাচলে ছিল গৌর, সুখে আছিল মোর,
অনায়াসে হৈত দরশন।
কি বুদ্ধিয়া কিবা কৈনু কেনে পত্র পাঠাইনু,
হৈতে দুঃখ গেল বৃন্দাবন॥
মনে ছিল বড় সাধ, ধরি প্রভুর শ্রীপাদ,
নীলাচলে ছাড়িব জীবন।
ইহাতে বিপাক হৈল, আগে সীতা সহরিল,
এই সব বিধির ঘটন॥
অবৈত ধরণী কান্দে, কেহ কেহ নাহি বান্ধে,
ছাড়ি গেলা গৌরগুণমণি।
আর না দেখিব গৌর, শ্রীমুখাদ্ভুত সুন্দর,
না শুনিব ও মুখের বাণী॥
লটপর বেশ ধরি, নাচিবেন গৌরহরি,
নয়নেতে না হেরিব আর।
আমি সীতা অভাগিনী, ছাড়ি গেল গৌরমণি,
ভবনী হইল আন্ধার॥

দুই এলাইয়া কেশ, হইলেন যোগী বেশ,
দুনয়নে বহে সুরধুনী।
সোণার বরণ তনু, ধূলায় হইল রেণু,
ধূসরিতে লোটায় অবনী॥
সীতা বলে নবদ্বীপে, শচী আছে কোন্‌রূপে,
কেন বুঝি ছাড়িল জীবন।
দুঃখ মধুপুরে গেল, ব্রজপুর শূন্য হৈল,
তৈছে তেঁহ নদীয়া ভুবন॥
মুরারি চৈতন্যদাস, করে নক্সা ভূমিবাস,
মুরছিতে শ্রীমুখ সুন্দরে।
জয় গোবিন্দাদি দাস, সীতার চরণে আশ,
নিবসে চৈতন্য ব্রজপুরে॥" সীতাচরিত্র।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান-কাহিনী সীতাচরিত্রে আছে। সেই বিবরণ শ্রবণে অদ্বৈত ও সীতার বিলাপের পরটি উদ্ধৃত হইল। চৈতন্যমহাপ্রভুর জননী শচীদেবীর তিরোধান সম্বন্ধে কোন গ্রন্থেই কিছু লিখিত নাই,* কিন্তু উদ্ধৃত পদে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি সেই নিদারুণ সংবাদও শুনিবার পূর্বে জীবিতা ছিলেন। পরবর্ত্তী ঘটনার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর তিরোভাবের প্রসঙ্গও ইহাতে আছে। অতএব সীতাচরিত্র ইহারও পরে রচিত হয়।

লোকনাথ বৃন্দাবন হইতে এদেশে আসিয়া আর যান করেন নাই, কিন্তু সীতাচরিত্রে আছে, অধিকাংশ ঘটনাই শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পরবর্ত্তী, সুতরাং সে সমুদায়ের গুরুকথা অপরের নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া থাকিবেন; এখানি বৃন্দাবনেই রচিত হওয়া সম্ভব।

গ্রন্থকার অনেক ঘটনা বর্ণনা লিখিয়া শেষে কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতের উপর নির্ভর দিয়াছেন;—

"চৈতন্য ভাগবতে আছয়ে বর্ণন।
বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছে দাস বৃন্দাবন॥" সীতাচরিত্র।

সন্ন্যাস গৌরবে ও কৃষ্ণদাসের গুরুত্বের জন্য বৃন্দাবনদাসের উপরই নির্ভর, বিশেষ যখন লোকনাথ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপরও কোন স্থলে বিবরণ বর্জন করিয়াছেন,—

"ইহার বিস্তার যত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়া প্রচুর॥" সীতাচরিত্র।

* অবশ্য গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শচীদেবীর তিরোধান সম্বন্ধে যে শ্লোক আছে তাহার অর্থ এরূপ করা যাইতে পারে যে, শচীদেবী নিত্যধামে গমন করিয়াছিলেন।

[illegible] বিরচিত হয়, [illegible] চৈতন্যচরিতামৃতের [illegible] এই [illegible] [illegible] প্রকৃত [illegible] [illegible] [illegible]

# ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যাসুন্দর।

সম্প্রতি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত বিদ্যাসুন্দরের একখানি হস্তলিখিত পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। হস্তলিপি খানির বয়স একশত বৎসরেরও উপরে। উহার স্থান কোন স্থান কীটদষ্ট ও গলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সমগ্র অংশ উত্তমরূপে পাঠ করা যায়। লেখকের নাম গোপীমোহন গুহ, নিবাস আটীয়া পরগণার বাসাইল গ্রামে।

ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, উক্ত প্রসিদ্ধ গীতকাব্যের পঞ্চম মঙ্গলের শেষাংশে আরম্ভ হইয়া সপ্তম মঙ্গলের প্রথমাংশে শেষ হইয়াছে। মানসিংহের নিকট বর্দ্ধমানের পরিচয় প্রসঙ্গে ভবানন্দ মজুমদার উক্ত উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

"দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুমদারে,
হয়েছে পাতনগোই ভার।
দেখা হেতু দ্রুত, নানা দ্রব্য ডালি লয়ে,
বর্দ্ধমানে গেলা মজুমদার॥
দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে।
গঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুরঙ্গ দেখিলা গিয়া,
মজুমদারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুমদার, বিশেষ কহেন তার,
যেইরূপে সুরঙ্গ হইল॥"

গ্রন্থ শেষে অষ্টমঙ্গলায় দেবী মজুমদারকে কহিতেছেন—

পঞ্চমে শাপের ছলে,
এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়,
বর্দ্ধমানে গেলা আগুনারে।
মানসিংহ শুনি কথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
জিজ্ঞাসিল বিশেষ তোমায়।
ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিয়া তোমার মুখে,
আদ্য রস সুন্দর-বিদ্যায়।
পুঞ্জি মোর কালীরূপ, সুকবি সুন্দর রূপ,
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান॥

তাঁরা নাম মালিনীর,　　ঘরে উত্তরিল বীর,
তনিয়া বিদ্যার রূপগুণ॥
গাঁথিয়া দিলেক মালা,　　তুষে বিদ্যা রাজবালা,
দোহে দেখা রথের নিকটে।
মোর ঘরে সন্ধি হৈল,　　গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল,
বাপ কহিল কপটে॥
তে কুল সাগরে সাঁতার।
মোর অষ্ট মহাশয়,　　আসরণ ডুবে যায়,
তনিলে না হয় কারু মন্দ॥
পড়েতে সুন্দর কবি,　　বিদ্যা পণ্ডিতের ববি,
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপট সন্ন্যাসী হৈল,　　রাজার সাক্ষাৎ কৈল,
নানা মতে বিদ্যা করিল॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী,　　রাজা হৈল নরপতি,
কোটাল ধরিতে গেল চোর।
খাড়ীদেশে চোর ঘরে,　　রাজার সাক্ষাৎ করে,
সুন্দর ঐকিল দ ঘোর॥
সপ্তমেতে খাড়ি দিয়া,　　মালীরূপে দেখা দিয়া,
খাওয়াইনু কুমার সুন্দর।
বীরসিংহ পূজা কৈল,　　মোর অনুগ্রহ হৈল,
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে।"

মুদ্রিত অন্নদামঙ্গলের এই সকল অংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই এক অংশ। কিন্তু আমরা বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিপি পাইয়াছি, তাহাতে বিদ্যাসুন্দরকে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়। এক সময় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ অন্নদা-মঙ্গলের পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। "অন্নদা-মঙ্গল" রচনার সময় রাজসমক্ষে উক্ত উপাখ্যান উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেন। পণ্ডিতবর অবশ্যই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের এই হস্তলিপি পাঠে তাঁহার সেই অনুমান অকাট্য সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে।

আমরা যে হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দর পাইয়াছি, ভারতচন্দ্র প্রথমে এই বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অন্নদা-মঙ্গল রচনার সময় রাজার বা সাধারণের অনুরোধক্রমে প্রথম লিখিত বিদ্যাসুন্দর পরিত্যাগ করিয়া এবং স্বকপোলে

সন্নিবেশ করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের সহিত যোগ করিয়া দেন। উভয় বিদ্যাসুন্দরের ভাষা ও বিন্যাস বিচার করিলে এ বিষয় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। আমাদের আলোচিত হস্তলিখিত "বিদ্যাসুন্দর" প্রথমে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধে উহাকে আদি বিদ্যাসুন্দর শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছি।

ভারতচন্দ্রের এই আদি বিদ্যাসুন্দরে গণেশ ও কালিকার বন্দনা করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে জন্য বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনা করা হইয়াছে। গণেশ-বন্দনাটী ঠিক অন্নদা-মঙ্গলের গণেশ বন্দনার সহিত মেলে। কেবল একটি স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখা যায়—

মুদ্রিত অন্নদা-মঙ্গলে—

"আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর,
ইথে পার, সে পারিবে॥"

আদি বিদ্যাসুন্দরে—

"আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
নায়কের আশা পূর্ণ কর।
বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর, মোর বিঘ্ন দূর কর,
ইথে পার পাইব সঙ্গম॥"

গণেশ বন্দনাটি প্রথমে বিদ্যাসুন্দরেই ছিল, অন্নদা-মঙ্গল রচনার সময় কবি উহা অন্নদা-মঙ্গলের আরম্ভে স্থাপন করিয়া "নায়কের আশা পূর্ণ কর" স্থলে "অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিব" এই পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরে যে কালিকা বন্দনা ছিল, কবি অন্নদা-মঙ্গলে তাহা ব্যবহার করেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে কৌশিকীবন্দনা লিখিয়াছেন। বিদ্যাসুন্দরের কালিকা-বন্দনা এইরূপ—

"ভজহ কালিকা ভবা, কল্যাণি কলুষহরা
করুণা-সাগর-নাগরাণী।
মহাবিদ্যা মহামায়া, সচেতন-সর্ব্বকায়া,
সহেশ্বরী মহিষ-মর্দ্দিনী।
দুঃখিত জনের গতি, মহাসতী মহাসতী,
যুক্তকেশী দৈত্যবিনাশিনী।
বিজয়া বিমলা বিদ্যা, খড়্গি-বল্লিতা বিদ্যা,
বিশালাক্ষী বিপদতারিণী।

অম্বা অপরাজিতা, অভয়া অম্বিকা সীতা,
অম্বিকা অসুর-বিনাশিনী॥
আদ্যা সে কবির কন্যা, কলির কলুষহরা,
কহিতে কবির শক্তি কার।
শক্তি হীন দুর্মতি, না জানি ভকতি স্তুতি,
কি বর্ণিব চরিত্র তোমার॥

পাঠক দেখিবেন, বিদ্যাসুন্দরের সেই কালিকা বন্দনার ভাষা ভারতকালে কিরূপে বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ ফেরিঙ্গী প্রভৃতির বন্দনার ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত বিদ্যাসুন্দরের ভাষার সহিত মুদ্রিত বিদ্যাসুন্দরের ভাষার তুলনা করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন ক্রমপরিণতি কেমন হয়। কাব্যকুতূহলী বাঙ্গালীর ইহা দেখিবার ও শুদ্ধ করিবার ভার বটে।

আলেখ্য বন্দনার পর এইরূপে বিদ্যাসুন্দর রত্ন বর্ণিয়াছে—

"শুন রাজা মহামতি, নবদ্বীপ অধিপতি,
যদি ইচ্ছা করিয়া আপনে।
কালীপদ তুল্যপদ, বিতরণ,
শোন রাজা ভূপের উপাখ্যানে॥
কালীভক্ত গায়কের, গীতার যে মনে জন্মে,
কালী তাহে হয়েন সদয়।
বিদ্যার সুন্দর কথা, আদিরস গাথা,
বিদ্যাসের সম্ভোষ বাড়ায়॥
জ্ঞানীজনের জ্ঞানবৃদ্ধি, রসিকের রসবৃদ্ধি,
মূর্খের মূর্খতা নাহি রয়।
কালিকামঙ্গল পোতা, বিচিত্র পয়ার গাঁথা,
শ্রবণে বিনাশে যমভয়॥
সুজন সুবন্ধু, মহারাজ গুণসিন্ধু,
বসতি যাহার রাজীপুর।
কর্ণাট দেশের রাজা, ভূত সম পালে প্রজা,
ভুবনপ্রকাশ মহাশূর॥
মঙ্গলের সুখভোগ, পুণ্য প্রেম ত্রিসংযোগ,
ধর্ম্ম বিনা নহে নাহি যথা।
ঈশ্বর গায়ক মুখে, কবি কহিলেন সুখে,
কালিকামঙ্গল সহ পোতা।

আদিপর্ব্ব উপাখ্যান, শুনিলেন বিবরণ,
কুরুপাণ্ডবের উৎপত্তি।
মৃগ হেতু অরণ্যেতে, শাপবিদ্ধ যেন মতে,
হৈয়াছিল পাণ্ডু নরপতি॥
মৃগয়ার রসে, মুনি-পত্নী মৃগীবেশে,
তাহাকে মারিলা রাজা বাণ।
শাপ দিলা মুনিবরে, এ মতি ঘটিবে তোরে,
কামিনী-সংযোগে যাবে প্রাণ॥
দুঃখ ভাবি পরস্পরে, কাননে প্রবেশ করে,
সঙ্গে লৈয়া কামিনী যুবতী।
সপত্নীরে স্বর্গ চায়, অপুত্রের হেতু তায়,
নিষেধ করিলা ঋষিপতি॥
শুন রাজা মহাজন, তনয় পরম ধন,
অপুত্রের স্বর্গ নাহি স্থিতি।
অতএব লহ স্থানে, রহ পত্নীসনে,
ধর্ম্মদ্বারা জন্মিলে সন্ততি।
দেবঋষি বাক্য শুনি, শোকাকুল নৃপমণি,
কহিলেন সব বিবরণ॥
রাজার কাতর ভাবে, উপহাসে,
জন্ম হবে ক্ষেত্রজ নন্দন।
তবে রাজা কুন্তীস্থানে, জিজ্ঞাসিল দুঃখমনে,
বল দেখি কি হবে ইহার॥
রাজার আদেশে রাণী, আনিয়া আনি,
জন্মাইল সুত আপনার।
তুষিল নরপতি, শুনিয়া আকুল মতি,
অপুত্রের হেতু ভাবে দুঃখ॥
কি মোর সংসার যত্ন, অপত্য পরম রত্ন,
নাহি দিল বিধাতা বিমুখ।
দেখিয়া রাজার শোক, বিষাদিত সব লোক,
পাত্রগণ করে সান্ত্বনা॥
পুরোহিত বলে রাজা, করহ দেবীর পূজা,
পুত্র হবে তোমার কামনা।

| পত্রিকার নাম। | | সম্পাদকের নাম। | পত্রিকার নাম। | | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|---|---|---|---|
| সুধাকর | ... | আবদুল রহিম | ভূগোলবৃত্তান্ত | ... | অপ্রকাশিত |
| সুজনরঞ্জন | ... | নবীনচন্দ্র দে | সোমপ্রকাশ | ... | দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (৩৯) |
| সুজনরঞ্জন | ... | গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত | | | |
| সুধানিধি | ... | অপ্রকাশিত | সোদোসিনী | ... | অপ্রকাশিত |

(৩৯) খৃষ্টীয় ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাসে (১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ) পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। রচনার বিশুদ্ধতায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের রীতিসঙ্গত সমালোচনায় সোমপ্রকাশ পঁচিশটি বর্ষকাল বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশীয় ও য়ুরোপীয় সকল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদরে পূজিত হইয়াছে। সোমপ্রকাশ হইতে অনেকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিবার পদ্ধতি অবগত হইয়াছেন। এই সোমপ্রকাশের বিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শিতা ও যুক্তি-প্রয়োগ-কুশলতা বাঙ্গালা সংবাদপত্র মাত্রেই অনুকরণীয়। সোমপ্রকাশের প্রথম প্রচার বিষয়ে কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ। মাননীয় সার্ আশ্লি ইডেন নামে একজন সুবিদ্বান ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ঈষৎ বধির ছিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার তাঁহার বধিরতা বৃদ্ধি হয়। তিনি বৃত্তবিদ্যা হইলেও একমাত্র বধিরতাদোষে তাঁহার সিবিল কার্য্যকুশলতা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহার এই দেবজীবনোপায় করিবার নিমিত্ত দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সৃষ্টি করেন। সারদাপ্রসাদ সোমপ্রকাশের সম্পাদক হইবেন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার সহায় হইবেন প্রথমে এই স্থির হয়। ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাপচন্দ বাহাদুর সারদাপ্রসাদকে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে স্বীয় স্থলে বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন। সারদাপ্রসাদ বর্দ্ধমানে গমন করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড়ই কষ্ট হইল। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় ভাল সংবাদ পত্র ছিল না। এবং খাঁটি ভাল বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে এই অভিপ্রায় ছিল। এই নিমিত্ত তাঁহার সেই অনুষ্ঠান করা হওয়াতে তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজনকে ডাকিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত সকলেই তাহা মতে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্বে যে সংবাদ-পত্রের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইবে স্থির হইল। ও, স্থির হইল, ব্যক্তিগত সকলেই লিখিবেন, এই অবধারণ করিয়া সম্পাদকতার ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। কিছুদিন তাহারা সকলেই লিখিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে একজন করিয়া, প্রত্যেকেই অবসর গ্রহণ করিলেন। সমুদয় ভার বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের স্কন্ধে পতিত হইল। যখন সোমপ্রকাশের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ছাপাখানা কলিকাতা চাঁপাতলায় ছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে সোমপ্রকাশ বেলগাছিয়া হইতে ঐ মুদ্রাযন্ত্র চাঁদউপাড়ায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিজ বসতবাটীতে নীত হয়। সেইখান হইতে উহা ভবানীপুরে আনীত হইয়াছিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার জীবনকাল (১৮৮৯ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে উহার সে তেজ সে প্রতিভা বা সে রচনার মাধুর্য্য কিছুই নাই বলিলেই হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের একজন পুত্রগ্রহভাজন ছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উৎসাহে বাঙ্গালা ১২৮০ সালে এই প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সোম প্রকাশে বর্ষ সম্বন্ধে এক ভ্রমমূল অবধারণ উদ্ভাবিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল টেক্সটবুক কমিটির তদানীন্তন সেক্রেটরী বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে প্রস্তাব এ আলোচনায় যোগ দান করেন। স্বয়ং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐ সময় কালী কালপর্য্যায় প্রস্তাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ১৪ই মার্চ্চে মার্চ্চ লিটারেচর কমিটির [illegible] শাখা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পুস্তক চাহেন। তিনি সমাজ [illegible]

| পত্রিকার নাম। | সম্পাদকের নাম। |
|---|---|
| হালিসহর পত্রিকা ... | স্বপ্রকাশিত |
| হালিসহর প্রকাশিকা | " |
| হাবড়া হিতকরী ... | " |
| হিন্দুরঞ্জিকা। ... | (বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত) |
| হিন্দুহিতৈষিণী ... | হরিশ্চন্দ্র মিত্র, আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত, (২০) |
| হিতবাদী ... | কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৩১) |
| হিতসাধিনী ... | (বরিশাল হইতে প্রকাশিত) |
| হিতকরী ... | হরিদাস চট্টোপাধ্যায় |
| হিতৈষী ... | কালীচরণ মিত্র |
| হরিভক্তিপ্রদায়িনী | প্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী |

---

পাকিয়া রাখিতে ও সমান ভোগ করিয়া সোমপ্রকাশ প্রচার বন্ধ করেন। সদাশয় লর্ড রিপনের অনুগ্রহে মৃত্যুমুখ হইতে পুনরুত্থিত হইয়া সোমপ্রকাশ পুনর্জ্জীবিত হয় এবং তদবধি অদ্যাপি ইহা জীবিত থাকিয়া নানারূপে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছে।

(২০) আষাঢ় ১২৭১ সনের শ্রাবণ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত এরোদি গ্রামে হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির যত্নে হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার মুখপত্রস্বরূপ হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রথমে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন। ১২ বৎসর এই পত্র দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হয়। বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের পরলোক গমনের পর বাবু আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এক্ষণে ঢাকার হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা ও হিন্দুহিতৈষিণী উভয়েরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

(৩১) স্বর্গীয় বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রথমে ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হন। মত-স্বাধীনতা ও সত্যানুরাগ অনেক পত্রের তখন উহার নাম ছিল না করিতেন। পরে ইহা হস্তান্তরিত হইয়া প্রথমে বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ মিত্র, পরে এখন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিতবাদী বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র।

[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible]।

মালিনী-মদনে জোর করিয়া অন্নদা-মঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া দিলেও উহা ভাল হয় নাই। কৈলে তল নিন্দনের আর কিছুই হিসাবে। অন্নদা-মঙ্গলের উপাখ্যানের অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেবল বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে অন্নদা নামের পরিবর্ত্তে কালী নাম রহিয়াছে। কবি স্বয়ং এ ত্রুটি বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সে কারণেই হউক সংশোধন করিতে পারেন নাই। তবে কতকটা সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য দেবীর মুখে একটা কৈফিয়ত দিয়াছেন—

"সভাসেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,
রচাইনু সুন্দর-সুন্দরে।"

অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের প্রেমভাগে দেবী, বিদ্যা ও সুন্দরকে বলিতেছেন,

"তোরা দোঁহে রহ কালী, শ্মশানেতে ভূতনে আসি,
আমার মঙ্গল গাহিবা।
রঙ্গ হৈহ, পরিহাস, এবে চল স্বর্গবাস,
নতি মতে আমারে তুষিবা॥"

কে কাহাকে কি অভিশাপ দিল, তাহার কোন সঙ্গতি অন্নদা-মঙ্গলে নাই। প্রতি ছোট, ভবানন্দ ইন্দ্রাণীর শাপেই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের আদ্যোপান্ত বিবরণ, আমরা জানিতে পারি নাই কেবল বিদ্যা ও সুন্দরের শাপের কথা। এখানে প্রত্যেক প্রেমে শাপের নাম করার কেমন অসঙ্গত হইয়াছে। কবি যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় ঠেকিয়া বা লাগে পড়িয়া একটা অর্থহীন উপাখ্যান অন্নদা মঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া দিয়াছেন। ভবানন্দের মুখে ইতিহাস-রূপে বর্ণনা করায় উহা যে অন্নদা মঙ্গলের অঙ্গ নহে, তাহা স্পষ্টই দেখান হইয়াছে। কবিও আবার অষ্টমঙ্গলার আদিত্যে রবিবার কবি একটা গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

হস্তলিখিত বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি নাই। উহাতে বিদ্যাসুন্দরের প্রেমবিবরণ। আদ্যোপান্ত উহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। উপসংহারে কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধু, সন্তান লাভের জন্য কালীপূজা করিলে, দেবী সন্তুষ্ট হইয়া বরদানাদেশের বর দিলেন। কিন্তু দেবী বরদানে বর দিয়া কাহাকেও হয় সন্তান পরিত্যাগ করিবেন এমনও বর দিয়াছিলেন—

"হরিষে মঙ্গলা দিতে, আবে রাণী নিজ চিতে,
হেনকালে দেবী বৈদিল।
ধন্য সাধু সাধে বাদে বসিল এক ঠাঁই,
আসিয়া রহিল উপস্থিত।
নাহ দেখি উচ্চাসনে জলদ ভৈরবীগণে
সঙ্গতে করিয়া বীণা।

এথা দেবীর প্রায়, চলিল যমুনা তীর,
যথা শিবের নিকেতন।
যোগাসনে আছে হর, নাহিক আছিদোসর,
যোগবলে তাজিল জীবন।
কন্যার তপের তেজে, কাঁপিল কৈলাস যে,
হৈল দুই ঈশ্বর ভেটনী।
যে দেহে আছিল তাঁই, মনে আইল বলি পাঁই,
অন্নদায়ে না হৈল উথান।
দুষ্ট হেতু দুঃখদল, ঘিরিয়া লৈয়াছে বল,
দূর পাইয়া দেবী মনে মান॥
এথাকিলে যোগানন্দ, ও কর্ম করিলা মন্দ,
জানিবে না যাইবে আমাকে।
তাই যোগীন্দ্র হৈল, তব পাদপদ্ম বলে,
গঙ্গাকে আনি এল ভরে॥

দেবী বলে নরোত্তম, না জান দেবের মর্ম,
আমাকে করিলা অপমান।
তার পাইয়া মহাতেজ, কাঁপাকে যে দেব দিবে,
সেহি হেতে পাইবা অপমান॥
এত শুনি যোগানন্দ, মনে ভয় হইল মন্দ,
দেখে লাজ ভইল নিতুল।
কাম রোষে হৈল নাশ, মনে অতি পরিতাপ,
দেহ ত্যজি হৈল দেব দূত॥
অন্নের তপের বলে, যোগ আরাধনা ফলে,
পেলেছিলাম শিবচরণ।
ধনলী পর্বত যাবে, বসি হৈলাম মাপাপাবে,
সুখে তাহে করিতে পূজন।
হৈমবতের বাক্য শুনি, সত্যপথে নারায়ণী,
বসে পূজা তাহিয় লোক।
মহীতলে বিহরিয়া, আমি পূজা প্রকাশিয়া,
পূজিব আনিয়া নিজলোক॥

তোর বচনের ভাতা, মুখমোকলাদ-মাতা,
কেমনে চরণ ছাড়ি যাব।
যদি আজ্ঞা দিলা মোরে, যাইতে পরীর লোকে,
তবে আমি কোথায় রহিব॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী, এ তিন ভুবনে জানি,
তাতে আমি অধম দুর্ম্মতি।
যদি মোরা যাব লঙ্কা, চরণে বান্ধিবা তঙ্কা,
অবশেষ আর নাহি গতি॥
নির্ম্মাল ভরতি দাসে, কাটি পাশ বন্ধনে,
রাতুল চরণে দেহ স্থান।
দেবী বলে যাছা অরে, বাণ্ড শুনসিদ্ধুপুরে,
পাবা ভক্তি- মকতি নিদান॥
যোগনন্দী ধর্ম্মগুরু, বীরসিংহ নৃপ পুরু,
জন্ম লইয়া তত্ত্ব ভগবতী।
আমার কৃপায় রামা, ভুবনমণ্ডলে তোমা,
ঘুষিবেক সবে যেমতি॥
যোগানন্দ প্রতি হবে, মর্ত্যে তবে বিহারিবে,
ভক্তি দেহে আমার পাইবা।
তোমার তোমা বাপ দিল, তাহে ভাগ্যবতী হৈলা,
রাজপুত্র মাতৃভক্তা হবা॥'

এই যোগানন্দ ও যোগবতীর মর্ত্যে সুন্দর ও বিস্তারিত বৃত্তান্তই, বাল্মিকীর মূল রামায়ণ ও পুনরায় স্বর্গে গমন বর্ণনাই বিদ্যাসুন্দর বা কালিকা-মঙ্গল। অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কবি এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত ছাড়িয়া দিয়া বীরসিংহের রাজধানীতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অন্নদা-মঙ্গলে মিলাইবার জন্য কালিকা-মঙ্গলকে বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই অনেকটা রাজার কালীপূজা, বরলাভ, ফুলবেড় জন্ম, বিদ্যার জন্ম, রোষ ও যোগবতীর মর্ত্যে আগমন প্রভৃতি বহু বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেক স্থল বাদ দিয়া বসিয়া চাকচিক্যশালী এ রামায়ণ কথা হইয়াছে। সংস্কৃতে বসিতে গেলে অন্নদা-মঙ্গলের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের প্রথম লিখিত খানি অনেকটা এই রূপ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইত। সংক্ষিপ্ত ও অঙ্গহীন হইলেও ইহা বড়ই মনোহারী, গল্প বিন্যাসে ও ঘটনাবলীর গতিই বড়ই সুন্দর হইয়াছে। পাঠক বিদ্যাসুন্দরের নূতন ও মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া ইহার অসম্পূর্ণতা বা সংক্ষিপ্ততার কথা ভাবিতে অবসর পাইবেন না।

[illegible] বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের [illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] হইতে পারে, কিন্তু পাঠকসমাজে ইহার যেরূপ আদর [illegible] তাহা [illegible] নিকট এক অতি অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা কেবল পাঠ [illegible] এই গ্রন্থখানি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানেই পরিপূর্ণ [illegible] ইহার অন্যান্য কবিত্বময় অংশ সমূহে সমধিক প্রকটিত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের স্বরচিত গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া কবিবরাকরকে

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ। বিরচিল গুণাকর নিপুণ হয়ে খাঁ।
তাহার রচিত গ্রন্থ আছে নাই নাই। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দেখা পাই॥
বেতে ভারতচন্দ্র নরদামনতে। রচিলেন উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দরে॥

এই পদ হইতে বিদ্যাসুন্দর রচনা সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। ইহাতে এই কথাটি মাত্র বুঝা যায় যে প্রথম রচিত বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীলতা দোষ, সৃষ্টি অল্প পরেই ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলে [illegible] সুন্দর পূর্ব্বরচিত বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা [illegible] হওয়াতে তাহা বিদ্যাসুন্দর [illegible] প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। ক্রমে লোকে উহার কথা একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী কবি উহার উল্লেখ করেন নাই।

পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য আমরা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা অন্নদামঙ্গলের যে যে বিষয় অধিক আছে, তাহার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

বিদ্যা ও [illegible] বিবাহবিষয়ক কথোপকথন।

[illegible] শুনিলে এ সব কথা আমার বচন। তুমি কন্যা হইতে মোর দুঃখ বিমোচন
বিবাহে যে হেন মাত্র বলে আমারি। সেই দেশে আছে বহু [illegible]
যখন তোমার ইচ্ছা বলে হয় মন। আমা আমিব সেই হরিহর নন্দন।
এই মতে বিদ্যাসনে বিচারে নরপতি। বিচারে হইবে যেবা বিদ্যা গুণবতী।
[illegible] কহিছে বাক্যে আছে নিরূপণ। অন্যথা কহিলে বাক্য হয় খণ্ডন।

[illegible] শুনি সিংহ নরবর, [illegible] ভাবে মন,
গুণবতী যেন বিদ্যাবতী।
জানে বিদ্যা মনে মন কি বাসিব নিরূপণ,
এ বেড়ে পুরুষ নরপতি।
বিদ্যের নিধি কবি, বোঝে বিদ্যাসুন্দরী,
কি কব মোর কপাল মন্দ
হেন পুরুষ বিনা মরি, মোর যোগ্য সুখের
আছে যে বিধি নিবন্ধ,

ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রমত, বিচার করিলাম কত,
বিচারি করিয়া কৈলাম সার।
প্রতিজ্ঞা করিলাম মনে, পণ্ডিত সকল সনে,
বিচারে যে জিনিবে আমার॥
শুন রাজা নরপতি, বিদ্বান্ বরিব পতি,
অবিদ্বানে নাহি প্রয়োজন।
দেখিব শাস্ত্রের নীত; শাস্ত্রে যার নাহি *
সেহি অন্ধ থাকিতে লোচন॥
মূর্খ জীব যার পতি, সে নারীর অধোগতি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় পতিযোগে।
পতি পাপে হয় পাপ, জীবনে না ঘুচে তাপ,
অন্তেতে নরক ভোগ ভোগে।
পণ্ডিত যাহার পতি, সতত ধর্ম্মেতে মতি,
মূর্খের দূরে সর্ব্ব দোষ।
মূর্খের জীবন জরা, কেবল * ভরা,
যাবত জীবন অসন্তোষ॥
প্রতিজ্ঞার কথা জানি, পণ্ডিত সকলে *
লাজে রহে না কহে বচন॥
কন্যার বচন শুনি, চিন্তাযুক্ত নৃপমণি,
আসিয়া মিলিল ভট্টগণ॥"

প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। এজন্য আমরা আর উদ্ধৃত না করিয়া, সংশোধন করাতে কালিকামঙ্গলের (আদি-বিদ্যাসুন্দরের) সহিত অন্নদামঙ্গলের বিদ্যাসুন্দরের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার একটু আদর্শ দেখাইয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব।

হস্তলিখিত গ্রন্থের পাঠ।

"মালিনী বলিছে বাপু তোরে দেই খোটা। যত টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোটা॥
তবে সে প্রত্যয় হয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইলাম দুইকাহন ভাগ্যে-বেটা ভাঙ্গী॥
সেরের কাহন দরে কিনিল সন্দেশ। আনিয়াছি আধসের পাইয়া বহু ক্লেশ॥
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি। অন্তলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি জানি॥
অগোর চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল। জয়িত্রী এলাচ তাহা না মিলে সকল॥
দুই পণে আনিয়াছি একপণ পনি। আমি যাহা পাই-তাহা নাহি পাও আন॥
অবাক্ হইলাম হাটে দেখিয়া ওবাক। নাহি বিনে দোকানীর নাহি সরে বাক্॥
কত কষ্টে আনিয়াছি আম্র গোটা নয়। ফিরিয়া না কহে মূল যে কহে সে নয়॥

হাটেতে আসিল যত নিজ নদীপার। আমি নিজ নাহাত [illegible]
দুই ঠেমারি গাম বাছা দুই চারিগা। শেষে না লইল কড়ি আমিল চাহিয়া।
[illegible] আসে বাড়ি। তুমি গাড়ি খড়ি। সেই মাঝি বল নাম কড়ি কড়ে দুই।
এমনি বাড়িতে দেখি উত্তর উত্তর। এমনি বাড়িতে দেখি উত্তর উত্তর
এত দূর মহাকবি মহাভাগবত। এত দূর দেখিয়াছি চারিম ভারতচন্দ্র॥

মুক্তিত গ্রন্থের পাঠ :

"যেমাতে কড়ির খেয়া বুঝায় বাটনি। আমা [illegible] নিল কড়ি নিয়া কেহ বাহুনি॥
পাছে বল বুলপেয়ে মাগী দেয় খোটা। সাত টাকা গিয়াছিলে সবগুলি খোটা॥
যে [illegible] হেরেছি ঘাটে কৈতে না জুয়ায়। এ ভাঙ্গা উচিত দেওয়া কেবল জুয়ায়॥
তবে যে প্রত্যয় নহে সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি। ভাঙ্গাইনু দু কাহনে ভাঙ্গে যেন ভাঙ্গী॥
মোর। কালি ঘরে কিনিনু সন্দেশ। আনিয়াছি ও ধরের খাইতে মন্দে॥
আউলে ওলে যেন পানিয়াছি চিনি অল্প লোভে ভরা দেয় ভাঙ্গে আমি চিনি॥
[illegible] কলা চুনা দধি ছানাবড়া কড়ি দেখিনু হাটে নাহি যায় ধরা॥
তত কটে দুগ্ধ পাই সারা হাট ফিরা। সেই কড়ি সেই দুগ্ধ সাঝি বল ফিরা॥
ই গো ঠাকুরাণী ঠাকুরাণি পান। আমি নেই তেহ [illegible] নাহি জানি॥
সাঝি বলে মোর [illegible] না [illegible] ঘর।
হাসেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপার। জানা বিনা কাহার শকতি জানিবারে॥
আটপণে আনিয়াছি কাঠি আর মাটি। কষ্টলোকে কষ্ট বেঁচে তাহে নাহি ভাবে॥
পুন হয়েছিনু যাহা দুগ্ধ চেয়ে চেয়ে। দেখে না কুলায় কড়ি আমি যায় ধেয়ে॥
খেয়া কড়ি বুঝা যাহা ভয়ে খড়ি পাতি। সাঝি বলে মাগী খাইয়াছে কড়ি পাতি
মহাকবি দেখিনু দ্বিতীয় নাহি তত। বুঝিনু যাহার দয় উত্তর-উত্তর।
ভণি ভারতচন্দ্র রায় ভারত ভারত। এমন না দেখি আর চাহিনু ভারত॥

শ্রীবসিকচন্দ্র বসু।

# শ্রীমৎ জয়ানন্দ ও তাঁহার গ্রন্থ

[illegible] অনুষ্ঠানে [illegible] প্রেম প্রচার [illegible] ধর্মসভার [illegible] বৈষ্ণবগণের [illegible] তাঁহারা [illegible] করিয়াছিলেন। এখন অনেকেই এই [illegible] বাঙ্গালার বাহিরে [illegible] বাস করিতেছেন, বাঙ্গালার [illegible] তাঁহারা [illegible] সেই পূর্বে [illegible] কাহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই; কিন্তু [illegible] তাঁহারা [illegible] বাঙ্গালা [illegible] পড়িতে পারিতেছেন [illegible] সেই [illegible] জয়ানন্দের [illegible] 'চৈতন্য-মঙ্গল'।

[illegible] এই চৈতন্য-মঙ্গলের [illegible] সংবাদ [illegible]। [illegible] বিষয় [illegible]। পুথির মধ্যে [illegible] ১৮ হইতে [illegible] পত্র নাই, [illegible] পত্র আছে। [illegible] ৭৮। [illegible] হইতেছে, [illegible] এক [illegible] হইয়াছে। [illegible] অনুসারে [illegible] সংগ্রহ [illegible]।

[illegible] শেষে [illegible] ও [illegible] "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [illegible] পুস্তক [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] [illegible] ১৮১৯ [illegible] চৈতন্য [illegible] এক [illegible] শ্রীবাসাদি [illegible] পুস্তক [illegible] চৈতন্য [illegible] ১৩ [illegible]

[illegible] [illegible] কলিকাতা [illegible] হইতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] করিলে [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [

পণ্ডিত পুথি হইতে যে সকল বিষয় অপরিষ্কার বা অভাব দৃষ্ট হইবে, এরূপ সম্পূর্ণ পুথি পাইলে তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারিবে।

কিন্তু আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই আমাদের আগ্রহ ও উৎসাহ এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে সাধারণের নিকট সেই সকল প্রয়োজনীয় কথা গুলি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এরূপ অনেকের বিরক্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যানুরাগী, বৈষ্ণবতত্ত্বানুসন্ধায়ী এবং পুরাতত্ত্বপ্রিয় মহাত্মাদের কতকটা তৃপ্তিকর হইবে ভাবিয়াই আজ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে সাহসী হইয়াছি।

পুথিখানি যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে আমরা এই কএকটী বিষয় জানিতে পারিব।

১। গ্রন্থকারের পরিচয়।

২। কবির পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষায় রচিত যতগুলি প্রধান প্রধান গ্রন্থের তালিকা।

৩। তৎসময়ের শ্রীহট্ট ও নবদ্বীপের অবস্থা

৪। চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ যে সকল বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই, তাহার কতক কতক পরিস্ফুট বর্ণনা।

৫। তৎকালীন বঙ্গভাষার অবস্থা।

৬। প্রবিষ্ট কবিত্বের পরিচয়।

এই কএকটী মুখ্য বিষয় ব্যতীত ছোটখাট আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই খণ্ডিত পুস্তকে দেখিতে পাই। সেই জন্যই এই পুথিখানি আমাদের আলোচ্য।

## কবির পরিচয়।

কবি জয়ানন্দ গ্রন্থের নানা স্থানে, এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

১। শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ গৃহবাসে॥
তাহিআ নাম ছিল মাএর সভাহিতা বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে॥
জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র সোনাজি। পরম ভাগবত উপমা দিতে নাজি॥
পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য পুরুক লিখনে। আপনে চিন্তাএ গাঁই বড় শিষ্যগণে॥
বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র ওপজার কলে। জয়ানন্দ জন্ম হৈল চৈতন্যমঙ্গলে॥

(২য় খণ্ড। ২ পৃষ্ঠা। ৩ ও ৪ পংক্তি)

২। "শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে। জয়ানন্দের জনম হৈল সে নিবাসে॥
তাহিআ নাম ছিল মাএর সভাহিতা বাসে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে"
না জোদনী বাষে নিত্যানন্দের দাসী। তার গর্ভে জন্মিলা চৈতন্যানন্দে ভাসি॥

---

১। পুথিখানিতে কোন পৃষ্ঠাঙ্কপাত নাই, কেবলমাত্র সেই সকল খণ্ড আলোচ্য বলিয়া উহাদের নামের অধিকারে কোন পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

ভক্তি লেখা পাঠে চৈতন্যে অনন্য ভক্তি।

জগন্নাথ মিশ্র যেই রাঢ়ি উদ্ধারিলি। ঈশ্বরের ভক্তি যে ত জগত প্রচারে॥
যার দেহ ঈশ্বরের বিগ্রহ-স্বরূপ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিদিত সে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
তার ঘরে ইচ্ছিলা আনন্দ করাইতে। অবতরিলা প্রভু ছাড়িয়া পৃথিবীতে॥
দেউটা চৈতন্যমিশ্র কীর্ত্তীর ধ্বজ। জোড়ে ভাই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরি আখড়া।
নন্দনাচার্য্য যে বনমালী উপাসক। তান ঘরে জগন্নাথ চৈতন্যগুরু॥
দুই দুই বৈরাগ্যধর্ম্ম কাহা দেখা। গাইব সংক্ষেপে যত মনে আছে লিখা॥

টিপ্পনী। চৈতন্য গদাধর পরিষদ। বৈরাগ্যধর্ম্ম যাহা দ্বিজ গাত্রে [illegible]।
৩। জগন্নাথের বাপ পুরন্দরমিশ্র পোকাজি। চৈতন্যচরণ ধ্যান হৃদয়েতে পাজি॥
টিপ্পনী। চৈতন্য গদাধর পাদপদ্ম। আনন্দেতে তীর্থধর্ম্ম গাত্রে জন্মিল॥৫৫১১৩৩।
৫। চৈতন্য চন্দ্রিল পৌষ পূর্ণমাসে। শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যবিশেষে॥

"তুলসী, তাঁহ পাশা, দুহিনা অনুরাগিয়া
সঙ্গে মঙ্গল গায়া ধাই।
রেবতী বারদা দিয়া, মাতিনে যাইয়া দিলা,
সভেষ্টে রহিলা সর্ব্বরী।
আজিঞা দেবনাথ, শ্রীবৈষ্ণব সাথে,
বাদ্যে নৃত্যে মগন।
গৌষ্ঠী সাথে তাহে, ভক্ত দিগম্বরে,
অপরাহ্ণ করিল গমন।
সমস্ত সন্ধিকটে, যুক্ত এক গ্রাম বটে,
নাম খড়দহ আর কয়।
তাহে সুমুকি মিশ্র, গোপীজিয়া পূর্ব্বে শিষ্য,
তার ঘরে করিল বিজয়॥
তাহা সঙ্গে তুলী, অনন্ত আই তুলী,
এহিমতে যাইল তার ঘরে।
গোপী ভেটিয়া তারি, নমিয়া মহিমা পুরী,
সাক্ষাৎ উত্তরিল, শিঙ্গা॥
আজ্ঞা দিজবরত্ত [illegible] নমস্ত দুই,
সভাহে জগন্নাথ শিশু।
চৈতন্যে গোপীবর, পুরাণ মহত্তর,
[illegible] [illegible]

---

[illegible] পাঠ। [illegible] এই একটি কবিতা [illegible]

শ্রীবীরভদ্র গোস্বামিনে পদাব্জে [illegible]
শ্রীরামচন্দ্রায় গোপালিকে [illegible]
[illegible] পণ্ডিত গোস্বামিনে [illegible] দদৌ
শ্রীচৈতন্য-দাস্য কিমু [illegible] ॥ ২৩২
প্রতিগ্রাম গোস্বামিজন্য পাদোদক প্রসাদে।
পণ্ডিত গোস্বামির কৃপা চৈতন্য আশীর্বাদে।
ঘাট মুরুক্কিমিশ্র [illegible]
অমানন্দের মন হৈল চৈতন্য [illegible] ॥ ২৩৩

উপরে উদ্ধৃত কবিতাগুলি হইতে আমরা কবির এইরূপ পরিচয় পাইতেছি,—

ভবিষ্যতে আক্ষণ্যবংশে তখনকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া, ধার্ম্মিক বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই বলিয়াই তাঁহার [illegible] ঘটিয়াছিল। [illegible] পিতার নাম শ্রীমুরুক্কিমিশ্র।

তাঁহার জ্যেষ্ঠার নাম বৈষ্ণব মিশ্র ও খুড়ার নাম রামানন্দ মিশ্র। [illegible] ইনি কবির খুল্লতাত জ্যেষ্ঠা ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বলা নাই। সেই রামানন্দের পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ তাঁহার [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন।

পরিচয় হইতে মোটা খুটী কথা পাওয়া যায়, যে বংশপরম্পরায় [illegible] সেই বংশে [illegible] ভক্তির অভাব হইল না। [illegible] মুরুক্কিমিশ্র রামানন্দ মিশ্রকে [illegible] পিতা চৈতন্যদেব [illegible] মাতা নিত্যানন্দের [illegible] হইলেও [illegible] জ্যেষ্ঠারা চৈতন্যকে ভক্তি করিতেন না। [illegible] পরিবারে [illegible] চৈতন্যপার্ষদে ও চৈতন্য-প্রেমে [illegible] মুরুক্কিমিশ্রের বংশ আছে। [illegible] চৈতন্যচরিতামৃতে মুরারি গুপ্তার বর্ণনে মুরুক্কিমিশ্র হৃদয়ানন্দ-চৈতন্যের সাক্ষাৎ এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

পরমানন্দ জননীর নয়ন হইয়া বাঁচিয়া না। মুরুক্কিমিশ্রের বংশের সাধ্যসাধনা [illegible] হইল। প্রথমে পিতা মাতা ভাবিয়া নাই যে এ সন্তান বাঁচিবে, তাহাদের মুখোজ্জ্বল করিবে। সেজন্য এমন স্থলে যাহা হয় তাহাই হইল। যে কারণে চৈতন্যদেবের 'নিমাই' নাম রাখা হইয়াছিল, সেই কারণে কবির প্রথম 'ওইসা' নাম রাখা হইল। ওইসা কিরূপে পরমানন্দ হইল? তাহা কবি নিজেই বলিয়াছেন।

---

[illegible] কবির [illegible] পদে [illegible] আপনার দিয়া [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় [illegible] উপাধি সৃষ্টি [illegible] উপাধিই [illegible] লিখিয়া [illegible] কবিরাজ।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে গৌড়ীয় ফিরিয়া আসিতেছেন। [illegible] ইনি ঝামাটপুর গ্রামে [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইলেন।* অধিক রাত্রি বোধহয় হয় নাই বলিয়া পরিতোষপূর্বক চৈতন্যদেবকে ভোজন করাইলেন। এই অবস্থান কালে গৌরাঙ্গদেব [illegible] করিয়া 'জয়ানন্দ' নাম রাখিলেন। জয়ানন্দ চৈতন্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার মাতাপিতা কে? তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে না। তবে "অভিরাম গোপীজির পাদোদকাস্বাদে" এই ভণিতা অনুসারে যেন অভিরাম গোপীজীকে তাঁহার মন্ত্রগুরু বলিয়া বোধ হয়। বাদ সিদ্ধানন্দের পুত্র বীরভদ্রের প্রসাদে এবং গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন।

কোন্ শকে জয়ানন্দের জন্ম ও কোন্ শকে চৈতন্যমঙ্গল সম্পূর্ণ হয়, এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থে কোন কথা লিখিত নাই। তবে অন্যান্য রচনাবলী ও তৎসময়ের বৈষ্ণব সাহিত্যের সাহায্যে আমরা মোটামুটী কালনির্ণয় করিতে পারিব।

চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস অবস্থায় নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমন করেন, তৎপূর্ব্বেই জয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থ রচনা হইতেই জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন-

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতার। — "অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহার॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। — চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। — নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিলা সন্ন্যাস। — অষ্টচল্লিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। — কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে। — কৃষ্ণপ্রেমলীলামৃতে ভাসাল সকলে॥"

চৈ-চরি ১ম ব ১৩ পরিঃ।

কবিরাজের উক্ত বচনানুসারে জানা যাইতেছে, ১৪০৭ শকে মহাপ্রভু গৃহ ত্যাগ করেন, তৎপরে তিনি ৬ বর্ষ অর্থাৎ ১৪০৭ শক পর্য্যন্ত একবার নীলাচলে, একবার গৌড়ে, একবার বৃন্দাবন, একবার দক্ষিণাপথ,- এইরূপে নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। এরূপ স্থলে তিনি ১৪০১ শকের পূর্ব্বে জগন্নাথের পিতৃনির্দ্দেশ ঝামাটপুর গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে জয়ানন্দের জন্ম হয়। যখন মহাপ্রভু প্রথম জয়ানন্দকে দর্শন করেন, তখনও তাঁহার জয়ানন্দ নাম হয় নাই, 'পিতামাতা নিমাই' বলিয়া ডাকিতেন। তখনও

---

* [illegible] মধ্যে ঝামাটপুর আসি।

† চৈতন্যের নাথা বলা আছিলাতে ঝামি ॥ (বৈষ্ণবাচার্য্যে)

‡ ঝামাটপুর যে গ্রামের নাম তাহার সন্দেহ নাই। কোন কোন পুঁথিতে ঝামাটপুরা স্থানে জলমধ্যে অধিক নাম দৃষ্ট হয়।

[illegible] কবি চৈতন্য বিষয়ক কোনও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। কিন্তু [illegible] বিশেষ কোনও কারণে তাঁহার এই মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। [illegible] তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। চৈতন্যপ্রভু [illegible] তাঁহার [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] তাঁহাদের পদাবলীর প্রকাশের পর হইতে পূর্বে সাহিত্য ও [illegible] ঐ সকল কবির পরিচয় অনেকে অবগত হইয়াছেন। কিন্তু সার্বভৌম [illegible] 'চৈতন্যচরিত' নরহরিচক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর,' গৌরাঙ্গ [illegible] 'ভক্তমাল' নরহরিদাস ভণিতার 'ভক্তিরত্নাকর' এবং গোপাল বসুর 'চৈতন্যমঙ্গল' এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ কয়জন দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন? আমার পরম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] যেন [illegible] করিয়া 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন আরও কতক বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে জানিবার এই কয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত আর উপায় নাই। পুরাতন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় এখন যাঁহারা বিশেষ প্রবৃত্তি রাখিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত এখনও শুনেন নাই। সুতরাং এই সকল গ্রন্থের সন্ধান করা বড়ই কঠিন। যে সকল গ্রন্থ বাহির হইলে চৈতন্য-জীবনের অনেক অভাব পূরণ হইতে পারে। বড়ই সুখের বিষয়, ক্ষিতি-বাবুকে আমরা যেরূপ ধর্ম্মানুরাগী কবির ভাবুক চিত্তরঞ্জনে সম্পাদনে তৎপর হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কবিপ্রবরও তাঁহাকে দেখা দেওয়ার জন্যই ৺ [illegible] নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চরণ চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, ১৪৭৭ শকে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। ১৪৯৭ শকে লোচনদাসের সহিত বিরোধভঞ্জনার্থ বৃন্দাবনদাসের সেই চৈতন্য-মঙ্গল একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া 'চৈতন্যভাগবত' নামে প্রচারিত হয়। ১৬৫৭ শকে [illegible] অর্থাৎ বৃন্দাবনের চৈতন্যচরিত রচিত হইবার পরে এই নরহরিদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, তৎপূর্ব্বে কোনখানা বা কয় খানা 'চৈতন্যভাগবত' লেখা হইয়াছিল কি না? বোধ হয় তখনও চৈতন্যভাগবত লেখা হয় নাই। তাহা হইলে কবি জ্ঞানন্দ বিশেষ করিয়া বৃন্দাবনের ভাগবতাদি অথবা ভাগবত এমন উল্লেখ করিতেন। বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসের প্রকৃত নাম লইয়া বিবাদ, তখনও বৈষ্ণব-সমাজে উপস্থিত হয় নাই। এদিকে দেখা যায় (অচ্যুত বাবুর মতে [illegible] ১৬৫৭ শকে বৃন্দাবনদাস বর্ত্তমান ছিলেন। চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। কিন্তু কবি জ্ঞানন্দ লোচনদাসের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। এমন স্থলে অনেকের মনেহ হইতে পারে যে, জ্ঞানন্দ লোচনদাসের পরে নিম্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এ সন্দেহ অমূলক নহে। তিনি প্রথমে উপক্রমণিকায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থকারের কথা বলিয়া করিয়াছেন। ১৬৮০ শকে [illegible] করিয়া [illegible] তাহাই বলিতে হইবে, ১৬৮০ শকে যখন জ্ঞানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করেন। এখন এখন কথা হইতেছে, অদ্বৈতপ্রভু সপ্তমটী হওয়ায় বহুপূর্ব্বে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইলেও জ্ঞানন্দ তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন? তাহার দুইটী কারণ হইতে পারে, (১) জ্ঞানন্দ এখন লোচনদাস অপেক্ষা নবীনতর ছিলেন। তাহাতে

আবার লোচনের ন্যায় (অন্যান্য বাবুর মতে) নবদ্বীপবাসীর বালকের রচনা, ইহাতে কোন কবির কবিত্ব নৈপুণ্য ও অন্তর্দৃষ্টি বর্ণনা বাহুল্য ও তত্ত্ব-জীবনের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় বর্ণিত না থাকায়। ইহার কবি ও গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ—যদি জয়ানন্দ নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের একজন সেবক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ঠাকুর নরহরি চৈতন্যকে যে চক্ষে দেখিতেন, নিত্যানন্দকে তেমনটী মনে করিতেন না। এই কারণে নিত্যানন্দশিষ্য বৃন্দাবন নিজ প্রভু ঠাকুর নরহরির নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তবে নরহরি চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্ষদ ছিলেন, তিনিই গৌরপ্রভুকে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

"কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।
কেহ কোন ভাগ্যবান্ চামর ঢুলায়॥

যে কারণে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নরহরির নাম করেন নাই, সেই কারণে লোচনদাস ঠাকুর নরহরির শিষ্য হইয়া জয়ানন্দ নরহরির শিষ্য লোচনদাসের নামটী ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনিও বৃন্দাবনদাসের ন্যায়—

"আর যত কবি আছিল অপার।
চৈতন্যমঙ্গল ভাবা কবিল প্রচার॥" (৩।১২)

এই 'চৈতন্য মঙ্গল' প্রসঙ্গে বোধ হয় লোচনদাসের আভাস দিয়াছেন।

যাহা হউক—এখন আমরা মোটামুটি আমাদের আলোচ্য চৈতন্যমঙ্গলের রচনাকাল ধরিয়া লইতে পারি। অদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকট হইবার পর অর্থাৎ ১৪৮০ শকের পরে এবং ১৫০০ শকের পূর্ব্বে কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রচার করিয়াছিলেন। তত্ত্ব কবি নিজে তাহার বহু দেশে দেশে চৈতন্যমঙ্গল গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

কবি চৈতন্য-জীবন ও গান পালা বিশেষে বিভক্ত করিবার জন্য ৯ খণ্ডে স্বীয় গ্রন্থ বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই ৯ খণ্ডের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রথমেতে আদিখণ্ড যুগ ধর্ম্ম কর্ম্ম। দ্বিতীয় নদীয়াখণ্ড গৌরাঙ্গের জন্ম।
তৃতীয়ে বৈরাগ্যখণ্ড ছাড়ি গৃহবাস॥ চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড প্রভুর সন্ন্যাস॥
পঞ্চমে উৎকলখণ্ড গেলা নীলাচল। ষষ্ঠে প্রকাশখণ্ড প্রকাশ উজ্জ্বল॥
সপ্তমেতে তীর্থখণ্ডে নানা তীর্থ করি। অষ্টমে বিজয়খণ্ডে গেলা বৈকুণ্ঠপুরী॥
নবমে উত্তরখণ্ডে শীঘ্র সাঙ্গোপাঙ্গ। পুরোভাগ যত করিল গৌরাঙ্গ॥
এই নবখণ্ড গীত চৈতন্যমঙ্গল। তনিলে সকল পাপ যাএ রসাতল॥" (৩।১৩)

---

১। "শ্রীবৃন্দাবন শ্রীনরহরি সঙ্গে। যাহার সহিত নিত্যানন্দের বিহার॥" এখানকার চৈতন্য সঙ্গল এবং জয়ানন্দ সঙ্গে যাইতে যে ৪ জন নিত্যানন্দের সাইয়া বলিয়াছেন, সে সঙ্গল ছিল।

## দেশের অবস্থা।

এই নবখণ্ড চৈতন্য-মঙ্গলে চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেবের নবদ্বীপে আগমন-কারণ ও তখনকার নবদ্বীপের অবস্থা কবি জয়ানন্দ অতি সুললিত ভাষায় অকপটে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

শ্রীহট্টদেশে অনাচার দুর্ভিক্ষ জন্মিল। ডাকাচুরি অনাবৃষ্টি মড়ক লাগিল॥
উচ্ছন্ন হইল দেশ অরিষ্ট দেখিঞা। নানাদেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মিশ্র পুরন্দর। সবান্ধবে জয়পুর ছাড়িল সত্বর॥
কোন দেশে রহিব সভার অনুমান। এ দেশে না পাব রক্ষা চল অন্য স্থান॥
মোসভার বসতিযোগ্য গঙ্গার কূলে। নন্দ যেন ছাড়িলেন উৎপাতে গোকুলে॥
পূর্ব্বে মোরে কহিঞাছিলা এক যতিরাজ। এ দেশ ছাড়িঞা আহ নদীয়া সমাজ॥
অনাচার দেখেতে বসতযোগ্য নহে। শ্রীহট্টে উত্তম লোক তিলার্দ্ধ না রহে॥
কৃষ্ণ আর্চ্চি-রতি-মতি সমাজে বসতি। তীর্থপূর্ত্ত জ্ঞানযুত জিতেন্দ্রিয় যতি॥
গঙ্গা বৈষ্ণব মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। অল্প ভাগ্যে নহে লোক এ সবে প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নান করিব বসিব নবদ্বীপে। বৈকুণ্ঠনিবাস আর কিবা জপতপে॥
দিব্য দোলা চড়ি মিশ্র সবান্ধবে আসি। গঙ্গা নবদ্বীপ দেখি প্রেমানন্দে ভাসি॥
ভূমি স্বর্গ নবদ্বীপ পৃথিবীমণ্ডলে। নানা বর্ণের লোক বসে আহ্নবীর কূলে॥
চিন্তিঞা চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-কমল। জয়ানন্দানন্দে গাএ প্রভুর মঙ্গল॥

সুইরাগ।

নানা চিত্রে ধাতু বিচিত্র নগরী নানা জাতি বৈসে তথা।
চূর্ণে বিলেপিত দেউল দেইয়া নানা বর্ণে বৃক্ষলতা॥
জয় জয় ধন্য নদীয়া-নগরী অলকানন্দার কূলে।
কমলা ভাবিনী ক্রীড়া করে তথি বিরাজিত বকুলমালে॥
প্রতি ঘরের উপর বিচিত্র কনক চঞ্চল পতকা উড়ে।
পূর্ব্বে যেন ছিল অযোধ্যানগরী বিষ্ণুরী ছটাক গড়ে॥
নাট পাঠশাল দীঘি সরোবর কূপ তড়াগ সোপান।
মঠমণ্ডপ সুযন্ত্রিত চত্বর কুন্দ তুলসী আরোপণ॥
প্রতিদ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতিগলি নৃত্য-গীত আনন্দিত প্রতি ঘরে বেদপাঠ॥
দ্বিজরূপ ধরি দেবতা গন্ধর্ব্ব জন্ম লভিলা নবদ্বীপে।
হইঞা দ্বিজনারী ইন্দ্র-বিদ্যাধরী সঙ্গীত গঙ্গা সমীপে॥
স্বর্গ ছাড়ি যত গন্ধর্ব্বমণ্ডলী জন্মিল বৈদ্যবনিতা।
দেবঋষি মুনি দ্বিজরূপ ধরি অধ্যয়ন শ্রুতি গীতা॥

গোধূলি সময়ে মৃদঙ্গ করতাল শঙ্খ ধ্বনি প্রতি ঘরে।
শ্বেত চামর ময়ূর পাখা ভাঙে চন্দ্রাতপ শোভা করে॥
ইষ্টকারচিত প্রাচীর আঙ্গন সুমার্জিত গৃহদ্বারে।
হিঙ্গুল হরিতাল কাঁচ ঢাল চৌবট্টি চৌষট্ঠিমালে।
সালে রসাল বিশালক স্তম্ভ বাহিত চন্দ্র কুতিলাকে।
ময়ূর শুক সারস পারাবত সিংহ হংস চক্রবাকে॥
খাট পাট সিংহাসন আসন চৌদ্দি ময়ূর পাখা।
বিচিত্র চামর চন্দ্রাতপ প্রতি ঘরে সুন্দর শাখা॥
ডাবর বাটা গুবাক সম্পুট দর্পণ নরবাটিকা।
তাম্রহাণ্ডি রসপিত্তলর বাস নাবা নীর ঝিপদিকা॥
পঞ্চ বাটা বাটি নর্দ্দমা থাল রসাল রসবৃষি।
জিরোহত গাড়ু তাম্রমুখারঘট। শীতল পিত্তল ঝারি॥
পাষাণভাজন অতি সুগঠন বড়ি পা রসি কাপড়া।
উড়িআ গৌড়াআ চিত্রণী বিচিত্র সাঁপুড়া।
টাড় সাঁঠ্যা কড়ি হিরণ্যমাদলী কেষুরকঙ্কণ রত্নমুদ্রে।
হেমবিশা খাড়া বিক্রম মুহুতা [illegible] খুরে॥
ভবক সুরপাল-বাটা কাহ্নিদেশের বিচিত্র বেণী।...
পাটসেজ ভোট সকসাল কম্বল শ্রীরামখানি জমকা।
ভোজোদ্ভেদের ইন্দ্রজালমণি লক্ষ্মীবিলাসতারকা॥
জোগিতে যা পাবি তত দাস দাসী প্রেমের বান্ধিবে খাটে।
যে যে দ্রব্য সব তুলন দুর্লভ বিকাএ নদীয়ার হাটে॥
চিরঞ্জীব চৈতন্য গদাধর পাদনাথ পদপঙ্কজ মকরন্দে।
চৈতন্যমঙ্গল নিগম নিগূঢ় গাএ দ্বিজ জয়ানন্দে॥

কাণাড়া রাগ।

শচী গর্ভে অষ্টকন্যা যথাকালে হৈল। তৈ নিবন্ধিয়ে দিন কথো কাল গেল॥
জগন্নাথমিশ্র হৈল মিশ্র পুরন্দর। নৎস্থবি পণ্ডিত মহাকালিক সুন্দর॥
উপ্রতপ দেখি সর্ব্ব লোকে চমৎকার। স্নান সন্ধ্যা নিত্য শ্রাদ্ধ ভূদেব আচার॥
বলি হোম জপ যজ্ঞ পূজা ধূপ দীপে। শ্রীভাগবত পাঠ করেন গোবিন্দ সমীপে॥
আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম। ছাউনি করিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম।
নিরবধি ভাগাভুরি অতিথি দেখিআ। নানা বেশে সর্ব্বলোক গেল পালাইআ।
তবে জগন্নাথমিশ্র দেখিআ কৌতুকে। বিশ্বরূপ দণ্ডকর্ম্ম করি এনে একে।
নবদ্বীপে নবদ্বীপে হৈল রাজধন্য। ত্রস্ত হঞা রহিআ রাজা ভাবি প্রাণ গণ্য।

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয়ে তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাপে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। বিষম পিরল্যাগ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ। নবদ্বীপবিপ্র তোমার করিব প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে। নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্ব্বে লিখন আছে ধনুর্ম্মষ প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল। নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্ম্মষ রাজা। রত্নসিংহাসনে সার্ব্বভৌমে কৈল পূজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বৈসে। বিশারদ-নিবাস করিল বারাণসী॥
বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে। ভট্টাচার্য্যশিরোমণি সভার সমীপে॥
নদীয়া উচ্ছন্ন হেন গৌড়েশ্বর। রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখে মহা ঘোরতর॥
কালী খড়্গখর্পরধারিণী। মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি॥
পরিঞা রাজার কেশে বুকে মারে শেল। কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল॥
আজি তোর গদাএ পেলিনু গৌড়পাট। সবংশে কাটিনু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
গৌড়েন্দ্র বলিল মাতা মোর দেহে থাক। নবদ্বীপ বসাইব যদি প্রাণ রাখ॥
নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে। মূর্চ্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণীতলে পড়ে॥
প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজার বিশ্বাসে। শুনিঞা আশ্চর্য্য স্বপ্ন সর্ব্বলোকে ত্রাসে॥
গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু। রাজডর নাহি সর্ব্ব লোক চাস চসু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে। রাজকর দণ্ডি হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে। ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে। নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে। কলসে পতাকা উড় মন্দির উপরে॥
পুষ্পের রাজায় পড়ু গন্ধের উভাব। শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যত্র জয় জয় কার॥
পূর্ব্বে যেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী। তার শতগুণ অধিক যেন শুনি॥
নবদ্বীপের সীমাএ যবন যবে দেখ। আপন ইচ্ছায় মার প্রাণ জার রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান। হাট ঘাট মানা নাহি কর গঙ্গাস্নান॥
নবদ্বীপের প্রজাএ কি মোর অধিকার। সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার॥
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পুন সৃষ্টি। শরৎকালে রাত্রিশেষে হৈল পুষ্পবৃষ্টি॥

সংসার ছাড়িয়া যবে ছাড়িলা ছিল গ্রাম। নবদ্বীপে আসিয়া সঙ্গে পূর্ণিল কাম।
উত্তরিলা চৈতন্যগয়াধামপরবন্ধ। আসিতে নদীয়াপথে মচ্চে এ নিবন্ধ।

উদ্ধৃত কবিতা কয়টী হইতে এইমাত্র বুঝিতে পারি, এক সময়ে শ্রীহট্টে সম্প্রদায়টী বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। অধিবাসিগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। সেই মহা মড়কের সময় লীলাময় চক্রবর্ত্তী ও পুরন্দর মিশ্র সস্ত্রীক নবদ্বীপে পলাইয়া আসেন। যে নবদ্বীপ এক সময়ে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের প্রিয় রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যে মহাপীঠ কালে সেই নবদ্বীপের পুরুষসমৃদ্ধি তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও নানা বিষয়ে বিবিধ জাতির নিবাসভূত অট্টালিকাশ্রেণী নবদ্বীপের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে নবদ্বীপে যবনের ঘোরতর উপদ্রব বাড়িয়াছিল। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শিরনিয়া গ্রামের লোকেরা অনেকেই যবন হইয়া যায়। নবদ্বীপের উচ্চ শিক্ষিত ব্রাহ্মণদেরই কিছু বেশী আক্রোশ, তাহারা মুসলমান রাজাকে আনাইল যে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন? নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া যবন করিবার আদেশ করিলেন। গৌড়াধিপের এ আদেশ শিরনিয়া গ্রামীয়, সাদিল যাহাকে যাহাকে পাইল যবন করিতে লাগিল। এই উপদ্রবের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই নবদ্বীপ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বাসুদেব সার্ব্বভৌম একজন। এই দুঃসময়ে বিশ্বরূপের ভ্রাতৃসন্ন্যাস ঘটে। ব্রাহ্মণদিগের করুণ আর্ত্তনাদে মহানগরী পূর্ণ হইল। শুভ্র কবি লিখিয়াছেন, মহাকালি দিগম্বরী খড়্গখর্পরধারিণী ভীষণা কালী মূর্ত্তিতে মিশ্রিত যবনরাজের সেনাগণে সমাচ্ছন্ন হইলেন। স্বয়ং যবনরাজ ভক্তিতে ভয় পাইলেন। তাঁহার প্রতিশ্রুতি ছিল, তিনি নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিলেন না, নবদ্বীপবাসীকে অভয় দান করিলেন। এখানে একটী কথা বলিবার আছে। যদি জয়ানন্দ একজন পরম বৈষ্ণব ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রামোপাসক ছিলেন, তিনি বিষ্ণু অথবা হনুমান কর্ত্তৃক ম্লেচ্ছরাজের দর্পচূর্ণকাহিনী বর্ণনা করিলেন না কেন? আমাদের বোধ হয় কবির বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ঘটনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই শাক্তগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। শাক্তগণের কোনরূপ অনুষ্ঠানে বৈষ্ণবিক যবনরাজের মন বিষিয়াছিল, তাই বোধ হয় তিনি উত্তেজিত নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান করিয়া ছিলেন। বাস্তবিক মহাপ্রভুর পূর্ব্বে বঙ্গের যেমন হিন্দু ভাব ধারণ করে, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে নবদ্বীপ সেইরূপ শাক্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

তৎকালে গৃহস্থের তৈজসাদি ও বিলাসদ্রব্যের মধ্যে কাসা, বাটা, পানের ডিবা, ঝারি, রূপার বাটী, তামার হাঁড়ি, পিতল কলস, বাসনের ঝাঁপি, খাটা খাটী, রসনের দাম, সমপুটি, ত্রিহুতের খাড়ু, পিত্তলের আরি, পাটের বাসন, খঞ্জিতাবিতের কাপড়, উড়িষ্যা

১। আমরা নিবাসী সম্প্রদায়ের অধিক ঐ শিরনিয়া গ্রামের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি?

গৌড়িয়া কুসুম, পিটুলি চিরণী, পাশুড়া, টাড়, মোঠো দড়ি, সোণার সাহুলী, সখার দেশের খুর (?), কাশিদেশের বেণী, পাটের কাপড়, ভোট অম্বল, শ্রীরাধাখানি প্রভৃতি। তাম্রোষ্ট্রদেশের ইন্দ্রনীলমণি, মণীবিলাস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। এ ছাড়া কৃষ্ণকেলি বসন, বিষ্ণুকৈ ., লক্ষ্মীবিলাস খাট প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্যের কথাও জয়ানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়ানন্দ তপসকার যাত্র সামগ্রীর এইরূপ একটী তালিকা দিয়াছেন—

"ব্যঞ্জনে নারিকা মুদ্গ হ' হ'মাড়ি।
ওলতারা বোল বড়া মাসিকে নকোড়া ধড়ি॥
বড় সাল্লা কাঁচিবড়া দধিবড়া ক্ষীর ছেনা।
ঘৃতগুটিকা দুগ্ধ কোরা তিলি পানা॥
মধুমণ্ডা ঘৃতমণ্ডা চিনিসাণ্ডা পিঠা।
আর্শী তালিশ পোর গজুনি বাকরা॥
নোনবড়া কদমন্ত্রী ভাজুপুলি সর্করা।
ঘেউনিলাড়ু মধু সাকরপারা পুলি।
মরিচ লাড়ুকি মধু বা কিলি মিঠা॥
দুগ্ধচূড়া মনোহরা খইচুর সরাত।
পুরবেলি হংসকেলি ছানেরা পায়িকাত॥
হরিনেত্র নয়নসুখ আর দুধারি।
চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজলা অমৃতপানি বিরলি॥
এরণ্ডি নারিকেল খীরী কাঁসলা কীরড়া।
সোয়ারি সোমরতা হাতিশুণ্ড মোহড়া॥" ইত্যাদি

## বিশেষ কথা।

কবি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র হইলেও এই মঙ্গলকাব্য হইতে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায়, চৈতন্যভাগবত বা চরিতামৃতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

১ম। চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন, বঙ্গীয় চৈতন্যচরিতাখ্যায়কগণ কেবল এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীহট্টের কোন্ স্থানে তাঁহারা বসবাস করিতেন এবং শ্রীহট্টে বসবাসের পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, এ সম্বন্ধে কেহ কোন কথা লেখেন নাই। কিন্তু কবি জয়ানন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"শ্রীহট্টদেশের মধ্যে জয়পুর গ্রাম। সর্ব্ব সুখময় স্থান কিতি অনুপাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী উত্তরদিগেতে পোনতী। দক্ষিণে চোলাখুম্র নাইলে করাতি।
জয়পুর গড় মধ্যে ব্রাহ্মণের ঘর। দিব মূর্ত্তি মহাবিদ্যা যথা পরমেশ্বর॥
বাহির মহাকুল মহাবংশপ্রভব। দিগ্বিজয়ী নিজ দর্শনব্যাখ্যাচতুর্থ॥

[illegible] [illegible]

[illegible] চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রীহট্ট প্রদেশের অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিগে শ্রীহট্ট, উত্তর দিগে জৈন্তী, পশ্চিমে গোলাপগঞ্জ এবং দক্ষিণে সোনাই।

এদিকে আবার শ্রীহট্টনিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্তচৈতন্যগোপালের নামক জনৈক ব্যক্তি বলিতেছেন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা শ্রীযুক্ত আনিয়া বরগঙ্গা নামক গ্রামে বাস করেন। তাঁহার অনেকদিন মধ্যে তাঁহার শিষ্য কৈলাস পর্ব্বতের নিকট অন্ত হইয়া ঈশানীর পশ্চিম পারে অমৃত নামক পুরুষোত্তম নরসিংহে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তৎপুত্র জগন্নাথমিশ্র গৌড় অধিকার নিমিত্ত নবদ্বীপে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এখানে জগন্নাথ মিশ্র নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া [illegible] হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে শ্রীহট্টে তাঁহার মাতামহ গৃহ জগন্নাথমিশ্র পত্নী শচীদেবী ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সহ ইহু শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে

---

১ "আসীৎ শ্রীহট্টদেশস্থো বিপ্রো নন্দনবাটিজঃ।
পদ্মনাভোপেন্দ্রনামা সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বরেণ্যাদিপ্তির তেনেহ বিষয়ান্ বিষবদ্ভজন্।
বিষয়েভ্যো বো [illegible] শ্রীমান্ পরমীশ্বরঃ
তস্য সপ্তাত্মজেষ্বেকো বিশ্বরূপো মহামতিঃ।
শ্রীমদ্বৈতপ্রকাশাখ্যো যস্য নাম্নাভবৎ প্রথা।
বৈরাগ্যাদাশ্রমং ত্যক্ত্বা তীর্থযাত্রাং গতঃ সুধী।
দক্ষিণাদি, ও পুনঃ পশ্চিমাদ্রি সুখী ততঃ।
বৃন্দাবনেতি সম্প্রাপ্য কতিচিদ্বাসরান্ স্থিতঃ।
বৈরাগ্যরত্নোদধেরস্য পুত্রঃ পরম শোভনঃ।
নাম্নাভূদ্বিশ্বরূপো মে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিতঃ।
বহুভিঃ সৎপুত্রাদ্যৈস্তস্য বিপ্রস্য সিদ্ধয়ঃ [illegible]
বীরস্য [illegible] কন্যা সাধ্বী পরমশোভনা।
কাশ্যপাদ্যৈ দিব্য গুণৈঃ শচীনাম্নে পরিষ্কৃতা।
অনেকৈঃ সদ্গুণৈর্যুক্তা বিষ্ণুভক্তি প্রতায়নৈঃ।
সাধ্বীমাতাসা তস্য নবদ্বীপে সমেত্যবৈ।
[illegible] নিজং ভাগ্যমিতি ধৈর্য্যং [illegible]
পাণিগ্রহণ [illegible] [illegible] [illegible]
বিষ্ণুং [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

জন্মিয়া বাস করেন। এবং সেই স্থানে শ্রীহট্টে বাসকালেই জগন্নাথের সহিত শচীর বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু শ্রীহট্টবাসী অদ্বৈতবংশীয় লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপেই শচীর সহিত জগন্নাথের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন দুই বিভিন্ন মত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কোনটি প্রকৃত তাহার মীমাংসা করা উচিত। কিন্তু মীমাংসা করিবার ভার আমরা গ্রহণযোগ্য নহি। বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন কোন যোগ্যতর ব্যক্তি ইহার মীমাংসা করিলেই ভাল হয়।

আমাদের পরম বন্ধু শ্রীহট্টবাসী অম্বিকাচরণ চৌধুরী মহাশয় অদ্বৈতপ্রকাশে চৈতন্যদেবের খুড়তাত ভাই ও তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এখানে আমি তাঁহাদের চৈতন্যের সমসাময়িক হইতেছেন। এরূপ স্থলে কাহার কথা বিশ্বাস করা যাইবে; অদ্বৈতবংশীয়েরা নবদ্বীপবাসী অধিকাংশ ভক্তদেরই সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যেরূপ নবদ্বীপের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই বোধ হয় তিনি সচক্ষে নবদ্বীপ দর্শন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া সকল বৈষ্ণবই শচী ঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করিয়া যাইতেন। এরূপ স্থলে নরহরি যদি শচী ঠাকুরাণীকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার নিকট পূর্ব্বপরিচয় পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে নরহরিরই কথাই অধিক বিশ্বাস করিতে হয়। বিশেষতঃ শচীদেবীর নবদ্বীপে বিবাহ হইলে নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব ও কুলীনগণ আলোচনার সহিত এ কথার উল্লেখ করিতেন। আরও দেখা যাইতেছে, কবি অনেক চৈতন্যপার্ষদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দরায়, পরমানন্দভট্ট প্রভৃতির রচিত চৈতন্যচরিত ও তৎকালীন চৈতন্যদেবের অন্যান্য প্রধান ভক্তগণের মুখে অনেক কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণ দ্বারা কবি নরহরির বর্ণনাই অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস প্রথমে জয়পুর নামক স্থানেই ছিল, তৎপরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টবাসী চৈতন্যদেবের আত্মীয়গণ গুপ্তবৃন্দাবন বা বর্ত্তমান ঢাকা দক্ষিণনামক গ্রামে আসিয়া বাস করিলে সেই স্থানও চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকিবে।

---

ইতি বিচিন্ত্য নন্দা গর্ভস্থ শিশুকেতনম্।
আত্মানং কৃতসম্মান মানয়ন্তং মুদং ভৃশং।
প্রাক্ষ্যৎ দিগ্বিজয়েন তাবন্তমেব দীপতে।
ততঃ দিনে সপ্তমী তু শচীং শীঘ্র সুতাং মনস্।
বহু পাশ্চাত্যে পত্যা সমং সা বিজোকতে।
তপনমিশ্রকৃত টীকায়া বঙ্গানুবাদে ... চৈতন্যভাগবত, আদি ৭ অ।

১। ... ... ... ...

শিবটি যান করিবার পূর্বে চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষগণ কোথায় ছিলেন, তাহা বলিয়াছেন—

'চৈতন্য গোসাঞির পূর্বপুরুষ আছিল রাঢ়িদেশে।
শ্রীহট্টদেশের লোকমা গেলা তাহা ভগবান ভাবে॥
সেই বংশে সর্ব্ব বৈষ্ণব কমলাক্ষ নাম।
পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি পাইল ঘরে কলিয়া বিদ্যাধর॥' (গৌরাঙ্গ)

এখন জানা গেল, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষগণ উৎকলের রাজপুরে বাস করিতেন রাজা প্রতাপরুদ্রের ভয়ে সেই স্থান হইতে ভাগিয়া শ্রীহট্টদেশে গমন করেন।

---

'গোড়ে বৈসে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্র।
নবদ্বীপে উদয়িলা যেন দ্বিতীয় চন্দ্র॥
তাহাঁ সঙ্গে আসি মিশ্র নবদ্বীপে বসতি।' (গৌরাঙ্গ-সূত্রপাত)

একথা হইতে চৈতন্যের রাঢ়িবংশের অস্তিত্বের কোন সন্ধান উপস্থিত হয়।

শ্রীহট্টবাসী এদুয়ামিশ্র যেরূপ বংশাবলী দিয়াছেন তাহা এই—

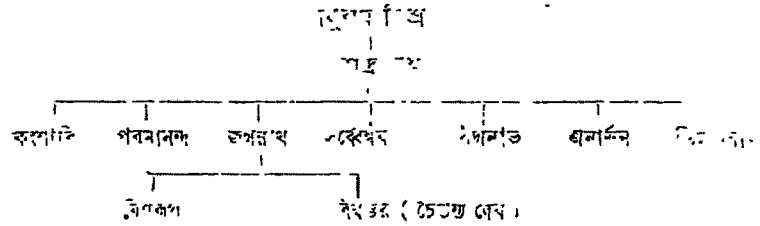


এখানে একটু বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীহট্টে আসিয়া মিশ্রগণ চৈতন্যের জাতি কখনও বলেন নাই। তাঁহারা কি জন্য এরূপ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

বিশ্বকোষ চন্দ্রিকা গ্রন্থে কুল বিষয়ে যেরূপ সংশয়ের পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ—

'১০০২ শকে দক্ষযজ্ঞে চারি ব্রাহ্মণের অন্যতম ভৃগুমিশ্র মিশ্র, তৎপুত্র ২ ধ্রুবঋষি, তৎপুত্র ৩ কৃষ্ণ, তৎপুত্র ৪ ভগীরথ, তৎপুত্র ৫ বিশ্বপাত, তৎপুত্র ৬ ভর্গদেব, তৎপুত্র ৭ ভার্গব, তৎপুত্র ৮ চন্দ্রশেখর, তৎপুত্র ৯ নীলাম্বর, তৎপুত্র ১০ নরসিংহ, তৎপুত্র ১১ জগন্নাথ। জগন্নাথের দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর (গৌরাঙ্গ দেব)।

গৌরীয় কবিরাজ চৈতন্য-চরিতেও ঐ একই কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'ভরদ্বাজ গোত্রে উপাধ্যায় ঋতু সার্ব্বভৌম বংশে মহাশয়।
আদিপুরুষ নাম, যে বিদিত সর্ব্ব লোকে পুরন্দর প্রায়॥
তাঁর নিবসয়ে পূর্ব্বে শ্রীহট্ট ভূমে ঢাকা দক্ষিণ বিদিত ভিতর।
বহুল ভট্টাচার্য্য সভাসিদ্ধ একাদশতত্ত্ব কৃতী বার্ত্তিক॥
শ্রীযুত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নাম তাঁর সেবক কিবা সখা।
মিশ্র শ্রীজগন্নাথ পদবী, তিহো কৃপায় করিলে ভিক্ষা॥

উৎকলের ইতিহাসে 'ভ্রমর' নামে কোন রাজা সৃষ্টি নামানো নাই। এরূপ স্থলে কেহ হয়ত বলিতে পারেন, প্রতাপরুদ্র এ নাম কোথায় পাইলেন? নামটা প্রতাপরুদ্রের নিজকল্পিত নহে। কটক জেলার অন্তর্গত গোপীনাথপুর গ্রামে উৎকলাধিপ কপিলেন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মহারাজ কপিলেন্দ্রদেবের "ভ্রমর" উপাধি দৃষ্ট হয়। যে সময় মুসলমানরাজগণের প্রবল প্রতাপ সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই সময় এই ভ্রমরবর কপিলেন্দ্ররাজ সগৌরবে গৌড় ও দিল্লীশ্বরগণের গৌরব খর্ব করিয়া স্বাধীনতা ও হিন্দুপ্রতাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২য়। চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন, হরিদাস ঠাকুর বুড়ন গ্রামে প্রকাশ করেন।

---

শ্রীমদ্বিক্রমসেন্দ্রভিধস্য নৃপতের্ব্বর্ষাতিরস্কারিণ্যুর্ব্বীং সম্প্রশাসতঃ।
শতাষ্টে শালীয় ভিক্ষবেদ রুদ্রি [illegible] বৈষ্ণবীতিথৌ।
ততঃ শচীগর্ভ সমুদ্রসম্ভূতো বালেন্দুনিশাকরাখ্যো।
অপর্ব্বকৃপোহপি সতাং পুনর্ব্বঃ [illegible]
বাল্যকালে নিজদৈব সর্ব্বান্ বিস্ময়াপন্ন।
প্রধানমুখ্যের সর্ব্ব ক্রমের কালে বলে
[illegible]
সত্যাস্তবিহীনা না নাভিজ্ঞা [illegible]
হরিদাসপ্রচারার্থ কলিযশস্তু বর্দ্ধয়ে।
পূর্ণিমায়াং শকব্দেন্দ্বিদিগঙ্কেন্দুবিধৌ ভবে।
[illegible]
ঈশ্বরঃ শচীগর্ভাং গৌরচন্দ্রোদয়োচ্ছ্বয়ং।
গৌরী যা গৌরকান্তি কলুষবিগলিতৈরেনী রনোঃ কান্তি
সনাথোদ্যাপনাবে শ্রবণশরণমঃ সারময় নিশিষ্টঃ।
ঈশীয় গাঢ়োর্ধ্ব পাথিবো নিয়োগেন গমতিবশিতাকৃতি।
শাকে শশিরোনলবেদভূমে বিহায় গৌরং প্রয়াগাম কানন॥

উদ্ধৃত এই চারটী শ্লোক দেখিয়া বোধ হয়, বোধ হয় জগন্নাথবিগ্রহের নাম স্থির হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বোধ হয়ে নিমাই। এখন স্থলে কোনটী প্রকৃত ও কোনটী অপ্রকৃত, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ বিষয়। গৌড়ীয় পাঠকগণ এ সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিলে ভাল হয়। তবে আমরা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে কুলীন লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ইহা অনেক কাল হইতে প্রচলিত আছে, নৈলে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে এত অল্পকাল হইতে বঙ্গবাসী লিখিয়া অতি সহজে বলা করিয়া আসিতেছেন। এখন পাশ্চাত্য বৈদিকগণের প্রাচীন বংশপঞ্জিকা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

"বুড়ন গ্রামেতে কৈল কীর্ত্তন বিস্তার।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্ত্তন প্রচার।" (চৈ ভা আদিখণ্ড)

শ্রীযুক্ত অমৃতবাজার চৌধুরী মহাশয়ও তাঁহার 'হরিদাস ঠাকুরের জীবন চরিত' লিখিয়াছেন, বুড়নে হরিদাসের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম সুমতি বর্ণী ও মাতার নাম গৌরী-দেবী। কিন্তু আমাদের আলোচ্য চৈতন্য-মঙ্গলে কবি জয়ানন্দ এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"একদিন নাচে গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে। হরিদাস ঠাকুর আসি মেলিলা স্বরূপে।
মহাবৈরাগ্য রূপ হেম কলেবর। [illegible] উজ্জ্বলা মায়ের নাম বাপ মনোহর।
বর্দ্ধনীতীরে ভাটি কলাগাছি গ্রাম। হীনকুলে জন্ম হয়ে উপরি পূর্ব্বনাম॥" (১৪।২।১১-১২

উক্ত কবিতাদুসারে হরিদাস ঠাকুরের মাতার নাম উজ্জ্বলা, পিতার নাম মনোহর, তিনি বর্দ্ধনীতীরে কলাগাছি গ্রামে (ভাটিবংশে?) হীনকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

এখন কথা হইতেছে, বৃন্দাবনদাস জয়ানন্দের অনেক পূর্ব্বে নিজ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, জয়ানন্দও তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। অথচ বৃন্দাবনের পুস্তক দেখিয়া তিনি হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধে এরূপ ভিন্ন মত প্রকাশ করিলেন কেন? জয়ানন্দ হরিদাসের মাতা পিতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু বৃন্দাবন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, বৃন্দাবন অপেক্ষা জয়ানন্দ হরিদাস ঠাকুরের বেশী পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনদাসের ভ্রমটী সংশোধন করিতেছেন এইরূপ অনুমিত হয়। বুড়নের সহিত হরিদাসের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহাও কবি জয়ানন্দ জানিতেন। তাই কথাও তিনি লিখিয়াছেন—

'বুড়ন হইতে আইল হরিদাস।" (৭৩।২৯)

বুড়নে হরিদাসের অনেক শিষ্যশেষ্য হইয়াছিল, বোধ হয় সেই জন্যই বৃন্দাবন বুড়ন হরিদাসের জন্মস্থান মনে করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার জন্মস্থান কলাগাছি গ্রাম।

৩য়। অনেকে বলিয়া থাকেন, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্গী গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন। কিন্তু কবি জয়ানন্দ মহাপ্রভুর অনুসঙ্গিগণের মধ্যে স্পষ্ট গোবিন্দ কর্ম্মকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

"হেনকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসি।
সন্ন্যাসরূপ ধরি গৌরাঙ্গে প্রকাশি॥
শুনিঞা আনন্দময় হৈল গৌরচন্দ্র।
গঙ্গা পার হৈঞা আগে চলিলা নিত্যানন্দ।
মুকুন্দাদি বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
সেই সঙ্গে আইল নদীয়া নগরীর॥
আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর আচার্য্য হরি।
বাসুদেব দত্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী॥

বজ্রেশ্বর পণ্ডিত আছিল যাহান।
তেঁহো সঙ্গ নিলেন্ত নাই, সন্ন্যাস ॥ (৪২।২০৫)

"গোবিন্দ দাসের কড়চা" নামে যে চৈতন্যজীবনী প্রচলিত আছে, তাহা উক্ত গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত।

৩৭। কোন কোন চরিতকারগণ লিখিয়াছেন, সন্ন্যাসের পর চৈতন্যদেব যখন প্রথম নীলাচলে যাত্রা করেন, তৎকালে গৌড়াধিপের সহিত উৎকলরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই জন্য রামচন্দ্র খাঁন তাঁহাকে প্রথমে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দের গ্রন্থে এ বিষয়ে কোন কথাই লেখা নাই। বরং জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, যে সময় নীলাচলে মহাপ্রভু অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় একবার উৎকলাধিপ প্রতাপরুদ্রের বঙ্গজয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব গৌড়াধিপের প্রকৃত পরাক্রমের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নিবারণ করেন। কোন সময় এ প্রবন্ধ ঐতিহাসিকগণের সামান্য কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া জয়ানন্দের কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

"এই মতে আছেন (চৈতন্য) সন্ন্যাসের দুই চারি। শুনিয়া উৎকলে পীড়ল মহা মারি॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ। শুনিয়া গৌড়েন্দ্র মনে করেন উপহাস॥
চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল। প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র ভুবুদ্ধি লাগিল॥
সাতগড় রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর। সিংহ গাড়ি দেখে যবনের অন্তর॥
ভূদেশ উজির করিবেক যবনে। জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে॥
সে সব পাবে প্রতাপরুদ্র পামর বাসে ধর। গৌড়ভূমে সকল ভোজন গাছে কর॥
কাহিনেশ জিনি কর নানা রাজ্য। গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর সমস্ত আসিব নীলাচলে। তুমি ছাড়িলে প্রভু হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারিল সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র। বিজয়ানগরে সেনা করিবারে যুদ্ধ॥"

(চৈতন্যমঙ্গল ৭০৫ পৃঃ)

৩৮। এখন যেমন ইংরাজ রাজত্বে অনেক শিক্ষিত হিন্দু ইংরাজী অনুকরণ করিতে ছাড়েন না, সেইরূপ মুসলমান প্রাধান্যকালে মুসলমানী অনুকরণ চলিতেছিল, তখনকার লোক ধরা করিয়া জয়ানন্দ চৈতন্যের মুখে এইরূপ বলিয়াছেন—

"মুড়াগি মইষা বধ করিব ব্রাহ্মণে। কলা বিরিবেক যে সব পাড়ে গাছে॥
ত্রিসন্ধ্যা রান্ধি ভাণ্ডী পরিহ পড়িবে। মোজা পাএ নড়ি হাথে যবান ধরিবে॥
মনসবিয়া বুদ্ধি সে করিব বিদ্যবন্তে। ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তরে॥
পুণ্য স্নান দান হব লেচ্ছ হবেক রাজা। রাজা সম্পদ হরিবেক দুঃখিত হব প্রজা॥" (৭০৫)

৩৯। মহাপ্রভু কিরূপে অন্তর্ধান করিলেন, সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকারই কেহ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। অনেক ভক্ত বৈষ্ণবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সেই নিদারুণ কথা প্রকাশ করিতে নাই, সে কথা মনে

হইতে কৃষ্ণ বিদায় হয়। কিন্তু আমাদের জ্ঞাতব্য সেই বিশেষ কথাটী বাদ দিয়া গিয়াছেন। কোন চৈতন্য সেবক পট্ট করিয়া লেখেন নাই, তাহা কবি জয়ানন্দ পারেন। তিনি বিষয় এইরূপে লিখিয়াছেন—

"নীলাচলে নিমাঞি চৈতন্য গোসাঞি মোর। বৈকুণ্ঠ বহিতে নিমেলি একেশ্বর॥
আষাঢ় সপ্তমী তিথি ১৪৫৫ শকাব্দার কালে। রথ পাছিহ্ন্ত করি বৈকুণ্ঠপুরী॥
আষাঢ় বদিত রথ বিদেষ নাচিতে। ইটাল বাজিল বাদ্য পাঞ্চ আচম্বিতে॥
অদ্বৈত চলিলা গোলোকপুরে গৌড়দেশে। নিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে॥
নরেন্দ্রের জলে সর্ব্বপারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিলা জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
এমতে গেলা বড় বঞ্চার দিবসে। সেই লক্ষ্যে টোটাএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিরে কহিল সর্ব্বকথা। কালি দণ্ড দণ্ড যাহে চলিবসর্ব্বিতা॥
নানাবর্ণে দিব্যমালা আইল কোথা হইতে। কত বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
রথ আনে বন্ধ আনে ডাকে দৈবজ্ঞে। নীলাচল ভক্ত সব রহিল সে পড়ি॥
চৈতন্য বৈকুণ্ঠে গেলা সপ্তদ্বীপ মুড়ি। ঐ গোপাল বলিয়া ভূমিতলে পৈলা ঢলি॥"

(৭৫।১৬-১৫, ৭৬।১-৩)

এখন আমরা জানিলাম, রথযাত্রার সময়ে গৌরাঙ্গের কোনরূপ পরলোকে একটী ইঙ্গিত আসিয়াছিল। কিন্তু তখন তেমন বেদনা হয় নাই। তিনি সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গোবর্দ্ধন নরেন্দ্র-সরোবরে জলক্রীড়া করিলেন। বঞ্চার দিন পরের বেদনা বাড়িয়া উঠিল। টোটাতে শয়নাবস্থায় তিনি পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিলেন, আমার কল্য দণ্ড রাত্রে নাম লইবে তাহা করিব। এইরূপে আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে চৈতন্য লীলা সম্বরণ করিলেন।

## ভাষা।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপাদি অঞ্চলে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, কবি জয়ানন্দ সেই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তখনও বঙ্গভাষা ব্যাকরণের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আসিয়া পড়ে নাই, এমনকার বঙ্গভাষার সহিত তখনকার ভাষার প্রধানতঃ পার্থক্য লক্ষিত হয়। জয়ানন্দের গ্রন্থে ক্রিয়ার নাম পুরুষ, কর্ত্তার উত্তম পুরুষ, আমার কর্ত্তার নাম পুরুষ ক্রিয়ার উত্তমপুরুষ, তৃতীয়ার "হে" বিভক্তি, সপ্তমীর "তে" স্থলে "ত" ও "ত" এবং মধ্যম পুরুষে "সি" প্রয়োগ প্রভৃতি নানারূপ দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম;—

---

পুথির অনেকই প্রায়ই নিয়মানুসারে "ও" স্থানে "ও", যেমন ওর (বর্ত্তমান যা) হয় স্থানে ওর, এবং "ও" প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন চিত্তিয়া।

১। তরিল=তরিয়াম।

"হেনকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষাদ ভাবিঞা।
তোন কর্ম্ম করিল অন্ধপুরী গিঞা॥" (১৬।২।৪।)

২। থুঅ=থাও। থা'ণ=থাও।

"ব্রহ্মচারী হৈলা তুমি হবিষ্যান্ন খাঅ।
আমি সব নড়ি তুমি পড়িতে না যাঅ॥" (১৬।২।১৩।)

৩। এ=(সম্বন্ধযুক্ত) তে।

"হেন বেলাএ বারতাএ পড়িল শ্রবণে।" (১৯।১৫।)

৪। ত=(সপ্তম্যন্ত) তে।

"সওসেত তীর্থখণ্ডে স্নানাতীর্থ করি।" (৩।১।৫।)

৫। সি (মধ্যম পুরুষে)।

ঈষৎ হাসিআ প্রভু-তাহাকে জিজ্ঞাসি।
আমারে ভাণ্ডিআ বেটা মন্দিরে পালাসি॥"

৬। বোলাই=বল।

"তুমি কৃষ্ণ-চৈতন্য বোলাহ সন্ন্যাসী-মণি॥" (৩৬।১।১৫।)

৭। বলু=বল বা বলহ।

"প্রতিজ্ঞা করিআ বলু মোর বিদ্যমানে।" (৫৭।১।৯।)

৮। ছাড়িব=ছাড়িবে

"ধর্ম্ম কভু না ছাড়িব তোমার ভণ বলে।" (১৭।২।১৩।)

৯। সাজাব=সাজাইব।

"বিপ্রগণ ভোগ আজি সাজাব সতত।" (৫৮।১।১৪।)

১০। খেলাইআ=খেলাইয়া।

"আমের যৌবন পাই দুরে খেলাইআ।" (১৪।১।৭।)

১১। ইবে=এবে, এখন।

"ইবে অভাগিনী হইলাঙ জেন প্রাণ বাকি।" (৪২।১।৮।)

১২। তমু=তবু, তথাপি।

"তমু এই স্থান না ছাড়িব মোর কাজে।" (৬১।২।৮।)

১৩। তখিল=তাহার

"যতুনাথ কর তত্ত তখিল জানিআ।" (৫৯।১।১২।)

১৪। নৈল=নদী।

"কৈল মেথি স্নানি করি মহাসৈল কূলে।" (৬২।২।৬।)

১৫। উড়িআ=উড়িয়া।

[illegible]

"[illegible]" [illegible]

৯। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

১। নামরূপ।

"[illegible]" [illegible]

২। বর্ণনা।

"[illegible]

[illegible]" [illegible]

৩। বাক্য।

"[illegible]" [illegible]

৪। উক্তি।

"[illegible]" [illegible]

৫। চিত্রিতোপমা।

"[illegible]" [illegible]

৬। [illegible]

"[illegible]"

৭। [illegible]।

"[illegible]

[illegible]" [illegible]

৮। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

৯। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১০। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১১। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১২। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১৩। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১৪। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১৫। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১৬। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

১৭। [illegible]

"[illegible]" [illegible]

গৌরচন্দ্রের চিন্তনে যাঁহাদের গৌরাঙ্গ বিষয়ক করিতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বা কবিরামের আসন গ্রহণ করিতেও সমর্থ নহেন না কিম্বা ভাবে ও ভক্তিতায় কাশীরাম দাসের সমকক্ষ নহেন; তথাপি কিন্তু ভক্তের কাছে, ভক্তির সরল আলেখ্য দেখিয়া যাহারা বিমুগ্ধ হন তাঁহাদের নিকট, কবি নয়ানন্দ একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। কবিরাজ গোস্বামীর মত তিনিও একজন বিনয়ী কবি। তিনিও বহুস্থলে—

"বৈষ্ণব চরণ ধূলা লাগু মোর গায়।
সবংশে বিকাম মুঞি বৈষ্ণবের পায়॥"

এরূপ সরল প্রাণের কথায় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের অতুল্য নিধি বিনয় হইতে কবি জয়ানন্দ বঞ্চিত ছিলেন না। এই মহাগুণেই তাঁহার তুলিকায় শ্রীচৈতন্যদেব বিনয়ের মূর্ত্তিমূর্ত্তি স্বরূপ প্রতিফলিত হইয়াছেন। করুণ রস বর্ণনায় কবি অনেকটা সিদ্ধ হইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহার করুণ রসাশ্রিত সরল পদগুলি পড়িতে পড়িতে ভাবাবেশে অনেক সময় হৃদয় গলিয়া যায়। মহাপ্রভু যে দিন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার যে সকল কথা হয়, তাহা বাস্তবিক হৃদয়স্পর্শী। তৎকালে কবি জয়ানন্দ বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে এইরূপ বারমাস্যা বর্ণনা করিয়াছেন—

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে। (ধ্রু)

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্ম দিনে। উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান কর গৃহাঙ্গনে॥
পিষ্টক পায়স পুষ্প ধূপ দীপ গন্ধে। সংকীর্ত্তনে নাচে প্রভু পরম আনন্দে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

তোমার জন্মতিথি পূর্ণিমা। আনন্দিত নবদ্বীপ বৃদ্ধ বালা যুবা॥ ১॥
চৈত্রে চাতক পক্ষ পিউ পিউ ডাকে। শুনিয়া যে প্রাণ করে কি কহিব কাকে॥
প্রচণ্ড উলুট বাত তপ্ত সিকতা। কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পাদাম্বুজে ব্যথা॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

তোমার নিদারুণ হিয়া। গঙ্গাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া॥ ২॥
বৈশাখে চন্দনমালা নূতন গামছা। দিব্য ধৌত কুকুমেলি-বসনের কোছা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সঙ্গ নেতা কান্দে। রূপ দেখিয়া কুলবধূ বুক নাহি বান্ধে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

বিষম বৈশাখের রৌদ্রে। তোমার বিচ্ছেদে মরি দুঃখ-সমুদ্রে॥
বসন্তে কোকিল পাখী ডাকে কুহু কুহু। তোমা দেখিয়া মূর্চ্ছা যাই মুহুর্মুহু॥
ছুতাছুত খাঞা মত্ত ভ্রমরীর রোল। তুমি দুরদেশে আমি জুড়াব কার বোল॥
মোরে না বাইও তাজিএল। মনের বেদনি কারে কহিব ভাইএল॥ ৩॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবাসিত জলে স্নান করাইব। দিব্য ধৌত কুকুমেলি অঙ্গে পরাইব॥
ধবাঞল চামরে চৌদিকে দিব বা। হৃদয়ে তুলিয়া থুব জুড়াবে হিয়া॥

আমি কি আসিতে পারি।  কি ভেল বলিতে বুক ফাটি মরি।
যে আছে তোর স্নেহ পাইবার নয়।  থাক নিজালয়ে তোরে খাইয়া বিষ।
তোমার পুত্রে তুমি যমুনার মাঠ।  যেমনে করিব আমি দাঁড়াব কাট॥
এ বোল কাহার পুত্রে পরাণে পরশে।  তোর চিত্তিতে আমি না হঁও আপনে॥
আজু হৃদি বড় চমকিত।  বিদুখিনী আমি প্রাণ করব অবধান॥
আমে ভাইভাগি নন্দলে না যাএ।  কাল নিশা মাঝে নিদ্রা মদন জাগএ॥
যার প্রাণনাথ আছে নাহি থাকে ঘরে।  প্রাণ উচাটন তার বজ্রাঘাত মারে॥
বৈষম কালের ধরা।  জীবই যদা প্রাণনাথ নাহি পাশে॥
স্বপ্নিমে নদিয়াপুরা আনন্দিত পুরী।  কাল বিস্ত সেই ক্ষণ কাল আসে পড়ি॥
কি, সকল গোকুল নগীর নগরী।  পূর্ণ ইন্দু তারকা নাহি পাশি।
তোমার বড় বৈপরীত্য।  কোথা থাকে মজু করিব উদ্যোগ॥
কাহিকে হিমের জন্য হি  সব তোপীকে কত আচ্ছাদিব॥
কত পুণ্য করিঞা ছইলা তে তোমার মাতা। হৈ, অভাগিনী হইলাত যেন প্রাণ পাতী।
তুমি সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী।  তোমার সমুখে আমি কি বলিতে জানি॥
তুমি সকল লোক জগৎ প্রকাশে।  এত দুরবাস গুহে কি কাজ সন্ন্যাসে॥
এই ত ছোট সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।  ভেল নিত্য নহে আমি পাপি পরমাদ।
ভূমিতল ছাড়ি সন্ন্যাসিনী।  কত সুখ বিনোদ ছাড়ি পতিব্রতা।
তোমে অবল শীত সমস্ত রাত্রিকে।  কাল আসিজনে শীত ভিজেব না পাকে।
৩৫ ঘরে গেল তোম ন আসি ছাড়ে পাশে।  কালা মুখ আমোর করব পরিবারে
তোরে এবল শীত তোমাদে না সহে।  কীর্ত্তন আদি যে নদ্যাদর্শ করে॥
গোপ বাসে রাস করি হরিয়াছে চিত্ত।  শ্রীভাগবত পাঠ ন শিখায়ে পোত॥
নাহি বৈষ্ণ সাধু কর তুলের ন চাল।  পতিব্রতা দেখি নারীর চমৎকার॥
বিনয় আর নমের শীত  কত নিবারিব হিংসা না করে প্রভু॥
বিনয় ঠাকুরালি কত কৈল নিবেদন।  দুষ্কৃতি না করে প্রভু না করে প্রণতি॥

প্রাণ পুরুষে ভক্তি দিয়া দুই হাত। তেহাদের ঘরে ভক্তি অন্যাহত নাথ ও বৈষ্ণবগণ

ঐ যেন যে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইল, উহা হইতেই কবির আবশ্যক বিষয় সংগ্রহ হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে কবির বর্ণিত জগাইমাধাই-কথা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও কবির অধিকের পরিচয় আছে। কিন্তু উপরের যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে কবির বিশেষত্ব ফুটিয়াছে। পাদরুদ্ধকর ১৭৫৩ সংখ্যক পুথিতে আমরা জীবন্ত ভাষার যে পরিচয় পাই, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ইহার পরবর্ত্তী কোন কবিই এমন সজীব ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদের নিকট সাধুভাষার দাবি অধিক ছিল।

"মায়ে ঝিয়ে পীরিত যত কি কহিব। তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব।
এইত দারুণ মোর বহুল সংসার। কিরীতে না হয় তোমার সঙ্গতি॥ —
ও গৌর-প্রেমে প্রভু হে মোরে লহ কিনি। বিষয় গরলে চুলে ও লোচনবাণী॥"

পদকল্পতরুর উদ্ধৃত এই লোচনদাসের ভণিতা দেখিয়া অনেক বৈষ্ণবেই আমাদের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা লোচনদাসের রচিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখন আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে বৈষ্ণব-সমাজে প্রসংসিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা লোচনের রচনা নহে বলিয়াই মনে হইতেছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্য-প্রেমবিলাস পাঠে এবং তাঁহার অনেক পদ আলোচনা করিয়া তিনি যে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রেমে নিমগ্ন ছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস পাই নাই। তাঁহার রচনা হইলে তাহার পরিচয় চৈতন্যমঙ্গল অথবা চৈতন্য-প্রেমবিলাসে যথাস্থানে আমরা ঠিক বারমাস্যাটি পাইতাম; কিন্তু যথাস্থানে তাহার অস্তিত্ব আমাদের অনুসন্ধানে মিলে নাই। আমার কোন একজন বন্ধু লিখিয়াছেন যে পদকল্পতরুর যে পুরাতন প্রাচীন পুথিতে [illegible] ভণিতা আছে, সেই পুথিতে বারমাস্যা ভণিতা নাই। বিশেষতঃ যখন দুইখানি অতি বড় প্রাচীন পুথিতে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত এই পদটি পাওয়া যাইতেছে, এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন প্রাচীন পুথিতে লোচনদাসের ভণিতাযুক্ত উক্ত পদ না বাহির হইতেছে, সে পর্য্যন্ত আমরা এই বারমাস্যা জগদানন্দের বিরচিত বলিয়াই গ্রহণ করিব। জগদানন্দ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বহুগ্রন্থের লেখকগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তিনি যদি লোচনের পদ হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে লোচনদাসের মনোযোগ করিতে কাতর হইতেন না। বৈষ্ণব-পদাবলীর সংগ্রহ-গ্রন্থ এক্ষণাদি পুথিতে নহে, এসিয়াটিক সোসাইটীর মাস্কুলিপ্ট বৈষ্ণবপদাবলী সংগ্রহ ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের গৃহে বিক্রয়ের এবং সংগ্রহের সংগ্রহীত আর একখানি প্রাচীন পুথিতে কেবল মাত্র নাম ভণিতা পাইয়াছি, এই কারণে উদ্ধৃত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা জগদানন্দের বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

[illegible] সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে কেবল জগদানন্দ প্রভুর ঐ সংক্রান্তে যে সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবীসনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"প্রথমে প্রভুর জন্ম ফাল্গুন পূর্ণিমায়। ফাল্গুনী যোগে সান্ধ্য চন্দ্র গ্রহণ হয়॥
নিশাশেষে নীলাম্বর আদি বিপ্রবর নামে। এই দিন আসি হুবন মধ্যখানে॥
দেখিল বালক অঙ্গে চিহ্ন দেখি। শচী জগন্নাথ মনে বড় সুখী॥
হস্ত পদে নিরাচ্ছন্নে পদ্মরেখাময়। দিব্য বর্ণ, ও ধ্বনি দেখে সর্ব্বজন॥
জন্মদিনের সুখে কত কত আর করি। সর্ব্বলোক সুখে ভোগায় রাত্রি হরি॥
নিত্য নবদ্বীপে নিত্য মহোৎসব সাজে। সবে বলে কনক মুরতি গৌর রাজে॥
নেদিয়াতে বারিধারে নেওয়া যায় তোরে। কোন অপরাধে গৌর ছাড়িলে মোরে॥

নিকটে গমাভটে বালির আওআসে।
কহিলা গঙ্গার মুখে ইটাল মারিবে।
বালিদিনে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে।
এক বিপ্র দুকে তত্ত্ব নিবেদিলা আইসা।
সুদর্শন পণ্ডিত সে হাথে দিল খড়ি।
ওরে দিন কর্ণবেধ সময় হইল।
গোধিলাধ্যা মাত্রায় দুত পাইলেক সর্গে।
পাদুআ শ্রীবসের বাটুআ চুলি করি।
ঘুচে হইতে আইলা শ্রীহরিদাস।
দুহব সকলে পূরিল অভিলাষ।
ওরধ্য চূড় উপনয়ন করিল।
কোপ্রাপ্তি আনাল কবি হৈলা অধ্যাপক
নবদ্বীপে বিদিত পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
সমাপ্ত আলাপ মাত্র সকল আদিনী।
বিষ্ণুবিষ্ণয় হৈলা শ্রেষ্ঠ পুরন্দর।
প্রতি ঘরে শব্দ বাখানিলা বিষ্ণুভক্তি।
তবে প্রভু করিলেন দিগ্বিজয় জয়।
পড়ায়ে শ্রীনিবাসে কহিআ বিদেশে।
এতকালে বসরের দীর্ঘ লেহ ভঙ্গ।
ঘর হৈতে আসি বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা করি।
সাপ করিতে গঙ্গা যাইতে দেবি ঈশ্বরপুরী।
গোপভাব খণ্ডাইল বিপ্রগোপীকের।
গয়াধামে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান দিলা।
ঘরে আসি গৌরাঙ্গ বড় বাসে মরিমা।
হেন ভাবনী ভাবে গোলোকনাথ নিজে।
গয়া হৈতে আসি শ্রীনিবাসের মন্দিরে।
তবে কত দিনে বাড়ী ঘরিআ আছিলা।
শ্রীনিবাস ঘরে বিষ্ণুখট্টার উপরে।
নিত্যানন্দ গোসাঞি হাড়িআ হাড়ীটী।
চতুর্ভুজ দেখাইল নিত্যানন্দ সঙ্গে।
শঙ্খ গুজি দেখাইল মুরারি গুপ্তেরে।
তাঁহা দেখি হইলা দুই পরম দুক্ত

ঘাড়ভাঙ্গি দিয়া তথা কীর্তন প্রকাশে
তুলসী মঞ্জরী দিয়া ভক্তি লোটাইলা।
দৈবে হৈল প্রভু শ্রীহরি-বাসর।
চুড়িআ তাহার অন্ন ব্যঞ্জন খাইলা।
চৈতন্যের গুরুতে মারিল পুরিব বাড়ি।
পূর্ব হইতে মালা পড়ে গলেশ-ঘট উপরে।
ইক্ষু বোলাইলা তার ফুটাইল পর্বে।
উদ্ধত হইলা কারো বচন না ধরি।
দীপ মুত করিল ফুরুর গঙ্গাদাস।
অন্নজলে জোড় ভাই করিল সন্ন্যাস।
বাসিনীমোহনকর গৌরাঙ্গ বাহিল।
পদ অর্থ বাখানিতে পণ্ডিত হৈল বড়।
ঠাকুর ঘরে সর্ব্ববিদ্যা কহিলা প্রকাশ।
বিবাদ করিআ কথাদিনে পড়াইলা।
নদী মিত্র করিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সে বাখান বুঝে হেন নাহি কারো শক্তি।
শেষে তার করিলেন সর্ব্বস্ব অন্ত।
ধন উপার্জ্জনে হৈলা গোলা মনোদেশে।
সন্ন্যাসেতে বৈকুণ্ঠে চলিলা নদীয়া।
আনন্দে ভাসিআ বুলেন নদীয়া নাটী।
রাজগিরি পর্ব্বতে যাই তাঁহে কুপা কৈলা।
মহীন্দ্র আনন্দপুরী, আর যত ভক্ত লোক।
এই এথে নবদ্বীপে, সব উদ্ধারিলা।
তবে পরমে দুক্ত গাধাধরপ্রভু।
গোলোকে যাঞা বুঝি অন্তর্ধান হৈলা।
ফুল-পুষ্প তোলাইলা সর্ব্ব নিজগণে।
প্রেমভক্তি যত ছিল সব প্রকাশিল।
আপ প্রভু নিজ প্রভু সভায় গোসাঞি।
গৌরাঙ্গ-পড়িয়া হৈলি নবদ্বীপে গাঞি।
সকল আচার্য্য বসে রহিলা নদীয়ে।
বাসে চড়ি প্রভুগ্রহ চলি যান হেলে।
হেন বলে সখল দিলেন নিত্যানন্দ।

শ্রীনিবাসপ্রিয়পুত্রে নয়ন মিলিত।
দেখে সমাধি প্রভু, কেহ নাহি চৈতন্য।
নিত্যানন্দে বাসুদেব করেন চেতন।
মহাপ্রভু সঙ্গে কৈল আমাই সমাই।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞা পাঞা কান্দিয়া ঘর আইল।
এত শুনি মহাপ্রভু করিলা কীর্ত্তন
প্রেমে প্রভু-ভক্তগণ-ভিক্ষার ভক্ষণ।
সংকীর্ত্তনে নাচিতে করিলা তার লৈলা।
সকল বৈষ্ণবে প্রভুর নানা মূর্ত্তি দেখে।
গৌরচন্দ্রে ও প্রেমের নরিসাদ নাহিক।
ঐ রাত্রিশেষে দৈত্য বিদায়ের কাল।
শ্রীনিবাসের মধ্যম পুত্র নীরজন্ত কবি
গৌরাঙ্গের প্রেমপ্রেম বড় শ্রীনিবাস।
ভক্তি আর সদাচার করিয়া বাসি স্তুতি।
দেখে দেখে লিখে যত পদ্য ছন্দ।
বড় বড় পদ্যছন্দে বিচারিল মোরে।
যদি তৈছে পদ্য করি প্রভুর আজ্ঞায়।
শিরোমণি তৈছন লৌকিক অনুরূপ।
শ্রীনিবাসাচার্য্যসুতা সোদরাখ্য মুখে।
কীর্ত্তনে নাচিতে প্রভুর বাহু চলিল।
হাসায় মানুষ আসি ধরি লৈয়া যায়।
অচ্যুতানন্দ গোসাঞির পুত্র শ্রীযদুনন্দন।
হাসিয়া ঠাকুর প্রভুর মাল্যবস্ত্র পায়।
বৈষ্ণবের সভাতে এই কথা প্রকাশিলা।
নবদ্বীপ সুখময় ছাড়ি গৃহবাস।
সন্ন্যাসে ধরিল নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
চতুর্ভুজ দেখি তবে লক্ষ্মণ ভাবনী।
বজ্রেশ্বর পণ্ডিতে পুনঃ নিবর্ত্ত লইয়া।
নিত্যানন্দ আগে গোঞাঞি নীলাচলে।
পণ্ডিত প্রবোধ করি গেলা নীলাচলে।
কাশীমিশ্রের বাসী টোটা-গোপীনাথ ভাল।

তাহাতে এই সুখে আসিয়া।
কত দিন গৌরাঙ্গ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে।
দুরাত্মিজা নিত্যানন্দা দুই ভাই॥
সাত-প্রহরিয়া ভাবে বৈসে বজ্র যেন।
নিতাইয়া গোর দুই পাশেতে ধরিল।
কান্দিয়া গাইল বিপ্র হইল বাউল॥
সকল বৈষ্ণব তবে পাইল আনন্দে॥
ভক্তি কার নাহি যদি গাইল এক শ্লোকে।
হরিদাস নাম গৌর পাশেতে খাড়া॥
সন্ধ্যেতে বাজী গেল কোন কোন সঙ্গে।
বৈকুণ্ঠ নগর যেন সপ্তাকার আছে॥
ব্রজলোক ডুবে গেল সংকীর্ত্তনে যবে।
নাশাবিল প্রভুলোক গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে।
দেবানন্দ পণ্ডিতের কহিল কাহিনী।
নবদ্বীপে গিয়া যবে নিমাঞি তখন
চিনিতে না পারিলেক নবদ্বীপের লোকে।
পবিত্রতা দেখি না দীপে আবেশ॥
হরি বলি ডাক ছাড়ি আপন কুচুর
হরি বোলাইয়া বালকেরা বেড়ায়ে॥
পাঁচ সাত দিয়া তবে প্রভুর বাড়ির।
হরি বোলাইয়া প্রভু তাহারে কান্দায়॥
করিয়া প্রকাশ ভাব দেহে গৌরচন্দ্র।
আর অবতার নারায়ণী সাত খান॥
ইতিহাস-কথায় বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশিলা।
কাটোয়া আর রীতটে কহিয়া প্রকাশ॥
দেখিয়া সকলের লোক হয় ধন্য ধন্য।
নিত্যানন্দ ঠাকুরিয়া দেখিল আগম পুরি।
খাজন বিদায় পাত্রিপরেতে রহিলা।
নিমুখে রহিলা কেহো কহিতে না পারে।
দেশে দেশে কথা রবে রহিবে ঘোষণা॥
জগন্নাথের আজ্ঞা হৈলা অধিকারী।

শ্রীবিশ্বরূপের মনে হৈল বড় ত্রাস ।
নাম ভৈল বিশ্বরূপ বড়ই সন্ন্যাসী ।
পরমানন্দপুরী নাম গিয়াছে কাশী হেতুকে ।
আজ্ঞা দেহ মোরে যাইবেন অতঃপরে ।
বড় অকৃতার্থ মোর পুত্রের কারণে ।
বিষ্ণুপ্রিয়া গোসাঞির বিশেষত ।
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করে আনন্দাবেশে ।
নিত্যানন্দ পাঠাইলা গৌড়দেশে ।
নবদ্বীপে শুনি গেলা আনন্দ বিশেষ
সে হৈতে নিত্যানন্দ যে শ্রীরামদাস ।
হই পুত্র নাম পদ্মাবতীদাস ।
শ্রীবসুধা নাম দেবী তাহান গৃহিণী ।
পাছে উপজিলা এক কন্যা রত্নমণি ।
সূর্য্যদাস নাম তাঁর সহোদর হয় ।
তাঁর মনে বিচারিয়া সভাতে ।
ঐ সম্বন্ধে দুই ঠাঞি বান্ধি ঘরি ।
পরাধীন হয় সব । সভারে যোগায় ।
আজিহুতে রহিবেক নাহি নিত্যানন্দ ।
পাঁচদিন দুইদণ্ড থাকে দিন পাঁচ নয়ে ।
এথায় নিত্যানন্দ রহিলেন ঘরে ।
সবার সহিত তাঁর মুক্তা নুপুরে ।
আছিলা খুসিত অতিশয় নিত্যানন্দ ।
নবদ্বীপে নিত্য নন্দ হিংসকের বধে ।
শচীর চরণে দণ্ড পাইলা ভয়ে ।
তবে যেই ব্রাহ্মণের বড় কৃপা বাসি ।
নীলাম্বরে বিপ্র আর গৌরাঙ্গ কহিলা ।
তবে শিঙ্গা নিত্যানন্দ বলরাম্ব কান্ধে ।
নবীনবয়সে চুড়াইল নারদের ধরন ।
ধাতাদি যমুনা চুলিলা গৌরচন্দ্র ।
গৌরচন্দ্র ভীর্থযাত্রা শেষে আসিবারে ।
এথা হৈতে চলিলা যেমনে তাহাকে ।
তবেত দুই প্রভু চলিলেক তথা ।

ইহা হৈতে আসিয়া নবদ্বীপের কাছে ।
নিত্যানন্দ দেখিল দেহে বিদ্যার আবেশে ।
বড় দুঃখ হৈল তাঁর রামাননে ॥
যে নীলাম্বরের ঘরে ছিলেন গোপী ।
তাঁর দোষে নিলা গেল চৈতন্য গোসাঞি ॥
সেবিত গোবিন্দানন্দ নামে সিংহ ।
মথুরা যাইতে প্রবেশিলা গৌড়দেশ ॥
বহুলোক দেখিলেক খুসি হৈল মনে ।
নিত্যানন্দ স্বরূপে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
হিতেতে মুখারী দেখে সোনার গাঁই ॥
সবারে কহিতে আরম্ভিল এক কথা ।
আজন্ম সংহতি অদ্বৈত ভক্ত ।
হরের উপরে বেহো গড়ি দিলা দণ্ড ।
নিত্যানন্দ তাঁরে তিঁহো হইল যেমতি ।
পাছে তিঁহ গ্রামে রাঘব পণ্ডিতের ঘর ।
সবারে কুশল করিয়া পাছে ভক্তি ।
আসি হাত ধরে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ।
মুখারি চৈতন্যদাসে মাধব বসু দত্ত ।
তবে সপ্তগ্রামে আসি দিবস কতেক ।
নরসিংহোপাসক বালিদিলে মুক্ত করে
হরি সঙ্কীর্তনে পড়িলেন ভূমিতে ।
শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পূর্ব্বে ভাগ্যবান ॥
তবে ত্রিবেণী আসি কৈল স্নানদান ।
তবে তুষ্ট সপ্তগ্রামে আসি কৈল বাস ।
হিরণ্য গুলরে কৃপা দেখি পরকাশি ॥
নিত্যানন্দে গৌড়ব্রহ্ম করি দরশন ।
সর্ব্ব পরিবার সঙ্গে যেন নীলাচলে ।
দুই ভাই নাম খুইল সুখ সাগর ।
সপ্তগ্রামে গৌড়ে ছাড়িলা নিত্যানন্দ ।
নিত্যানন্দে নিত্যানন্দ পাইল সঙ্গোপে ।
শ্রীসুধাধর মধুকণ্ঠ শ্রীবসুধর
এ সকল পার্ষদ যে গোপাল সব ।

দেখিলেন মথুরার মদনমোহন। কালিন্দী কদম্বতলা গিরি গোবর্দ্ধন॥
কেশীঘাট বংশীবট দেখি একে একে। ভাণ্ডীর বহুলাবন দেখিল প্রত্যেকে॥
জন্মভূমি রঙ্গভূমি বিশ্রামঘাট। গোবিন্দরায় আকুমট শিলাপাট॥
বিপথে ত্রিমলদেশে বেঙ্কট পর্ব্বতে। দেখিল ত্রিমলরাব রঙ্গ ঋষভ মাথে॥
কুড়িয়া পরকালমিশ্র তাব দুই সুতাইল। দম্পতি সহিত নীলাচলে পাঠাইল॥
দুই নোরষ্ট শিবকাঞ্চি বিষ্ণুকাঞ্চি। বিজয়ানগর দিয়া গেলেন ত্রিত্রিপি॥
মহানৈ পার হৈয়া গেলা নীলাচলে। নীলাচলে বহি অষ্টাবিংশতি বৎসরে॥
ধর্ম্মময় সর্ব্বলোক বসুমতী ধন্যা। হেমসেতু অবধি করিল প্রেম বন্যা॥
প্রেমের সাগরে নিত্যানন্দ কর্ণধারে। কলির কলুষভরা ডুবিল পাথারে॥
যমালয় শূন্য হইল নরক যন্ত্রণা। যম গেল ব্রহ্মার ঠাঞি করিলা মন্ত্রণা॥
যম বলেন ব্রহ্মা মোর বিষম করু দুখ। পাপী সব উদ্ধারিল শ্রীচৈতন্য ঠাকুর॥
চৌরাশি নরককুণ্ড মোর শূন্য হৈল। ষাটি সহস্র দূত ঘরে বসিয়া রহিল॥
কথো পাপী উদ্ধারিল শ্রীজগন্নাথে। কথো পাপী মুক্ত হৈল মহাপ্রসাদ ভাতে॥
কথো পাপী মুক্ত হৈল সেবিয়া তুলসী। কথো পাপী মুক্ত হৈল গঙ্গা বারাণসী॥
কথো পাপী মুক্ত হৈল শিলা গালগ্রামে। কথো কথো পাপী মুক্ত হৈল বৃন্দাবনে॥
যমালয় শূন্য হইল আর পাপী নাহি। সনকের কন্যা কলি ব্রহ্মা হাথে সেই ঠাঞি॥
ইন্দ্র সহ সব গেল চলিলা আপনি। সকল দেবতা মোরি করি নমস্কারি॥
নীলাচলে নিবাস চৈতন্য টোটাশ্রমে। বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল একক্রমে॥
আষাঢ় দশমী তিথি শুক্লা অঙ্গীকার করি। মোর পাঠাইহ যান বৈকুণ্ঠপুরী॥
নিত্যানন্দ গেলা-বথযাত্রার নিকটে। অদ্বৈত চলেরে সব কহি নিকপটে॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ এক রূপ। না বুঝিঞা বলে লোক কলহ স্বরূপ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতেরে সমর্পণ করি। সংকীর্ত্তন যজ্ঞ সব তোমার অধিকারী॥
আঠাইশ বৎসর আদি নীলাচলে রহি। স্থানান্তরে যাব আমি নিকপটে কহি॥
অনেক বৈষ্ণব হব অনেক বৈষ্ণবী। সেবকানুসেবকে ব্যাপিবেক পৃথিবী॥
এ বাড়ীর অধিকার পণ্ডিত গোসাঞি। তাহার অধিক মোর প্রিয় বড় নাহি॥
শ্রীহরিদাস ঠাকুর রহিলা নীলাচলে। টোটা নির্ম্মাইয়া দিল সমুদ্রের কোলে॥
অনেক সেবক সঙ্গে চলে নিত্যানন্দ। গৌড়দেশ পাঠাইয়া দিল গৌরচন্দ্র॥
আষাঢ়ে প্রতা একত্র শুক্ল ঘনে বা[illegible] কৃষ্ণকথা অদ্বৈতে কহেন হাসি হাসি॥

---

* কবিদাস কবিরাজের মতে ২৪ বর্ষ গৃহবাস ও ২৮ বর্ষ সন্ন্যাস সেবরায় নীলাচলে বাস। কিন্তু ঘনানন্দের মতে বিংশতি বর্ষে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। যথা—

"চতুর্দ্দশ শতাব্দ ও শক এক চিহ্নে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সন্ন্যাস যে তন্ত॥
বৈশাখ শুক্ল গৌরচন্দ্র বিংশতি বৎসর। সন্ন্যাস করেণ শুক্ল প্রেম ভক্তিসার॥

দাঁড়াঞা প্রভুর তিতে কৌপীনের ডোর। স্বপ্নে দেহ অন্ন কথা এ কৃষ্ণ পাবু মোর॥
হরিতকী কাড়ে মৈলা সহস্র ভাবতী। মুখে থুয়ি দিল তার তিন সাত কড়ি॥
নিত্যানন্দ ঠাকুর আগে করিল বিজয়। ফাল্গুনের পূর্ণা চতুর্দ্দশীর সময়॥
আগে রক্ষিত যথাবিজয় নাটিতে। ইহাঁর বাড়িল নাম পাত্রআচার্য্যেতে॥
আইল চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে। নিভৃতে তাঁহারে তথা কহিল বিশেষে॥
নবদ্বীপে গমে সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জলক্রীড়া নানারঙ্গে॥
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে। সেই পক্ষে গৌড়াএ শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সব কথা। কালি মধ্য দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা॥
নানা মণি দিয়া মালা আইল কোথা হৈতে। যত বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে॥
যত যত রথ আন তাকে দেবগণ। সে হেন কালে বলে প্রভু করি আরোহণ॥
মালা পরিবার তরে রহিল যে গাড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেল স্বর্গদ্বীপ ছাড়ি॥
আছিল সেবক যত বন্দাইঞা মৈলা। উল্কাপাত বজ্রাঘাত ভূমিকম্প হৈল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি তুমি। বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্চ্ছা গেলা ঘটী ঠাকুরাণী॥
সর্ব্ব পারিষদ লৈঞা শ্রীরামদাস। নিত্যানন্দ প্রবোধিলা বিস্তর আশ্বাস॥
পুরে গুপ্ত আদি অদ্বৈত পারিষদ। চৈতন্য-বিজয় শুনি হৈলা নিঃশব্দ॥
চৈতন্য বিচ্ছেদে নিত্যানন্দ অনুকূল। চৈতন্য বিজয় লীলা করেন শ্রবণ॥
নিত্যানন্দ প্রবোধিলা সর্ব্ব পারিষদে। চৈতন্যানন্দে নাচে কীর্ত্তন সম্পদে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরে। আওগুল আদি যদি বৈষ্ণব না করে॥
অভিন্নে না করিব চঞ্চল জীবনে। প্রেমভক্তি দিঞা সভাএ নাচান্ কীর্ত্তনে॥
সর্ব্বশক্তি প্রভু শ্রীরামদাস। ছারের কোটি ব্রহ্মরূপ ধরিল প্রকাশ॥
কুলবধূ নাচাইমু কীর্ত্তনানন্দে। তবে বন্দির জন্ম নাচিব স্বচ্ছন্দে॥
আইমু চৈতন্য যজাইমু সে চৈতন্য। গৌড় উৎকল রাজ্য করিমু ধন্য ধন্য॥
এই প্রতিজ্ঞা নিত্যানন্দের সভে শুনি। সকল বৈষ্ণব করে জয় জয় ধ্বনি॥
তথা দিনে নিত্যানন্দ শিখাসূত্র ধরি। মহা মহোৎসবে কিছি পর্য্যটন করি॥
সূর্য্যদাসসুতা শ্রীবসু জাহ্নবী। পাণিগ্রহণ করিল মহোৎসব কৌতুকী॥
বসু গর্ভে প্রকাশে গোসাঞি বীরভদ্র। জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহাশয়॥
পুরাণে চৈতন্যদাস ব্যাঘ্র যদি আনে। জাগয়ায় নিদ্রা জাএ সর্ব্বলোকে জানে॥
শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর পাণির ভিতরে। কুষ্ঠীর ধরিঞা আনে সভার গোচরে॥
এহি মনে বাদ করি প্রেম উনমাদে। দণ্ডদিন গঙ্গাদাস ছিল গঙ্গাহ্রদে॥
প্রেমের উন্মাদ বড় কমলাকর পিপলাই। নিজ অঙ্গ কাটি তবু বাহ্য জ্ঞান নাই॥
এহি মনে বাদ করিল ধনঞ্জয়দাস। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া দেখি লোকে ত্রাস॥
নাড়া পরিবার যাউলের পুরুষোত্তম দাসে। বিষ্ণু ঔষধি কাঁধিলেন প্রাণানল বসে

বাহ্যজ্ঞানে সঘন পণ্ডিত নাচিতে।
তাহাবেলে মুরারিগুপ্ত হৈলা হনুমান্।
সুন্দর পণ্ডিত গাছের চূড়েতে চড়ে।
পরমেশ্বর দাস মাটি বাইল তিন আড়ি।
ঠুঙীর বান্ধিয়া আনে কালিয়া কৃষ্ণদাস।
শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস ফলিয়া খড়দহে।
অদ্বৈত-চন্দ্রের বংশ শান্তিপুরে যথা।
সংকীর্ত্তন দেবালয় হৈবে সর্ব্বত্রাস্যে।
চৈতন্যের প্রাণধন প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন আলয়।
গৌরীদাস পণ্ডিত তাঁরা চারি ভাই মেলি।
সহস্র সহস্র কত অদ্বৈতসেবক।
চৈতন্যের সেবক অত নাহিক অবধি।
অত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্র সহিতে।
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
কলিযুগে ধর্ম্মময় হইল সংসার।
নিত্যানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতেরে কহি।
আশ্বিন মাসেতে যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি।
একাদশী দিবসে প্রলয় মত হৈলা।
নিত্যানন্দ-বিরহ শুনিলা যে মহান্ত।
সীতা অদ্বৈত অন্তরে রহিল বড় দুখ।
আচার্য্য গোসাঞি কথো দিন রহিলা।
পৌষমাসে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি হৈলা।
ঐছে অনন্ত চৈতন্য-মঙ্গলে।
চৈতন্য গাঁর সেবা চৈতন্য গাওয়াঞা।
তাঁর পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র আদি যত।
চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পাদদ্বন্দ্ব।

যে হৈতে সর্ব্ব বারাইল আচরিতে॥
লেঙ্গুড় বারাইল হস্ত দাদশ প্রমাণ॥
ষোল হাত লেঙ্গুড় গাছের তলে পড়ে॥
বলরাম দাস খোঁড়ে অবনীর সাড়ি॥
দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দের বাড়িল উল্লাস॥
মহাকুলীন যোগেশ্বর বংশ তাঁহে রহে॥
সীতা অদ্বৈত পুত্র পৌত্র প্রবাসে।
পণ্ডিল ধরণীভার গুরুতর কার্য্যে॥
তিলক বিচ্ছেদ না দেখিল কোন বন্ধ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত সে করিলা সহায়॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে রসের চামারি॥
তাঁহার সেবক সব সংসারব্যাপক।
নিত্যানন্দ সেবকের অনেক সমৃদ্ধি॥
সহস্র বৎসরে তাহা না পারি কহিতে॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে ভাবা গুরু ভার॥
খণ্ডিলেক ধরণীর অত গুরুভার॥
নিষ্কপটে পণ্ডিত আসি আছি এই মহী।
নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চালিলা ছাড়ি ক্ষিতি॥
অনন্তের নাকশ্বাস পৃথিবী কাঁপিলা॥
বীরভদ্র দেখি সভে ধাইল একান্ত॥
হা হা চৈতন্য নিত্যানন্দ স্বরূপ॥
পৃথিবী ছাড়িব ইহা অভাবে কহিলা॥
আচার্য্য গোসাঞি বৈকুণ্ঠবিজয় করিলা॥
অবতার শিরোমণি প্রকাশ সবল॥
চৈতন্যসেবক তাঁর চৈতন্য সহায়॥
এহানন্দে আশীর্ব্বাদ পুত্র অভিমত।
আনন্দে উত্তরখণ্ড গাএ জয়ানন্দ॥ ইতি।

# পরিশিষ্ট।

উপরোক্ত প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের তিনখানি পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই তিনখানি পুথিতেই বৃন্দাবনদাসের প্রসঙ্গ আছে--

"বৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিত্তে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥" (আদিখণ্ড)

লোচনদাসের এই কবিতা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হইবার পূর্বেই বৃন্দাবনদাসের এই চৈতন্য-ভাগবত নামেই বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বৃন্দাবন ও লোচনের গ্রন্থগত নাম লইয়া যে বিরোধের প্রবাদ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার মূল কি? কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও নরোত্তমের গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গলের উল্লেখ আছে। ইহাতে আমরাই স্বীকার করিতে হইবে যে বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-মঙ্গল নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই চৈতন্য-মঙ্গলই পরে চৈতন্যভাগবত নামে খ্যাত হয়, এই মাত্র প্রবাদ শুনা যায় বটে, কিন্তু কোন সাময়িক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমরা কোন কথা পাই নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল রচনা হয়, তখনও চৈতন্য ভাগবত নামকরণ হয় নাই। কিন্তু চৈতন্যভাগবত নামধেয় গ্রন্থও যে বৃন্দাবনে লিখা-হিল, তাহা বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর সীতাচরিত্র পাঠে জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও লোকনাথ উভয়ে একত্র বৃন্দাবনে বাস করিতেন। একজন চৈতন্য-মঙ্গল ও অপর ব্যক্তি চৈতন্যভাগবত নাম গ্রহণ করিবেন, ইহার কারণ কি? "ভাগবত" নামটি বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। অমৃত বাবু লিখিয়াছেন, ১৪৯২ শকে চৈতন্যভাগবত নামকরণ হয়। কিন্তু তাঁহার মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫০৩ শকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন: 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে (১৫০৪ শকে) তিরোহিত হন।' অতএব কেহ বলিতে পারেন, চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পূর্বেই কৃষ্ণদাস গ্রন্থ সমাধা অথবা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণদাসের সঙ্গী লোকনাথ গোস্বামী চৈতন্য-ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের তিরোধান গ্রহণের ছইমাস পূর্বে (১৩৩২ শকে) তাঁহার আদেশে লোকনাথ বৃন্দাবনের সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রায় আগমন করেন। তখন লোকনাথের বয়ঃক্রম ১৫।১৬ বর্ষের কম হইবে না। কারণ চৈতন্যদেবের একজন নিতান্ত বালকভক্ত কিছু আর তীর্থোদ্ধারের ভার

পাঠান নাই। এরূপ স্থলে আনুমানিক ১৪১৩ কি ১৪১৪ শকে লোকনাথের জন্ম কাল মোটামুটি ধরিয়া লইতে হয়। লোকনাথ আপনার গীতাচরিতে চৈতন্য-চরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। যদি চরিতামৃত শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলেও জানা তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৯০ বর্ষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যতীত এরূপ বৃদ্ধাবস্থায় (বৈষ্ণব সাহিত্যে) আর কাহাকেও আমরা গ্রন্থ রচনা করিতে দেখি নাই। আমাদের বোধ হয়, যে সময়ে কৃষ্ণদাস চরিতামৃত রচনা করিতেছিলেন, লোকনাথও সেই সময়েই গীতাচরিত রচনা করিয়া থাকিবেন। তাঁহার রচনারীতি পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ বোধ হয় না যে চরিতামৃত সম্পূর্ণ হইবার পরে তিনি আপনার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি বৃন্দাবনে চৈতন্যভাগবত দেখিয়াছেন, অথচ তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ ও সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবত নাম শুনেন নাই, বিস্ময়ের কথা বটে! এইজন্যই আমরা বলিতেছি, চৈতন্য-ভাগবতের নাম করণ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা প্রকৃত কি না তৎসম্বন্ধে আমাদের ঘোর সন্দেহ রহিয়াছে।

অচ্যুত বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস নরহরি ঠাকুরের নামোল্লেখ করেন নাই বলিয়া, লোচনদাসও প্রথমতঃ আপনার গ্রন্থে নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন নাই। পরে বিরোধ ভঞ্জন হইলে তিনি আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ বিরোধভঞ্জনের পরই তিনি চৈতন্যভাগবত নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের স্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া বৃন্দাবন দাস (পরে) আপনার নাম পালটিতে পারিয়াও নরহরি ঠাকুরের নাম স্বীয় গ্রন্থে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি যে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। লোচনের গ্রন্থে কত শত বার নিত্যানন্দের নামোল্লেখ আছে ও লোচন যে ভাবে নিত্যানন্দকে ভক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে 'নিত্যানন্দ' শব্দ পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এরূপ নাম যোজনা ও স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক লেখা একই কথা। কিন্তু লোচনদাস যে দুইবার করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের বোধ হইতেছে লোচনদাস বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত হইবার বহু পরে আপনার চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতপরে লোচনদাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহাই এখন বিবেচ্য। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন, "লোচনদাস ১৫৭ বর্ষের বয়সে ১৪৫৯ শকে নরহরি ঠাকুরের আদেশে চৈতন্য-মঙ্গল প্রকাশ করেন।" কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় ঐ মত স্বীকার করেন না। তাঁহার বিশ্বাস, মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হইবার বহুবর্ষ পরে লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল রচিত হয়। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লোচনের এক নরহরি ঠাকুরের এই পদটী যুক্তি করিয়া থাকেন,—

"গৌরলীলা বরণনে, বাঢ়ে বড় সুখ মনে,
তাহায় লিখিতে কিছু বাধি।
সেই নাহি এখন, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
গৌর-পদাধর লীলা, আছে কবে লিখা,
কার সাধ্য করয়ে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরবধি নিরাধি,
তার সাধ্য পঞ্চানন॥
গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনও নাহিক সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
আমার বচন হবে, যখন লোক সকলে,
বলে আমা হৈতে প্রভু॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে গ্রন্থ লীলা।
অকহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থগানে পরিবে শিলা॥" (পদ-সমুদ্র)

ভক্তিবিনিধি মহাশয় বলেন, এই পদ যখন রচিত হয়, তখন লোচনের জন্ম হয় নাই, তবে ওরূপ আকারে শিরোনামা করিয়া তাহার বহুবর্ষ পরে তিনি চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন।

আমাদের এরূপ বোধ হইতেছে যে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের বহুবর্ষ পরে লোচনের চৈতন্যমঙ্গল প্রকাশিত হয়। ১৫৮০ সালের কিছু পরে জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল প্রণয়ন করেন। তাহাও লোচনের চৈতন্য-মঙ্গল বিনাশিত হয় নাই। তাই জয়ানন্দ লোচনের ও তাঁহার গ্রন্থের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। আমাদের মতে, ১৪৬৩ শকে বা তাহার কিছু পূর্বে লোচনের তিরোভাব ঘটে। তৎপূর্বেই সাচনদাস তাঁহার গুরুর নিকট চৈতন্য-চরিত শ্রবণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরুর জীবদ্দশাতে যে তাহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার গ্রন্থ চৈতন্য ভাগবত নামের উল্লেখ ও জয়ানন্দ কর্তৃক তাঁহার অনুল্লেখে এখন লোচনদাসের গ্রন্থ পরবর্তী কালের রচনা বলিয়াই মনে হইতেছে। জয়ানন্দের গ্রন্থ ঐতিহাসিকতায় লোচন দাসের গ্রন্থ অপেক্ষা বহু অংশে ভাল হইলেও তাঁহার কবিত্ব লোচনের রসোদ্দীপক বর্ণনায় হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। নাবাদ্বীপ বাসীর নিকট জয়ানন্দের ইতিহাস তেমন আদরণীয় হয় নাই, তাই লোচনদাসের অমিয় পীযূষপূরিত পদাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গ্রন্থও লোকে পড়িয়া গিয়াছে। যেমন মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল

প্রকাশিত হইলে শুধু এ অংশের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সাথে করিয়া যায়, লোচনদাসের গ্রন্থোদয়ে অযাচিতের যশোভাতি সেইরূপ মেদাচ্ছাদিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ অযাচিত মহাপ্রভুর দেহাভাসের কথা প্রকাশ করায় ভক্ত বৈষ্ণব-সমাজে অপ্রীতিকর হইয়া পড়েন, কিন্তু লোচনদাস বৈষ্ণবগণের মনোভাব কথা লিখিয়া সহজেই ভক্তগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবগণ লোচনদাসের কবিতা-মালাকে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অপরের রচিত কোন কোন সুমধুর পদ লোচনের নামে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই জন্যই বোধ হয়, এখনকার বৃদ্ধিত পদকল্পতরুতে অযাচিত-রচিত "বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা" লোচনদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

# হরিনামের শব্দ-তত্ত্ব।

আমরা সাধারণ ঈশ্বরের যত নাম আছে, বোধ হয় হরিনামই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বলিয়া, আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায়। পত্র লিখিতে হইলে শিরোভাগে অগ্রে হরিনাম লিখিতে হয়। বাড়ীতে পীড়া হইলে গৃহিণী অগ্রে হরিনাম পূজা দিবার মানসিক করেন। আমাদের দেশে—

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।"

কুলশীলনাম হরির লুট কুড়াইবার সময় আমাদের বালকদিগের প্রতি শিক্ষার হরিনামের মাহাত্ম্য সকলের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আস্বাদও পায়। মৃত্যুর পর যখন আমাদের দেহ শ্মশান অভিমুখে নীত হয়, তখন পথিক হরিনামের শব্দে চোর পাষণ্ডও চমকিত হয়। এখন কি কেহ কেহ হরিনামের মাহাত্ম্য এতদূর অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহাদের বিবেচনায় এই কলিযুগে হরিনাম ব্যতিরেকে পরলোকে সদ্গতির উপায়ান্তর নাই। কি ব্রাহ্মণী কি ভূত্রপন্থী সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মসভায় প্রতিবাদস্বরূপ হরিসভার অভ্যুত্থান হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত হরিনামাবলী বক্ষে অঙ্কিত করিয়া উহাকে স্বরূপ আদর করেন। ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়া 'হরি বল' বলিয়া সম্বোধন করে। ঈশ্বরের এতাদৃশ ব্যাপক নামের তাৎপর্য্য কি আছে?

সহজেই জানিতে কৌতূহল জন্মে হরিনামের শব্দ কি? অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি অতি সিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

'হরি' শব্দের অর্থ চতুরানন। ইহা মূলে বিশেষণ শব্দ এবং হরিবর্ষ বলিলেই বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে; কিন্তু অতি প্রাচীনকালেই ইহা একটি বিশেষ্য প্রথম বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত হইতে, সেই কারণেই আমাদের পূর্ব্ব বিশেষ্য পদ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে বস্তুটি অপর কিছু নহে, আমাদের বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতির 'সোম'।

আমাদের আর্য্য পিতামহগণের ভারতবর্ষ-প্রবেশের বহুপূর্ব্বে তাঁহাদের সহিত ইরাণীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উক্ত উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়। আমাদের পিতামহগণ যাহাকে 'সোম' বলিতেন, তাঁহাদের ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের মুখে সেই সোম এই আকারে উচ্চারিত হইত।

সোম এক প্রকার উদ্ভিদ্। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা একবারেই জন্মে না। সুতরাং ভারত প্রবেশে আসিলে আর সোমের দর্শন পাইতেন না। ত্রিপাকাশে বাস্তবিক ও উহার তাহাদের আদিম বাসস্থান হইতে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইরাণীয় জ্ঞাতিগণের সহিত যেদেশে বসবাস করিতেন তথা হইতে) সঙ্গের সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা আদিম অধিবাসী ছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে

শ্রীক্ষেত্র হইতে আনীত মহাপ্রসাদের ন্যায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কিন্তু মহাপ্রসাদ যেমন না খাইলেও চলে, তৎকালে সোম সেরূপ না পাইলে চলিত না। সোম যাহাই প্রকৃত দেবোপাসনা বলিয়া তৎকালে গণ্য ছিল। সুতরাং সোমবর্জ্জিত দেশে প্রবিষ্ট হইয়া সোমযাগের জন্য পিতামহগণকে বড়ই ক্লেশ পাইতে হইত। হিমালয়ের উত্তরে পর্ব্বতময় প্রদেশে লোক পাঠাইতে হইত এবং এক এক বিন্দু সংগ্রহ করিয়া আনিতে অনেকে আগ্রহের সহিত ভাহাদিগকে কিয়দংশ মাত্রা কমিয়া লইতেন। এরূপ অবস্থায় সোম-সংগ্রহকারিগণের অর্থোপার্জ্জনের একটি নূতন পথ আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অর্থ-সম্পর্কে যার স্বরূপ লইয়া উঠিলে এ কালের ন্যায় সে কালেও প্রবঞ্চনায় জড়িত হইয়া পড়িত। বঞ্চকেরা সোমলতীয় বিবিধ উদ্ভিদ যাহা প্রকৃত সোম নহে, তাহা সোম বলিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। ইহা প্রকাশ হইলে পিতামহগণ এক সময়ে আইন জারি করিলেন, 'কেহ সোম বিক্রয় করিতে পাইবে না' অর্থাৎ ঘৃণিত সমাজে কেহ সোম বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না, করিলে সমাজে পতিত হইবে। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যেমন সোমক্রয়ের কথা আছে, তেমনি বিক্রেতার বর্জ্জনও ঘটারও উল্লেখ আছে। কিছুদিন উনাত্ত বর্ব্বর জাতীয় লোক, 'সোম' না পিয়া বেচিয়া খাইত। কিন্তু কালে ঐরূপে 'সোম' সংগ্রহও উঠিয়া গেল। শুল্ক এক্ষণে ত্রিবিধাকারে মধু বাজারে যেমন ভেজাল ব্যবহারের রীতি আছে, তেমনি সোমসভায় তজ্জাতীয় অন্য উদ্ভিদ্ ব্যবহারের রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। তাই এক্ষণে আর 'সোম' বিক্রয় উদ্ভিদ্, তাহা আমরা চক্ষে দেখিতে পাইব। অনেকের ধারণা 'সোম' একপ্রকার লতা, তাহা নহে, উহা এক-প্রকার বৃক্ষাকার বৃক্ষ। বৈদিক গ্রন্থে সোম রাজা বলিয়া উল্লিখিত। 'সোম রাজন্' শব্দ বড়ই প্রচলিত ছিল। সুতরাং সোমকে অনেকে আদর করিয়া 'সোমরাজ' বলিত। বাঙ্গলা দেশে 'সোমরাজ' নামে এক প্রকার ক্ষুদ্রাবয়ব বৃক্ষ আছে। ইহার 'সোমরাজ' উপাধি কিরূপে হইল, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। এই বৃক্ষের বীজ বা পত্র শ্লেষ্মবিনাশের ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। সোমেরও শ্লেষ্মনিবারক গুণ ছিল। ইহাই কি বাঙ্গলার সোমরাজের হেতু, না সোমকালে এই সোমরাজ বৃক্ষ প্রকৃত সোমের অভাবে তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত? একথা আমার স্পষ্ট জানা নাই। যাহা হউক ইদানীন্তনকালে, আর সোমযাগ করিতে হইলে কেহই হিমালয় অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বত চূড়া আরোহণ করেন না, কিন্তু বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার সময়ে তাহাই করিতে হইত। এখন আমাদের ব্রাহ্মণেরা সোমের পরিবর্ত্তে পুতিকা (পুঁইশাক) ব্যবহার করেন। তাই এখন 'সোম' লতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যখন প্রকৃত সোম দেখি নাই, তখন পুঁই শাকের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য কি তাহা বলা আমাদের অসাধ্য, তবে এক প্রধান সৌসাদৃশ্য 'বর্ণ' বলিয়া বিবেচিত হয়। পুঁই শাকের ন্যায় 'সোম'ও এক প্রকার হরিবর্ণ উদ্ভিদ ছিল।

সোমসভার স্তুতিকারকেরা সোমকে ভূরোভূয়ঃ 'হরি' নামে সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন। কুতূহলী পাঠক সেগুলির নমুনা দেখিবেন। আদি সোমবল্লী হইতে যে অংশের প্রথম হইল, বেদে তাহারও নাম 'হরি'। তাই আসব ইন্দ্র দেবতার প্রিয় পানীয় বলিয়া কথিত। হরি সোম হইলে ইন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারেন না; হরি মত্ত স্বরে আনিয়াই অশ্বিদ্বয়কে যেগে ইন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আনেন, সুতরাং যজমানের ইষ্ট সিদ্ধি হয়।

এই ভাবে পরমুখ হইলে 'হরি' ইন্দ্রের বাহক বলিয়া স্তুতি-রচিত কাব্যে বর্ণিত হইতে আরম্ভ হইলেন। কোন কোন কবি তাঁহাকে একবারে স্বতন্ত্র করিয়া তুলিলেন। আবার অন্য কবি ইন্দ্রের রথে এক জোড়া 'হরি' যুড়িয়া দিলেন। সুতরাং 'হরিবাহন' ইন্দ্র কিছুকাল পরিণামের অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে সোমের সহিত অভিন্ন করিয়া যজ্ঞভূমিতে আনয়ন করিতে লাগিলেন।

হরি নামক সোমরস এইরূপে ইন্দ্রের অঙ্গে পরিণত হইলেন, কিন্তু সোমরসের প্রত্যক্ষ সোমদেবই যে হরি সোম বলিবে তাহা নহে—তদপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক তাঁহাদের এক পরোক্ষ দেবতা ছিল—তিনি সোমবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহারও নাম সোম। তিনিই প্রকৃত সোমদেব এবং তাঁহারও নামান্তর হরি।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে ব্রহ্মণ্যে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া একেই অন্তর্যামী কল্পনা করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই তাঁহা সৃষ্টিকর্ত্তার সত্তা অনুভব করিতেছেন। সেই সেই বস্তুর প্রত্যেক ক্রিয়া বা আকার সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা ও কর্ম্মের পরিচয় দেয় বলিয়া তাহা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সেই সেই বস্তুর পরোক্ষ বা নিরাকার অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত হইতেন। এইরূপে সাধারণে ঈশ্বরকে পুরোবিধি বিভাভিমানে পূজিত হয়। দেবতা বলিতে এই বিধিতে অগ্নি, সোম ও সূর্য্য এই তিন পদার্থই বুঝাইত।

সোমের উপাসনাতে এইরূপ সাকার দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র। অগ্নি ও সোম। জ্যোতির্ম্ময় ও তেজোময় অগ্নিতে ঈশ্বরের প্রকাশকতা, পরিণামে সর্ব্বসংহারিণী শক্তি যেমন আকৃষ্ট হইয়াছে, মনোহরকান্তি, নীরব, রসাত্মক ও রোগনিবারক সোমে তেমনি ঈশ্বরের সৌম্য ও করুণের প্রতি হিতৈষিতার আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষ সোম অগ্নি একটী জড় পদার্থমাত্র, প্রত্যক্ষ দেবতা 'সোম' তদপেক্ষা চিন্ময়রূপ এক অনির্দ্দেশ্য শক্তির আধার। সুতরাং সেকালের চিন্তাশীল সাধকেরা অগ্নি অপেক্ষা সোমের মহিমা অধিক বিবেচনা করিতেন।

ইন্দ্র কি বাস্তবিকই তীব্র সোমরস চুমুক দিয়া পান করিতেন বলিয়া সেকালের লোকেরা বিশ্বাস করিতেন? কখনই নহে।—ইন্দ্র একজন উৎকৃষ্ট নিরাকার দেবতা। ইন্দ্র পরমৈশ্বর্য্য। বাঙ্গালায় 'ইন্দু' বলিলে যাহা বুঝায়, সংস্কৃতে মুখে ইন্দ্র বলিলে তাহাই বুঝাইত। কবিরা ইন্দ্রকে নানা সাজে সাজাইতেন, কিন্তু 'ব্রহ্মণা' অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে নিরাকার ঈশ্বর বলিয়াই জানিতেন। যজ্ঞভূমিতে নিরাকার ইন্দ্র এবং নিরাকার সোম বা হরি কেরূপ মিলিত হইলে তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয় সখ্য বিদ্যমান আছে বলিয়া কোনও কোন কবি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ ভাবে হরি ইন্দ্রের 'সখা'। হরি আসিলে ইন্দ্রও আইসেন। হরি ইন্দ্রকে আকর্ষণ করেন। যজ্ঞে অনেক সময়ে ইন্দ্র ও হরির (সোমের) যুগপৎ স্তুতিগান হইত।

ইন্দ্রের একটি বৈদিক নাম অর্জ্জুন। ইন্দ্রের আকর্ষক, বাহক, চালক ও সখা 'হরি' বেদে যেমন সুপরিচিত, পাণ্ডব অর্জ্জুনও আকর্ষক, বাহক, চালক ও সখা বলিয়া মহাভারতের ইতিহাসে তেমনি সুপরিচিত: অর্জ্জুন নামে পাণ্ডুরাজার পুত্র কোনও ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন কি না তাহা এখানে বিবেচ্য নহে, কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণার্জ্জুন-বিষয়িণী কথার বেদোক্ত ইন্দ্র ও হরির সম্পর্কবিষয়ক ভাব সকল যে জড়িত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

'হরি' যেমন ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা ছিলেন, আজিও তিনি আমাদের তেমনি প্রধান দেবতা। হরির গুণ গানের জন্য যেমন সামবেদের জন্ম—তেমনি হরির গুণ-গানের জন্যই আমাদের ভাষার সঙ্কীর্ত্তনের পদাবলী সকল রচিত। 'মাদক' হরি চিরকালই গানের উদ্দীপক, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কেহ যে মনে করেন, যে বস্ত্র-হরণ বা পাপহরণ করাই হরির 'হরিত্ব', তাহা নহে। বস্ত্রহরণ ও পাপহরণ দুইটিই আমাদের কল্পনামাত্র। হরির হরিত্ব বাস্তবিক কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বের মূল।—আমাদের 'হরি' দেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন বলিয়াই 'হরি' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহীরুহ তরুতাগণের উজ্জ্বল শ্যামকান্তিতেই ঋষিরা সর্ব্বপ্রথমে হরিকে প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়াছিলেন। আর আমরা যে সর্ব্বভোভাবে সে ভাব বিস্মৃত হইয়াছি, তাহা বা কেমনে বলিব। অদ্যাপিও আমরাও তুলসীতে হরিকে দেখিতে চেষ্টা করি? তবে তুলসী আর হরি নাই, হরিপ্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অগ্নির আলোক এবং উত্তাপ তরুলতাতে সঞ্চিত হইলে কিরূপে প্রাণের বিকাশ হয়, তাহা চিন্তা করিয়া ঋষিরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গাঢ়চিত্তে সেই প্রাণের মূলস্বরূপ পরোক্ষ 'হরি' দেবতার স্তব গানের দ্বারা বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

# বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে "মহাভারত" লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে, এই আলোচনার ফলে আজ অনেক বৎসর, এমন নূতন মত উদ্ভাবিত হইয়াছে।

"মহাভারত" সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নূতন মত।

অধ্যাপক ডাঃ বুহলার ( Dr. Bühler ) এই বিষয় সম্বন্ধে এক প্রকার প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি মহাভারতের ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে এক স্থানে উল্লেখ করেন যে, খৃষ্টিয় তৃতীয় হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান শ্রুতিগ্রন্থগুলির যাহা সংস্করণগুলিও একখানি উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থরূপে প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক লাডউইগ ( Prof. Ludwig ) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহাভারতে ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে কিছু কথা লিখিয়াছিলেন। অধ্যাপক হোল্‌ট্‌মান ( Prof. Holtzmann ) এই বিষয় লইয়া নূতন আলোচনা করিয়া "মহাভারত—প্রাচীন ও প্রকৃত রূপ" এই নামে চারিখণ্ড পরিমিত এক পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহার পর ডাঃ ডাহ্‌লমান ( Dr. Dahlmann ) ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে *Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch* অর্থাৎ "মহাভারত আখ্যান, কাব্য ও বিধিগ্রন্থরূপে" নাম দিয়া এক পুস্তক লিখিয়াছেন। ডাঃ ডাহ্‌লমান নারায়ণের নৃসিংহ, বামনাবতারের বৃত্তান্ত, শ্রীকৃষ্ণের গোপিনি আকর্ষণ, পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীর এবং জৈনদিগের জ্ঞাতাগ্রন্থ ও অন্তকৃদ্দশা উপাখ্যান গুলির সহিত মহাভারতোক্ত উপাখ্যান গুলির সাদৃশ্য দেখিয়া এবং অন্যান্য কথা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় অব্দের কিছু পূর্ব্বে এবং পরে শতাব্দীর পূর্ব্বেও অতি অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত আকারে বর্ত্তমান ছিল। ডাঃ ডাহ্‌লমান তাঁহার পুস্তকে বিশেষরূপে মহাভারতের ক্রমপুষ্টি কিরূপে ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন মহাভারতের উপাখ্যানগুলি বহুপূর্ব্ব হইতে একটী ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছিল, কিন্তু এখন ইহা আমরা যে আকারে পাইতেছি, এরূপভাবে গঠিত হইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে হইতে উপাখ্যানগুলি স্বাধীন ভাবে নানা কথাচ্ছলে বাহিরে নানা প্রকারে প্রচলিত ছিল। বিদেশী পণ্ডিতগণ এইরূপে মহাভারত সম্বন্ধে নূতন নূতন মত উদ্ভাবন করিয়া স্বদেশীয় পাঠকগণকে উৎপীড়িত করিয়া সুখলাভ করিতেছেন। আমাদের দেশের উৎপীড়ন প্রথম নিরক্ষিতার জন্যই দেখানই এই নীতি যথোচিত বিবেচনা করিয়াছেন। এবং এই কুশীলবদিগকে অলঙ্কার দিয়া সাজাইবার জন্য ইহাতে উত্তরকালে নানাবিধ গল্প যোগ করিয়াছে। নায়ক যুধিষ্ঠির দুর্দ্দিনের অধীর হইয়া না পড়েন, এজন্য কোন কবি বলেন যে, তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ধর্ম্মরূপে গায়ত্রীবিমানে বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, আবার কিরাতরূপে মহাদেবের তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ, ইত্যাদি। অন্য কোন কবি বলেন যে, তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ব্রহ্ম এইরূপে বিভিন্নপ্রকার নানা গল্প

পাদের দেবতা প্রমাণের জন্য পরাণীয় কর্তৃক মৎস্যাবতার, রাম কর্তৃক পরশু-রামাবতার ও বুদ্ধগণ কর্তৃক কৃষ্ণিমাত্রীর পুরুষোত্তম বিষ্ণুর উদ্ভব হইয়াছে। এভদ্ভিন্ন বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্ম্মের পৌরুষভাব দার্শনিক তত্ত্ব ও নানাবিধ উপাখ্যানাদি সৃষ্ট হইয়াছে। ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন যে দ্রৌপদীর মন্ত্রে পঞ্চ পতি সিদ্ধ হয় না। অধিকন্তু ঐরূপ পতি-বরণ কিরূপে মাতৃগণ ভোগ করিতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য পাণ্ডু রূপে দ্রৌপদীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অধ্যাপক হোপ্‌কিন্স "এপোলোনি" নামের যুধিষ্ঠিরগত মর্ম্মে বলেন যে দ্রৌপদীর বিবাহোপলক্ষে অত্যধিক পাণ্ডবশ্রীতি হেতু মহাভারতে বিস্তর প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে। তাঁহার মতে "ভূয়োধিষ্ঠির" পর্ব্বের ৩৮ অধ্যায় মূলগ্রন্থের অংশ, কিন্তু বাস্তবিক উহার অর্থ বুঝিতে বা বুঝাইতেও যাহার চেষ্টা করা যায় না। অত্যধিক পাণ্ডবশ্রীতি হইতেই পাণ্ডবদের অতিমাত্র সভ্যতা নানাবিধ অতীব বিধি নিষেধাদি দ্বারা অভিব্যক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু ডাঃ তাল্‌মান অধ্যাপক হোপ্‌কিন্সের এই মত সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। অধ্যাপক লাডউইগ মহাভারতের ইতিহাসিকতার সম্ভাব্য সম্বন্ধে যে [illegible] বলেন, ডাঃ তাল্‌মান তাহাই স্বীকার করেন মাত্র। অধ্যাপক লাডউইগ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহাভারত সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি বলেন, পঞ্চপাণ্ডব গ্রীক্ পর্ব্বত, মরুৎ, হেমন্ত ও বসন্ত এই পাঁচ ঋতুর রূপক মূর্ত্তি, চতুরঙ্গ ক্রীড়া ঋতু-পরিবর্ত্তনের রূপক, দ্রৌপদী পৃথিবী, যুধিষ্ঠির ঋতু-পরিবর্ত্তনসূচক পার্থিব পরিবর্ত্তন এবং পাশক্রীড়ার অক্ষগুটিগুলি দিবসমুহূর্ত্তাদির আকর্ষিক আবর্ত্তন ও ক্রীড়ার জয় পৃথিবীতে ঋতুবিপর্য্যয়ের ইত্যাদি।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে পণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের অজ্ঞাত করেন, তাহাদের প্রথম খণ্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় এক অপূর্ব্ব সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিন মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বের শেষ তেরোটী অধ্যায় পাওয়া যায় নাই। কি বঙ্গদেশ, কি তৈলঙ্গ, যেখানে যতগুলি মহাভারত এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কোন খানিতেই ঐ তেরোটী অধ্যায় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা দেশেও এরূপ আছে, সম্প্রতি মহাভারত ভাল করিয়া পাওয়া যায় না। কাশ্মীর মহাপণ্ডিত উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মনুষ্যের অক্ষরে লিখিত অতি প্রাচীন একখানি মহাভারতের পুঁথিতে ঐ তেরো অধ্যায় আছে, এবং বৃদ্ধ পৌরুষ বৃদ্ধিবলে কাশ্মীর সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যেও তিনি উহা দেখিয়াছেন।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব।

অধ্যাপক বুহ্লার বলেন, মহাভারতের যে কয়টি টীকা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনখানি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নীলকণ্ঠ, কিন্তু তাহার মত পুরাতন টীকা যে পাওয়া যায় তাহার প্রাচীনখানি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে লিখিত।

টীকাকার।

অধ্যাপক জ্যাকোবি সম্প্রতি বৌদ্ধগ্রন্থের উপাদান-বিষয়ক যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গতঃ মহাভারত-রচনা-কালের উপর তিনি লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গ্রন্থ করা যাইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থ তিনি বলেন যে, মহাভারত মধ্যে যবন বা গ্রীকদিগের কোন উল্লেখ নাই। অথচ পঞ্জাব বৌদ্ধ বা গ্রীকদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। অধ্যাপক জ্যাকোবির এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভারতেতিহাস প্রচারিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের ইতিহাস বিষয়ক বিবাদ।

য়ুরোপীয়দিগের সংস্কৃতচর্চ্চার প্রথমে কাল কাল আমেরিকো সাহিত্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হইতেছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ এতদ্বিষয়ে ইংরাজ পণ্ডিতের বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত করিয়া ছিলেন, যে, বিষ্ণুপুরাণ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনখানিই বহু বর্ষের অধিক প্রাচীন নহে। ডাঃ বুহলার তাঁহার পাশ্চাত্য কাশ্মীরের বিবরণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই পুরাণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়। ফরাসী অধ্যাপক ইউজিন বার্নুফ বলেন যে, হিন্দুদিগের পুরাণশাস্ত্র সহস্রবর্ষ অপেক্ষা বহু প্রাচীন কালের, তাহা তাহাদিগের গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ করা যায়। "হর্ষচরিত"-প্রণেতা বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে (প্রায় ৬২৫ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার হর্ষচরিতে একস্থলে পুরাণের কথার উল্লেখ আছে। বাণভট্টের 'পুস্তকবাচক' (পুস্তকপাঠক) এবং "পুরাণ পাঠক পুরুষ" তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। 'ত্রিবিক্রম' প্রণেতা ত্রিবিক্রম ভট্ট ৯৫০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থনিকাশ পাঠে সহজেই বুঝা যায়, তাহার অধিকাংশই "বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ" হইতে প্রমাণসহিত আবশ্যক গৃহীত হইয়াছে। বাণভট্টের "চণ্ডিকাশতক" ও কুমার দাসের জানকীহরণ কাব্যের "সূর্য্যশতক" হইতে গৃহীত বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "চণ্ডিকাশতক" মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবী-মাহাত্ম্যের এবং "সূর্য্যশতক" সৌরপুরাণোক্ত কথার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিলেই হয়, সুতরাং এই সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে অন্যূন ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে "বায়ু" "মার্কণ্ডেয়" ও "ব্রহ্ম" পুরাণ বর্ত্তমান ছিল, তাহা বলিতে আর কোন বাধা থাকিতেছে না। এতদ্ভিন্ন ডাঃ বুহলার লিখিয়াছেন যে, গ্রীক এক্‌সেনোফন্ খৃষ্টপূর্ব্ব 'বিষ্ণুগ্রেবের' বিভাগ, তথা খৃষ্টপূর্ব্বে লিখিত অপরাপর গ্রন্থকারের বর্ণনাস্ত্রনিবন্ধ এবং হলায়ুধের "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" হইতে পুরাণবচনের উদ্ধার করিতে পারা যায়। সম্প্রতি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তাহার লিখিত যে কথা বলেন, তাহাতে 'আদিত্য, 'বায়ু' 'ব্রহ্মণ্ড' 'লিঙ্গ' ও 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ' হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুরাণ অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ।

[illegible] কবি দেবেন্দ্র সেনগুপ্ত আলোচিত [illegible] "দশাবতারচরিত" [illegible] এই সকল শ্লোকে প্রমাণ যদিও [illegible] যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। গীতায় ও মহাভারতের বহুপূর্ববর্তী ধর্মসূত্রেও [illegible] বলিয়া মার্কণ্ডেয়-পুরাণের কতিপয় শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া [illegible] খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিন্দুর পুরাণাগার বর্তমান ছিল। [illegible] খৃষ্টপূর্ব্ব মুসলিনেভেটের গ্রন্থেও পুরাণের কথা আছে। [illegible] গ্রন্থ-সাহেব বাবায় [illegible] পুরাণশাস্ত্র [illegible] [illegible] ও [illegible] পরিচয় [illegible] [illegible] [illegible] পরবর্ত্তী [illegible] [illegible] [illegible]

সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় ৩য় সংখ্যায় এই সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা হইয়াছে। ঐ সকল লেখকের বিবরণ একত্রিত করিলে, তন্মধ্যে "বড় খাঁ গাজী" নামে এক মুসলমান পীরের কথা আছে। ঐ পীরের বিবরণ প্রবন্ধ লেখক আমাকে একটু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহাতে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভালীর জমীদার শ্রীযুক্ত রায় রজেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জমীদারীতে পরিবে পরগণায় এক পুরী আছে। ইহা জমীর, পরগণার অন্তর্গত। সেই জমীদারীতে পীর বুড়া খাঁর কবর আছে। বুড়া খাঁর সহিতও দেবতা বলিয়া পূজা হইয়াছিল, পরে মুসলমান হন। এই পরিবারের উপর পীরের কৃপায় বিশ্বাস অটল। এই পীরবুড়া খাঁ গ্রামবাসীর রক্ষা করা গাজী হইতে পারেন। গোমাদিগে এক এই যে বুড়া গাই সর্ব্বপ্রথমে চরিবে, পরে ঐ অবাধ করিয়া তাহাতে দোহন করা। আর যে গোরু দিন বুড়া খাঁ বলে প্রবেশ করিবে তাহার দেহ আর এক ও ঐ গ্রাহক হইতে তিনি রক্ষা করিবেন। আমার এখানে মহাবিপদে নির্ম্মল করাইয়া ধান্যপুত্র লইয়া যাইবেন। বুড়া খাঁর পুত্রের নাম ফকর খাঁ। ফকর খাঁ আমাদের বন্ধু। বুড়া খাঁ, ফকর খাঁ ইহাদের পাকের প্রাপ্ত হন। এই পীরী ফকিরের ভিন্ন প্রতিপালন করে [illegible] ঐ পীরের স্থানে মানিয়াছিল যে ইহাদিগের খাটো রাখিতে হইত না। ইহার নিকটবর্ত্তী ভালীর

করবস্থ হইলেন। পালিক পাখী দুটিও সেই সঙ্গে আসিয়া যেন কাষ্ঠপোষিত হইয়াই রহিল। ত্রয়োদশ জন গর্ভিণী প্রভু ও তৎপুত্রের মৃত্যুতে সাধ্বী অসীম জানিয়া সেই স্থানেই সীতা সতীত্ব রক্ষিল। প্রভুদিগের প্রতি তাহাদের এতটা স্নেহ ও মমতা দেখিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে নদীরূপে পলাইয়া দিলেন। ইহাই "ভেলোয়াসি" নদী। ইহারা জীবিতাবস্থায় স্বেচ্ছায় সমুদ্রে হওয়ায় পীর কালে খ্যাত হইলেন। তদবধি এখানে মুসলমানেরা পীরকে পূজা ও ভোগ দিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মীরা পরগণার পূর্ব্ব জমিদার চাঁদসুন্দরী এই পীরের আস্তানার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কয়েকখানি গ্রাম লাখেরাজ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যাহারা ইহার সেবাইত, তাঁহাদের আর সে পূর্ব্ব সম্পত্তি নাই, অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পীরের রোয়ের উপর একটি লোহার টাপা ( লোহার টাপা ) ঝুলান রহিয়াছে। এই টাপা এক সময়ে ঘণ্টার ন্যায় একটি আওয়াজ করিত বলিয়া শুনা যায়। এই যশ দেখিতে লোকসমাগম হয়। দর্শকেরা ফল দেখিয়া আস্তানার কর্ত্তাদের কথামত মন্ত্র হইয়া মানস সিদ্ধির জন্য এখানে সীরণি দেন। কাহারও মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে এই স্থান মহিমা ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে প্রতি ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন এই আস্তানায় যাত্রী আসিতে থাকেন। প্রতি বৎসরে এখানে সেই সময় একটি প্রকৃত মেলা হয়। শুনা যায়, যাত্রীরা মানস করিয়া এখানে সীরণি দিতে আসিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে কি না, তাহা বৃক্ষ হইতে নষ্ট পুষ্প পতন দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। যে সময় গাছে ফুল হইবার কথা নহে, সে সময়ও যাত্রীরা মানস সিদ্ধির অনুকূল টাট্‌কা ফুল পাইয়া থাকে। এই পীরের ফকীরেরা 'সা সাহেব' নামে কথিত হন।"

---

# দ্বিতীয় মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ২৪শে বৈশাখ (১৮৯৭। ৬ই জুন) তারিখে রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মান্যবর বিনয়কৃষ্ণ দেব মহাশয়ের ভবনে পরিষৎ কার্য্যালয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত তুঙ্গলাল রায়, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ দক্ষিণাপ্রসন্ন মালিয়া, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ বসু এ বি এল, কবিরাজ রামচন্দ্র শিরোরত্ন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত বি এ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত তুঙ্গনিবাসী বসু (সহ-সম্পাদক)।

অধিবেশনের আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল:

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য-নির্ব্বাচন।

৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর "ছাতনার ইষ্টক-লিপি"-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ। ইষ্টক লিপি সকলকে প্রদর্শিত হইবে।

৪। অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পণ্ডিত রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিষয়াবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

৬। বিবিধ বিষয়।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সম্পাদক বিগত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা অনুমোদিত হইল।

সম্পাদক বিগত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত তুঙ্গলাল রায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে কার্য্য বিবরণের এক স্থানে 'উঠাইয়া লইলেন' এইরূপ লিখিত হইয়াছে, উহার পরিবর্ত্তে 'প্রস্তাব করিলেন' এইরূপ লিখিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে সভাপতি মহাশয়ের উক্তির বিবরণ পাঠে

Positive শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই স্থানে সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া কোন বালিকা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলে ভাল হয়। কার্য্য বিবরণ অনুমোদিত হইল।

অতঃপর যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। নিম্নে যথাক্রমে, প্রস্তাবক, সমর্থক ও প্রস্তাবিত সভ্যের নাম প্রদত্ত হইল।

| প্রস্তাবক। | সমর্থকের নাম। | প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম। |
|---|---|---|
| ১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র। | শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল ; (এটর্ণি) |
| ২। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র। | শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিত্র। |
| ৩। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র। | শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। |
| ৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র। | শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত। |
| ৫। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার। | শ্রীযুক্ত দুখলাল মালিক। | শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন, বি এ। |
| ৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার। | শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়। | শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। |
| ৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। | শ্রীযুক্ত [illegible] রায়। | শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, বি এ। |
| ৮। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়। | শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র দত্ত। | শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ৯। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার। | শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়। |
| ১০। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। | শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার। | শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়। |
| ১১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ। | শ্রীহীরেন্দ্রপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। | শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, বি এল। |

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হাতনার ইষ্টক লিপি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় নগেন্দ্রবাবুকে প্রবন্ধ পাঠের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে পঠিত প্রবন্ধের সহিত ঐতিহাসিক বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প। কিন্তু আশা করা যায় যে ঐ জাতীয় আলোচনার ফলে ও বঙ্গীয়যুবকদিগের যত্নে ভবিষ্যতে ইতিহাসের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশ আলোকিত হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামাই পণ্ডিতের "ধর্ম্মমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে ঐ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া। সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, যে প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহিত তাঁহার মত ভেদ আছে। ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর এ মত তিনি স্বীকার করেন না। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে শূন্য শব্দের ব্যবহার দেখিয়াই যে বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতাবাদ বুঝিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহা হিন্দু দার্শনিক অভিনবশূন্যের শূন্যতাবাদ অর্থাৎ (Nothing) হইতে সৃষ্টিপ্রণালীবাদও বুঝাইতে পারে। অথবা এরূপ একটী শব্দ

হইতে এত বিশেষের অনুমান তাদৃশ যুক্তি সঙ্গত নহে। পরন্তু ধর্ম্মমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশ গুলি তাদৃশ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক নহে এবং প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ভাষাগত দোষ দৃষ্ট হইল। তাঁহার মতে প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার যোগ্য নহে। তবে সমবেত সভ্যবর্গ যেরূপ বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, যে সভাপতি মহাশয় যে অভিনব গ্রন্থের উল্লেখ করিলেন, তিনি প্রথমে শৈব থাকিলেও শেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশ এরূপ নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই। প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অনুমান করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

সম্পাদক বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠে পত্রিকার পাঠক আনন্দ ও উপকার লাভ করিবে। প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে প্রবন্ধের মূল্য অল্প নহে। তাহার বিশ্বাসমতে শূন্যবাদী বৌদ্ধদর্শনের একটী বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মপূজার ঐতিহাসিক মূল শূন্যবাদের আলোচনা ঐ বিষয় পরিষদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে যখন কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি যাহা জানেন বলা ভাল। তাঁহাদের গ্রামে ধর্ম্মের মন্দির আছে। ধর্ম্মের পূজারী জাতিতে কুম্ভকার বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরাও ধর্ম্মপূজায় বিশেষভাবে যোগদান করে। তাঁহার বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের এমন কিছুই নাই, যাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই, শূন্যবাদও হিন্দুদর্শনে পাওয়া যায় না এরূপ নহে।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে প্রবন্ধোক্ত ধর্ম্মপূজার বিবরণ শুনিয়া বোধ হইল যেন ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার আলোচনায় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। শূন্যতাবাদ হিন্দুদর্শনেও আছে।

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শৈশবে তিনি বীরভূম জেলায় ধর্ম্মপূজা দেখিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের নিকট অনেকরূপ বলি দিবার প্রথা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র "অহিংসা," সেইজন্য মনে হয়, ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যমরাজকে ধর্ম্মরাজ বলে। তাঁহার বোধ হয়, ধর্ম্মপূজা যমের পূজা। ধর্ম্মের নিকট লোকে রোগ শান্তির জন্য মানসিক করে। তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় বলিলেন, যে বর্দ্ধীপুরের গ্রামদেবতার উল্লেখ হইয়াছে, তিনি সেই বর্দ্ধীপুরের রায়-বংশধর। বর্দ্ধীপুরে উচ্চবর্ণও ধর্ম্মপূজায় যোগ দান করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও তান্ত্রিক দল আছে। তাহাদের মধ্যে নরপান, নরমাংস ভোজন প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত আছে।

শ্রীযুক্ত সাদরকিশোর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যে তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বলিলেন যে ধর্ম্মপূজা কেন নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হইল? ধর্ম্ম কেন নীচগামী হইলেন? তাহার বিবরণ খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই পুস্তক তিনি প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু বলিলেন যে প্রবন্ধের ভাষা স্থানে স্থানে সংযত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার অনেক কথা অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, এ মত শাস্ত্রী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে মত বিশেষভাবে প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অভিপ্রায় যে ঐরূপ তাহা বুঝা যায়। যে যুক্তি বলে শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সংস্রব প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাহা যুক্তি সিদ্ধ নহে। মুর্শিদাবাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে বলিয়াছেন, তা অনেকে বুঝেন নাই: পূজাদাদীরা এই ... ও Mind (বুদ্ধ ও চিৎ) এই উভয়েরই আশ্রয় স্বীকার করে না। অতিনবগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করেন না, তিনি তিনি শৈব গুরুর নাম বোধিসত্ত্ব (মহাযোগবল) নমস্কার করিয়াছেন। প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার বক্তব্য এই যে উহার ভাষা গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট। সেই জন্য তিনি উহার পত্রিকায় মুদ্রণ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন। ভাষা সংযত করিলে তাঁহার আপত্তি থাকিবে না। পৌরাণিকতা অথবা গবেষণার পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধের কোন অনাদর করেন নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন প্রবন্ধ কি ভাবে মুদ্রিত হইবে, তাহার ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত হউক। ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সম্পাদকের প্রস্তাবমতে শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ননীকৃষ্ণ সেন মহাশয়গণ কৃত্তিবাস সমিতির সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ প্রস্তাবমতে যাহারা বিগত অধিবেশনের পর পরিষদে পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। উপহার দাতার ও উপহার-প্রাপ্ত গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হইল।

১ শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার—কোষ্ঠীফল। ২ শ্রীযুক্ত ভাবানন্দময় কবিরত্ন—কবিকাহিনী (ঐতিহাসিক রহস্যময়ী রচিত)। ৩ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মজুমদার—রঙ্গলাভ, সাহিত্য ও সমাজ।

অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রহিল। অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

অনুমোদিত

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু,
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ২৮শে আষাঢ়।

# তৃতীয় মাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বিগত ১৮০৯ আষাঢ় (১৮৯২। ১১ জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় পরিষৎ কার্য্যালয়ে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত হরলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম এ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত এম এইচ্ বি এস্, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, কুমার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ডাক্তার চুনীলাল বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু বি এ (সহ-সম্পাদক)।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে ও সভ্যবর্গের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অধিবেশনে আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দ্দিষ্ট ছিল

## আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ।

২। সভ্য নির্ব্বাচন।

৩। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির সভ্যগণের প্রস্তাব আলোচনা।

৪। পত্রিকার নাম পরিষদ্-পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৫। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ

৬। বিবিধ বিষয়।

১। সম্পাদক বিগত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে উহা সমর্থিত হইল

১। কার্য্যবিধি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত মহাশয়গণ সভা নির্ব্বাচিত হইলেন। নিম্নে বর্ণ ক্রমে প্রস্তাবক, সমর্থক ও নির্ব্বাচিত সভ্যের নাম প্রদত্ত হইল।

| | প্রস্তাবক। | সমর্থকের নাম। | প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম। |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। | শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। |
| ২। | শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। | শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। |
| ৩। | শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। | শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। | শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। |
| ৪। | শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। | শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র সরকার। | শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র সর্ব্বা। |

২। অতঃপর নিম্নলিখিত সংশোধন-সমিতির মন্তব্যের আলোচনা হইল।

(ক) সম্পাদকের প্রস্তাবে ও [illegible]-সম্পাদকের সমর্থনে স্থির হইল যে পরিষদের [illegible] সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(খ) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নিয়মাবলীর [illegible] ধারায় [illegible] 'সাধারণতঃ' [illegible] বিদ্যোৎসাহিনী [illegible] প্রতি [illegible] ধারা [illegible] প্রয়োজন মত কার্য্য করা।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর [illegible] মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

[illegible] মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। প্রস্তাব [illegible] হইল না।

(গ) শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ধারায় এইরূপ যোগ হউক। 'কোন ব্যক্তি বিশেষ বিদ্যোৎসাহিনীর উন্নতি সাধন বা সহায়তা করিলে তাঁহাকে সম্মানার্থ উপাধি দান।'

'কোন। স্বদেশীয় ব্যক্তি যদি স্বদেশে বা বিদেশে বিদ্যার জন্য সম্মান লাভ করেন, পরিষৎ সভায় তাঁহার এই সম্মান প্রকাশ।'

সমর্থনের অভাবে উক্ত প্রস্তাব আলোচিত হইল না।

(ঘ) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভাষা ও সাহিত্য তিন জন আলোচনা সমিতির উল্লেখে উদ্দেশ্য বিস্তৃতীভূত হবে এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত মণিলালকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। রামেন্দ্র বাবু বলিলেন যে একভাবে সকল শাস্ত্রই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু সকল শাস্ত্রের চর্চ্চা অত্যন্ত কঠিন এবং উদ্দেশ্য সংকীর্ণ করিলে পরিষৎ [illegible] হইবার সম্ভাবনা। মূল আচার্য্য প্রভৃতির উদ্ধার সাধন, বঙ্গভাষার উন্নতি ও ভাষান্তরের সহিত সরল নির্ণয় প্রভৃতি সকলই পরিষদের উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ করা উচিত। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ সভা সমিতি আছে। আমাদেরও [illegible] হওয়া উচিত। তাঁহার প্রস্তাব এই যে, এ প্রস্তাব (ঘ) অংশ, উঠাইয়া দেওয়া হউক।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় বলিলেন যে ২য় ধারায় (ঙ) অংশ থাকাই উচিত। ইহা দেশে বিদিত নহে। এখানে কোন বিষয়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা হইবার সম্ভাবনা নাই।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন যে উক্ত (ঙ) অংশে "সাহিত্যের" পর "পুষ্টি ও প্রচার উদ্দেশ্যে তৎ তৎসম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ" এইরূপ যোগ করা উচিত।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় যতীন্দ্রবাবুর সংশোধিত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

ডাক্তার চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, দেশে বিজ্ঞানের প্রচলন না থাকাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এ সময়ে পরিষদ্ হইতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার মতে পরিষদের উদ্দেশ্য সংকোচ করা উচিত নহে। নানা সভ্য নানা বিষয় জানেন। যিনি যাহা জানেন, তিনি তাহারই আলোচনা করিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। এরূপ হইলে সকল সভ্যের শক্তি-প্রয়োগের অবসর হইবে এবং সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনার ফলে সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হইবে। পরিভাষা সংকলনের জন্য যতটুকু করিব, অধিক করিব না, এরূপ সংকোচের কোন হেতু দৃষ্ট হয় না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে বিলাতে যে প্রণালীতে কাজ হয়, তাহা এদেশে করিতে পারিলে ভালই হয়। কিন্তু এরূপ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? পরিষদ্ যে প্রণালীতে গঠিত, তাহাতে একটী মাত্র কাজে সময় ও শক্তিক্ষেপ করা সঙ্গত বা সম্ভব নহে। বিশেষজ্ঞ (Specialist) লইয়া সভা গঠিত করি নাই। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই সভ্য হইতে পারেন। উদ্দেশ্য সংকোচ করিলে অনেক সভ্য ঝরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। আমাদের শিক্ষা কোন বিষয় বিশেষে (Special Study) যায় নাই। বিলাতে গিয়াছে। সেই জন্য বিলাতে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি (Specialist) পাওয়া যায়। নানা রুচি নানা প্রবৃত্তিসম্পন্ন সভ্য লইয়া গঠিত পরিষদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত নহে।

সভাপতি মহাশয় যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব বিষয়ে মত গ্রহণ করিলেন। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এ অধিবেশনে স্থগিত থাকুক। পরবর্ত্তী রবিবার পুনরধিবেশনে এই অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্য-সম্পন্ন করা হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী,
সভাপতি।

১৩১০ সাল ৩রা শ্রাবণ।

# তৃতীয় মাসিক স্থগিত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ।

তৃতীয় অধিবেশনের নির্দ্ধারণ মতে বিগত ৩রা শ্রাবণ (১৮৯৭, ১৮ই জুলাই) রবিবার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ সাড়েপাঁচ ঘটিকার সময় পরিষৎ কার্য্যালয়ে উক্ত অধিবেশন হইয়াছিল।

উক্ত অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে যে বিষয়-সমূহের আলোচনা স্থগিত ছিল, তাহারই প্রধানতঃ আলোচনা হইয়াছিল। নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির মন্তব্যের আলোচনা।

২। পত্রিকার নাম পরিষদ পত্রিকা অথবা পরিষৎ পত্রিকা হইবে, এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব।

৩। অন্যতম সহ-সম্পাদক নিয়োগ।

৪। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃত্তিবাস-বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ।

৫। বিবিধ বিষয়।

উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সভ্য মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি), রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ বি এল, শ্রীযুক্ত অগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রত্নতত্ত্বচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গদাধর ন্যায়তীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, কুমার কেশবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি এল, শ্রীযুক্ত কবিরাজ রাসচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ বি এল (সম্পাদক), শ্রীযুক্ত মুক্তিবিহারী বসু বি এল (সহ-সম্পাদক)।

১। নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির মন্তব্য আলোচনা হইল।

(ক) সম্পাদক, পরিষৎ কোনরূপ সমালোচনা করিবেন না, এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ও সম্পাদক প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে বিতীয় ধারার (১) নং সাব-ক্লজের সম্মিলিত সভাটি ভিন্ন এই শব্দগুলি পরিত্যক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

সভা উক্ত মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় সম্বন্ধে মত গ্রহণ করিলেন।

যদুবাবুর প্রস্তাব অথবা সচ্চিদ্রবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

এ বিষয়ে নিয়মাবলী সংশোধন সমিতির প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৫) শ্রীযুক্ত গিরিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে এম ধারায় "স্ত্রীলোক" শব্দ স্থলে "পুরুষ" শব্দ প্রযুক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। বিস্তর বাদানুবাদের পর প্রস্তাবক মহাশয় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

(৭) শ্রীযুক্ত সচ্চিদ্রচন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে কোন সভ্যের নির্বাচন স্থগিত হইলে, সেই প্রস্তাব করার সংশোধন করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে আনয়ন করা উচিত।

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সিন্ধান্তনিধি ও শ্রীযুক্ত গিরিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এবং সম্পাদক উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(৮) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে নবম ধারার শেষ ভাগে যে কথা হউক, অস্থায়ী নির্ব্বাচনের পর, নির্ব্বাচিত সভ্যের নিকট সম্পাদক তাঁহার নিয়োগ সংবাদ ও তৎসহ প্রচলিত নিয়মাবলী একখণ্ড পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত গিরিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(৯) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে উক্ত ধারার পর এইরূপ যোগ করা হউক "নির্ব্বাচিত সভ্য তাঁহার নির্ব্বাচন সংবাদ প্রাপ্তির একমাস পর্য্যন্ত বিনা টাকা ও প্রথম মাসের চাঁদা প্রদান না করিলে তিনি সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবেন না এবং সভ্যের অন্য সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না"।

শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবক মহাশয় "ও প্রথম মাসের চাঁদা" এই শব্দগুলি রহিত করিলেন। এইরূপে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

(চ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ১০ম ধারার সভ্য শব্দের পূর্ব্বে "সাধারণ" শব্দ যোগ হইল।

(ছ) শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদে বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পরিত্যক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, বিশিষ্ট সভ্য মহাশয়দিগের উচিত পরিষদ্‌কে অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্য করা এবং পরিষদের উন্নতিকল্পে অধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করা।

সম্পাদক প্রস্তাবের প্রতিকূল মত প্রকাশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(জ) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা দ্বাদশ জনের অধিক হইবেক না।

(ঝ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, যে কেহ বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উক্ত বিষয়ে "ব্যালট" (Ballot) দ্বারা মত গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

(ঞ) শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, গ্রন্থরক্ষকও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে গণ্য হইবেন।

(ট) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ২২শ ধারায় প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তে "তাহা" শব্দের পর "কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সহ" এইরূপ যোগ হইবে।

(ঠ) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল ৩৫ক ধারার আরম্ভে "আবশ্যক-মত" এইরূপ যোগ হইবে।

(ড) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সমূহ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সমর্থকের অভাবে উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা হইল না।

নিয়মাবলী সংশোধন-সমিতির অন্যান্য প্রস্তাব গৃহীত হইল।

২। পরিষদের পত্রিকার নাম পরিষদ্-পত্রিকা অথবা পরিষৎ-পত্রিকা হইবে, এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে, সম্পাদক বলেন যে, প্রস্তাবকারী মহাশয় এবং যিনি পক্ষ অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবদ্বয়ের

য়. শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্ব
, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
ও উমেশচন্দ্র বটব্যাল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়
ও চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত (সম্পাদক)।
অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ
করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে বিদ্যানিধি মহাশয়, লেখক মহাশয় কৃত জয়ানন্দের কাল-
নির্ণয় অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটী অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। তিনি একমনে
শুনিয়াছেন। জয়ানন্দের সম্পূর্ণ পুঁথি তিনি দেখেন নাই। Asiatic Society-
সময়ে "বৈরাগ্য খণ্ড" মাত্র দেখিয়াছেন। ঐ খণ্ডে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব,
নিমাইকে বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধলেখক, এক স্থলে
পরমেশ্বর উল্লেখ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'শূদ্রাহ্নিকাচার' নামে এক খানি ক
রেয় পুঁথি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। তাহার লেখকও প্রদ্যুম্নমিশ্র, বোধ হয়
পরমেশ্বর প্রদ্যুম্নমিশ্র, একই ব্যক্তি।

যুক্ত প্রফুলচন্দ্র বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, জয়ানন্দের পুঁথি পত্রিকায় মুদ্রিত
হউক। সভাপতি মহাশয় ইহার সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সম্পূর্ণ
সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এই মতই সভায় অনুমোদিত হইল।

২। গ্রন্থরক্ষক মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস—সিংহল-বিজয়।

(২) " বামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—প্রাকৃতিক বিজ্ঞাপনের স্থূল মর্ম্ম।

(৩) " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাজা হরিশ্চন্দ্র।

(৪) " অচ্যুতচরণ চৌধুরী—হরিদাস ঠাকুরের জীবনী।

তদ্বিষয় নিম্নলিখিত ৫ জন মৃত সভ্যের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন।

৺ গৌসাইদাস গুপ্ত, চারুচন্দ্র সরকার, সুরেন্দ্রনাথ রায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে ৺ গৌসাইদাস গুপ্ত ও ৺ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্তজীবনী পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
সম্পাদক।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ
সভাপতি।

১৩০৪ সাল ৪ঠা আশ্বিন।

| | সমর্থনকর্ত্তার নাম। | প্রস্তাবিত নূতন সভ্যের নাম। |
|---|---|---|
| ৭ | শ্রীযুক্ত দত্ত। | শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাক্তার বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, এ |
| ৮ | নাথ বিদ্যানিধি। | শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু। শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কবিভূষণ। |
| ৯ | শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। | শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি। পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ। |

৩। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় বিষয় ( প্রবন্ধ পাঠ ) ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ আলোচ্য বিষয়ের পর স্থগিত হইল।

৪। সম্পাদকের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয় নির্ব্বাচন সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইলেন।

৫। সম্পাদকের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শাখা সমিতি সমূহের সম্পাদকগণ নিযুক্ত হইলেন। যথা—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পারিভাষিক সমিতি ও উদ্ভিদ্ সমিতি এবং মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রামায়ণ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ঐতিহাসিক সমিতি ও কবিকঙ্কণ সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু জৈন-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীদাসী মহাভারত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত্তিবাসী-রামায়ণ-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৬। সম্পাদক, ব্যাকরণ বিষয়ক শাখা-সমিতি নিয়োগ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, ভাষার উন্নত অবস্থা উপস্থিত হইলে ব্যাকরণ সঙ্কলিত হওয়া উচিত, বঙ্গভাষার এখনও সে অবস্থা আইসে নাই। সুতরাং এখন ব্যাকরণ-সমিতি গঠিত হওয়া সঙ্গত নহে।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, তুলসীলাল দাস, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, ব্যোমকেশ মুস্তফি এবং অমৃতলাল বসু মহাশয়গণ রজনী বাবুর প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে প্রেরিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ পাণিনি ও মুগ্ধবোধের অনুবাদ মাত্র। এই প্রেরকদিগের বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে নিয়ম করা হওয়া উচিত। অধিকাংশের মতে রজনীবাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল। অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি মতে নিম্নলিখিত সভ্যগণ ব্যাকরণ-শাখা সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইলেন—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,